গরলে অমৃত।

[মহারস কাব্য]

"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি শুভাষিতম্ ।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্ ॥"

[মনুঃ]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড,
বিধানযন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮১১ শক। ভাদ্র মাস।

মূল্য ১৲ টাকা ॥

ভূমিকা।

মনুষ্যের দৈনিক জীবনের সুখ দুঃখ অন্ধকার আলোক পাপ পুণ্যে জড়িত ঘটনাবলীর মধ্যে ভগবানের অভিপ্রায় যাহা প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বেদ বেদান্ত অপেক্ষাও জীবন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র। ইতিহাস পুরাণ জীবনচরিত ইত্যাদি পাঠে সে অভিপ্রায় অনেক অবগত হওয়া যায়। নাটক এবং উপন্যাস দ্বারা সেই রূপ শিক্ষা প্রচারের জন্য ইতিপূর্ব্বে "নববৃন্দাবন" "কলিসংহার" এবং "যুগলমিলন" রচিত হইয়াছে, এক্ষণে এই মহারসকাব্য প্রকাশ করা গেল।

পরমবৈরাগী ভক্তচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সনাতন রামানন্দ রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ যখন মহাভাবরস সম্ভোগের জন্য প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের রসবাক্য শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন, তখন নিশ্চয় ইহার ভিতর শিক্ষণীয় উচ্চ তত্ত্ব কিছু আছে স্বীকার করিতে হইবে। আধুনিক সভ্যসমাজের নরনারীগণ যে অভিপ্রায়ে সচরাচর কাব্যোপন্যাস পাঠ করেন তাহা এক প্রকার মানসিক ব্যাধি বিশেষ। তাহাতেও অনেক সদুপদেশ থাকে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ পাঠকের সে দিকে বড় দৃষ্টি যায় না; সুতরাং তাহা পাঠে কেবল চিত্ত চঞ্চল এবং তরল হইয়া উঠে। সেরূপ অসারতা বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থকার ব্যাকুল নহেন। ইহাতে কেবল এইটী দেখান উদ্দেশ্য যে, যেমন পিতার বাৎসল্যে, জননীর স্নেহে, ভাইভগ্নী আত্মীয় সখা সুহৃদের প্রীতি সৌহৃদ্যে এবং অন্যান্য পার্থিব সম্বন্ধের ভিতর ভগবৎস্বরূপের প্রকাশ, তেমনি নরনারীর অকৃত্রিম পবিত্র প্রণয়ের ভিতরেও তাঁহার প্রকাশ আছে। এই সমস্ত সম্বন্ধের দ্বারা ভগবানের স্বভাব প্রকৃতি ব্যবহার এবং মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে কেহ বুঝিতে পারে না। সকল রসের সার মাধুর্য্য রস, ইহাকে বৈষ্ণব সাধুরা পঞ্চম মহারস বলিয়া থাকেন। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য পাঁচ রসের সমষ্টি এই মহারস।

অবশ্য যখন "গরলেঅমৃত" তখন দুর্ব্বল অপূর্ণ মানব হৃদয়ের প্রাকৃত প্রেমরসকে মন্থনপূর্ব্বক উহা উদ্ধার করিতে হইয়াছে। স্বভাবের নৈসর্গিক বিকাশ, তাহার উপর শিক্ষা ও শাসনের পরিচর্য্যা এবং অবস্থার সংঘর্ষণ, ইহা দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি এবং অনন্ত উন্নতি। এই উন্নতি এবং পরিণতির প্রক্রিয়াকে এখানে গরলমন্থন এবং অমৃত উৎপাদন রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গরলে অমৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শুভসংযোগ।

বৈশাখ মাস, প্রাতঃকাল, নিদাঘের ভাসমান তরল মে ভেদ করিয়া তরুণ সূর্য্যের অরুণ কান্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় মৃদু মৃদু প্রকাশ পাইতেছে। উপবনের ফুটন্ত ফুলের গাছগুলিকে ইতস্ততঃ আন্দোলিত করিয়া, ধূসর বর্ণের ঘনাবলীকে সবেগে উড়াইয়া প্রভাত সমীরণ বহিয়া যাইতেছে, এবং সদ্যবিকসিত স্বর্ণ চম্পকের সুতীব্র পরিমল রাশি সেই বায়ু-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক আকাশ পথে বিচরণ করিতেছে। কৃষ্ণ নীলোজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুন্‌টুনি পক্ষীরা ফুলে ফুলে মধু খাইয়া ফিরিতেছে। আম্র কাননের গহন নিকুঞ্জে লুকাইয়া কোকিলকুল তুষ্য নিনাদে ঝঙ্কার করিতেছে, এবং পাপিয়ার দল ডাকিয়া ডাকিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বসিতেছে, আবার আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ভ্রমর ও মধুমক্ষীকার গুঞ্জনে, বিহঙ্গের কূজনে, কুসুমের আঘ্রাণে, বিমল প্রাতঃসমীরণে দশদিক্‌ আমোদিত, প্রকৃতির মুখমণ্ডল শান্তিরসে পরিপূর্ণ এবং নবরাগে সুরঞ্জিত। সেই মধুময় সময়ে একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কিশোর বালিকা ফুলের সাজি হস্তে প্রমুক্ত কেশে উৎফুল্ললোচনে চঞ্চল পাদবিক্ষেপে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বিস্ফারিত নয়নযুগল বিকসিত কুসুমাবলীর অন্বেষণে এমনি পিপাসু, যে অন্য কোন পদার্থ বা ব্যক্তি তথায় আছে কি না তাহা জানিবার অবসর ছিল না। কেন না, কুসুমকোমল সেই সুচারু লোচনদ্বয় চারিদিকে কেবল ফুলের শোভাই তখন

দেখিতেছিল। প্রাতঃসূর্য্যের হেমজ্যোতির্বিভাসিত বিচিত্র বর্ণের কুসুম-সৌন্দর্য্য ছটা, নয়নস্নিগ্ধকর নবপল্লবিত তরুশাখার হরিৎ কান্তি, তাহার মধ্যে নববালিকার অমল কোমল সুন্দর মূর্ত্তি খানি অবতীর্ণ হইয়া উপবনের উদ্ভিদ্ সমূহকে অতিমাত্র সমুজ্জ্বলিত এবং সুশোভিত করিয়াছিল।

বালিকার স্বভাব অতি ধীর প্রশান্ত, অথচ গতি অতি চঞ্চল, এবং উদ্দাম-শীল, চক্ষের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী এবং অনুরাগ পূর্ণ, অতি যত্ন এবং স্নেহ সহকারে বেল, মল্লিকা, চামেলী, গন্ধরাজ ফুলগুলি তুলিয়া তুলিয়া সে সাজিতে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। যে সকল অর্দ্ধ-বিকসিত গোলাপ নবরবির কিরণে প্রদীপ্ত হইয়া ঈষদ্ধাস্য মুখে সুমন্দ পবনহিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছিল, বালিকা তাহাদের প্রতি বঙ্কিম গ্রীবায়, অনিমেষ লোচনে ক্ষণ কাল চাহিয়া রহিল, এবং চাহিয়া চাহিয়া নাসারন্ধ্রে তাহাদের সদ্য মকরন্দ পান করিয়া আপনিও মুক টিপিয়া একটু একটু হাসিল। কাহারো কাহারো সঙ্গে ইঙ্গিতে কিছু কিছু আলাপও করিল। উভয়ের মধ্যে কি ভাবের কথা বার্ত্তা হইল, তাহা তোমার আমার জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কুসুমকলিকা নবীনা বালিকার উদ্ভিন্ন যৌবনরসাভিষিক্ত প্রকৃতির সহিত সহাস্য আস্য ফুলবালাগণের বন্ধুতার সম্বন্ধ দেবগণেরও অগোচর। বস্তুতঃ উদ্যানের যে বিভাগে গোলাপ বৃক্ষ সকল প্রস্ফুটিত কুসুমপুঞ্জে আলোকিত হইয়াছিল তাহাদের পানে চাহিলে প্রাণ যেন পাগল হইয়া উঠে। শ্বেত পীত নীল পাটল লোহিত নানা বর্ণের সহস্র সহস্র দিশি বিলাতি গোলাপে সে দিক্‌টা যেন একবারে ছাইয়া রাখিয়াছিল। বড় বড় ফুটন্ত গোলাপ ফুল সৌন্দর্য্যরসে এবং সুরভিভারে প্রমত্ত হইয়া প্রফুল্ল বদনে সেই পুষ্পচয়নকারিণীর পানে চাহিয়া চাহিয়া অস্পষ্টাক্ষরে কি যেন বলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের হাস্য কৌতুক অঙ্গভঙ্গী রস রঙ্গ দর্শনে বালিকা সে দিকে আর বড় তাকাইতে পারিল না, তাহার নয়নকমল যেন মদভরে ঝাঁপিয়া পড়িল, দেহ মন প্রাণ বিচঞ্চল এবং গতিশক্তি রহিত হইল; ফুলদল যেন তাহাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া ফেলিল। তাহাদের বিপুল সৌন্দর্য্য প্রভাবে সে নিতান্তই এককালে শিথিলবন্ধন হইয়া পড়িল। বনবিহারিণী সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা কুসুমকামিনী-গণের তাদৃশ বিকাশোন্মুখ সুবিমল কৌমার লাবণ্য এবং মধুর হাস্যচ্ছটাত

অবলোকনে তাহাদিগকে সে আর তখন বৃন্তচ্যুত করিতে সাহসী হইল না। স্বভাবে স্বভাবে মিশিলে যে একটা প্রগাঢ় সহানুভূতি জন্মে, তাহাই এখানে ঘটিযাছিল। বালিকা গোলাপ দেখিতে দেখিতে মনে করিতে লাগিল, যেন সে আপনিও উহাদের দলের মধ্যে এক জন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার তরল চিত্তে সে ভাব অধিক ক্ষণ স্থান পাইল না। ভাবের আবেশে বিমনা হইয়া অলিগুঞ্জনের সহিত গুন্ গুন্ স্বরে এই গীতটী গাইতে লাগিল ;—

"ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখ্ রে মায়ের হাসি।
কিবা মৃদুমন্দ, সুধাগন্ধ, ঝরে তাহে রাশি রাশি।
আহা কি রূপের ছটা, বিচিত্র বরণঘটা,
যোরালো রসালো, করে দিক্ আলো,
শোভা হেরে মন উদাসী।
কুসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাপ হরে,
মা হাসে ফুলের ভিতরে, তাই ফুল এত ভাল বাসি।
তরুকুঞ্জ পুষ্প বনে, নিরখিয়ে নিরঞ্জনে,
হাসে যোগানন্দে, ভাসে প্রেমানন্দে,
যোগী ঋষি তপোবনবাসী।"

গীত গাইতে গাইতে অজ্ঞাতসারে সে দুই একটী আধফুটন্ত গালভরা হাসি গোলাপ তুলিয়া সাজির শোভা বৃদ্ধি করিল। পরে মোহ ভাঙ্গিয়া গেলে জিহ্বা কাটিয়া "আহা হা কি করলাম!" বলিয়া একটু দুঃখও প্রকাশ করিয়াছিল।

ফুলের সঙ্গে স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত একটা অতি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। কাহার সঙ্গেই বা না আছে? তুমি আমি নীরস গদ্যপ্রিয় বিষয়ী জীব, আমাদেরও কি ফুল দেখিতে, ফুল শুঁকিতে ইচ্ছা হয় না? পুষ্পিত কানন হঠাৎ চক্ষের সম্মুখে পড়িলে কার প্রাণ না সচকিত হয়? তা হবে না কেন, হয় বৈ কি; কিন্তু তরুণ বালিকার কবিত্বরসময় সুকোমল হৃদয়ে উহা যেমন প্রীতিরস উৎসারিত করে, উহারা উভয় উভয়ের প্রকৃতিতে যেমন অনুপ্রবিষ্ট হয়, অপরের সঙ্গে তেমনটী হইবার সম্ভাবনা নাই।

ফুলের সৌরভে এবং সৌন্দর্য্যগৌরবে রসবতী রমণীর প্রাণ পাগল হইয়া উঠে। সে ফুল দেখিয়া ফুলের মত রূপবতী এবং সুন্দর কোমলকান্তি হইতে চায়। ফুল তাহার বড় লোভের সামগ্রী; আত্ম পর জ্ঞান থাকে না, ফুটন্ত ফুল দেখিলেই তার পানে সে ছুটিয়া যায়। এই জন্য অসভ্য সাঁওতাল কোলরমণী সুসভ্য বাবুর বাগানে প্রবেশ করে, তাহার ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই। ফুলের হাসি দেখিলে সে হাসিয়া ফেলে, এবং তাহার সঙ্গে কথা কয়, সখী সম্বোধনে তাহাকে আদর করে, অবশেষে তাহাকে অঙ্গের সঙ্গী করিয়া লয়। কুসুমিত তরু লতা দেখিলে কিশোরবয়স্কা বালিকার চিত্ত আরও উন্মাদবৎ হইয়া উঠে। কলিকা হইতে ফুটন্ত ফুল-গুলি সমস্ত শাখা পল্লবের সহিত ছিন্ন করিতে না পারিলে আর তাহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। ইহাতে বৃক্ষবাটিকা শ্রীহীন হউক, আর উদ্যান-স্বামীর হৃদয়ে ব্যথা লাগুক, আর যাহাই হউক, তাহা সে ভাবিতে পারে না। সে ফুল লইয়া খোঁপায় গুঁজিবে, কানে পরিবে, এবং পরাইবে, নাকে শুঁকিবে এবং শুঁকাইবে; চুলে বাঁধিবে, মালা গাঁথিয়া গলায় ধারণ করিবে, ঘর সাজাইবে, এই তার কাজ। ফুলের সঙ্গে তাহার আরো কত বিধ সম্পর্ক আছে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু হিন্দুর মেয়ে বাল্যকাল হইতে ফুলের প্রতি একটু আদর ও শ্রদ্ধা করিতেও শিখে। দেবপূজার উপকরণ কুসুমরাশিকে সে পবিত্র ভাবে আহরণ করিতে জানে।

বালিকা অন্যান্য ফুল সংগ্রহ করিয়া শেষ চাঁপাগাছ তলে আসিল। বৈশাখী চাঁপা সুবর্ণ লাবণ্যে গাছ আলো করিয়া হাসিতেছে, গন্ধে আকাশ প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহার প্রাণ হাঁকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। উচ্চ গাছের সরু ডালে ফুল সকল ফুটিয়া আছে, হাতে ধরিতে পারা যায় না। নানা রকমে সে চেষ্টা করিল, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। এক একবার বাতাসের ভরে নীচের দুই একটা ডাল তাহার হাতের কাছে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া ধরিতে না ধরিতে আবার তাহারা উপরে উঠিয়া গেল। প্রভা-তের মন্দ সমীরণ সচরাচর কিছু মন্দ লোক হয়। সে মুক্তবাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া বিলম্বে জাগ্রত নিদ্রাতুর বাঙ্গালী বাবুকে আটটা বেলা

পর্য্যন্ত শোষাইয়া রাখে, আলস্যমদে তাহার মনের বন্ধনকে শিথিল করিয়া দেয়, বিলাসীদিগের অন্তরে বিলাস রস উদ্দীপন করে, সুতরাং তাহাকে আমরা ভদ্রলোক আর কিরূপে বলিতে পারি। সে ঐ সময় সুযোগ পাইয়া সরলা বালার সঙ্গে একটু আমোদ কৌতুক আরম্ভ করিল। কুসুম-সুরা পানে বিভোর হইয়া তাহার নাসাপথে প্রবেশপূর্ব্বক মস্তিষ্ককে গন্ধামোদে মাতাইয়া শেষ কানের ভিতর দিয়া বাহির হইতে লাগিল। কার সাধ্য তাহার গমনাগমনের পথ বন্ধ করে? রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর, মলিন দুর্গন্ধময় স্থান হইতে পুষ্পবাসিত উপবন, কোথাও আর তাহার অগম্য স্থান নাই। সময়ে সময়ে স্ত্রী পুরুষ সকলকেই সে বড় লজ্জিত ও বিরক্ত করিয়া তোলে। এটা ভারি অন্যায় কিন্তু, না হইলে চলে না বলিয়াই কি এরূপ অভদ্র ব্যবহার উচিত হয়? সে কখন বালিকার ললাট-সংলগ্ন ঘর্ম্মবিন্দু মুছাইয়া, তাহার অলকদাম ঈষৎ কম্পিত করিয়া লম্বমান কেশগুচ্ছের ভিতর প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিল, কখন বা ধৃষ্টতার সহিত চুলগুলি উড়াইয়া পার্শ্বস্থ কণ্টক বৃক্ষশাখার সঙ্গে জড়াইবার চেষ্টা পাইতেছিল। কিন্তু তাহা পারিয়া উঠিল না। কারণ, বালিকা প্রাতঃস্নানের পর বাগানে ফুল তুলিতে আসিয়াছিল, তখন তাহার চুল শুকায় নাই, তৈল এবং সলিলযোগে তাহারা সকলে দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কাজেই মরুৎ ভায়া দলবলের ভয়ে এখানে আর বেশী কিছু অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে কুসুমসুবাসিত তৈলচর্চ্চিত সেই নিবিড় কুন্তলের সৌগন্ধের সহিত পুষ্পগন্ধ মিশাইয়া তিনি অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

চাঁপাফুল না লইয়া বালিকা বাড়ী ফিরিবে না, মাসী ঠাকুরাণীর বৈশাখী চাঁপার ব্রত আছে, চাঁপার বিশেষ প্রয়োজন। অনন্তর এদিক্ ওদিক্ খুঁজিয়া আঁকুশির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ব্যাকুল মনে অনন্যচিত্তে আঁকুশি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ দেখিল, চামেলী-কুঞ্জ-মধ্যে লোহার বেঞ্চের উপর বনকুসুম সদৃশ এক প্রিয়দর্শন যুবক বসিয়া রহিয়াছে। এই দর্শনটী সাধারণ দর্শন নহে, শুভযোগের দর্শন। পুষ্পচয়নকারিণী বালার অন্তরাত্মা চক্ষুর্দ্বার দিয়া যুবকের স্বচ্ছ যৌবনলাবণ্যপ্রভা ভেদ করিয়া একবারে তাহার আত্মাপুরুষকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে

প্রেমের সঞ্চার হয়। প্রথমে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; কেন না, প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ নাম ধাম স্বভাব প্রকৃতি তখন সে কিছুই অবগত নহে; কেবল প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল, একটা কি রকম যেন গোল মাল হইয়া গেল। পূর্ব্বেও সে ঐ যুবাকে দুই এক বার বাড়ীতে দেখিয়াছিল, কিন্তু অদ্যকার দেখার মত নহে। সকল কার্য্যেরই শুভ যোগ আছে। দেখিয়া আর তাহাকে সে বাহিরে রাখিল না, অলৌকিক নিয়মে আত্মস্থ করিয়া ফেলিল। যেন গলিত উত্তপ্ত স্বর্ণের উপর একটা স্পষ্ট রেখা বসিয়া গেল।

যুবক এক খানি গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করিয়া পত্রের মধ্যে অঙ্গুলী স্থাপনপূর্ব্বক অতীত বিষয়, অথবা প্রাকৃতিক সোভাব বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি কে, নিবাস কোথায়, বালিকার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধই বা কি, সে সকল পরিচয় ক্রমে জানা যাইবে। এক্ষণে বালিকা আপনার অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিয়া লউক। তদনন্তর যুবকের সাহায্যে সে কতকগুলি চাঁপাফুল সংগ্রহ করিয়া ত্বরিত পদে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিল। প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু প্রাণের টান টুকু চাঁপাগাছ তলে রাখিয়া গেল। যে হস্ত তাহাকে ফুল পাড়িয়া দিয়াছিল, চম্পককলিকা সম সেই করপল্লব ভাবিতে ভাবিতে, যুবকের মধুর সম্বোধন কর্ণকুহরে আলোচনা করিতে করিতে বিভ্রান্ত চিত্তে গৃহপ্রবেশ করিল। একটা অদৃশ্য অননুভবনীয় দুর্জ্জয় অথচ সুমিষ্ট শক্তি তখন তাহার তরল হৃদয়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। কেহ কেহ ইহাকে পূর্ব্বরাগ বলেন, কেহ বলেন নবানুরাগ, আমরা ইহাকে বলি শুভযোগের দর্শন। নূতন চক্ষে নূতন আলোকে নবভাবে নূতন মানুষ দর্শন। যে দর্শনে প্রাণ চঞ্চল, চিত্ত ভাবান্তরিত এবং মন উচাটন হয়, সেই দর্শন। প্রেমরাজ্যের দুরবগাহ্য গূঢ় নিয়মে ইহা ঘটিয়া থাকে। ইহার সাহায্যে লোকে আপনার মনের মানুষকে চিনিয়া লয়। বিস্তীর্ণ ভবপ্রান্তরে, নিবিড় লোকারণ্য মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবনির্ব্বন্ধে নরহৃদয়ের সহিত নারীহৃদয়ের মিলন হয়। অদৃষ্ট চক্র তাহাদিগকে মিলাইয়া দেয়, স্বয়ং প্রজাপতি ঘটক হইয়া আপনার স্নেহের পুত্র কন্যাকে আধ্যাত্মিক অনন্ত প্রেমবন্ধনে গ্রথিত করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট নিয়তি।

ভাগীরথী তীরে নন্দন গ্রামে বনমালী চট্টোপাধ্যায় নামে একটী ভদ্র গৃহস্থ বাস করিতেন, বাঞ্ছারাম নামে তাঁহার এক মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। বনমালী বাবু অতি সুচরিত্র ভদ্র স্বভাব ব্যক্তি, গ্রামস্থ সকলের শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্র। তিনি অল্প বয়সে বিষয় কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পেনশিয়ান গ্রহণ করেন। নিরাপদে নিরীহ ভদ্র লোকের মত সংসারে থাকিয়া সদ্গ্রন্থ পাঠ, ধর্ম্মচিন্তা, পরসেবায় জীবন যাপন করিবেন এই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। সেই ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিতেন। পুত্র বাঞ্ছারাম পিতার বড় বাধ্য অনুগত সন্তান। এই সুলক্ষণাক্রান্ত যুবার উপর সংসার সম্বন্ধীয় ভবিষ্যতের যাবতীয় আশা ভরসা ন্যস্ত রাখিয়া বনমালী মনে মনে এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। স্ত্রী পুত্র লইয়া বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতেন। স্ত্রীও বড় সতী সাধ্বী ধর্ম্মপরায়ণা, তিনি স্বামীকে দেবতার ন্যায় জানিয়া তদীয় পদ সেবায় পরমানন্দ অনুভব করিতেন।

আমাদের বাঞ্ছারাম ছেলেবেলা হইতেই একটু কেমন যেন অন্যমনস্ক রকম। এই দেখিলাম বয়স্য বালকদিগের সঙ্গে বেড়াইতেছে, দেখিতে দেখিতে কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে, আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হয় তো গ্রামের বহির্ভাগে সুদূর প্রান্তরের মাঝখানে একা এক গাছের তলায় চুপ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে, না হয় নদীর ধারে বসিয়া জলের খেলা দেখিতেছে। অসীম নীল নভমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘখণ্ড অস্তাচলগামী সূর্য্যের কিরণমালায় কেমন বিচিত্র শোভা ধারণ করে, তাহা দেখিবার জন্য বাঞ্ছারামের বড়ই একটা পিপাসা ছিল। সে মাঠে কিম্বা নদীর ধারে গিয়া এই সকল দেখিত, আর আপন মনে হাসিত। নির্জ্জন জলাশয়ে মাচ দেখিলে ধীবরের মন যেমন ব্যাকুল হয়, মৃগয়াপ্রিয় ব্যক্তি অরণ্যমধ্যে মৃগযূথ দর্শনে লোভবশতঃ

যেমন ব্যস্ত হইয়া পড়ে তৃণলতাসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র কিম্বা উর্ম্মীমালা শোভিত স্রোতস্বিনী তরঙ্গিনী, কিম্বা প্রমুক্ত সুনীল গগন দেখিলে এই তরুণবয়স্ক যুবকের মন তেমনি উন্মনা এবং বিচঞ্চল হইত। যেখানে ফুলের বাগান, যেখানে নদীর প্রবাহ যেখানে বৃক্ষরাজী এবং পাখীর গান, সেই সেই স্থানে নীরবে একা বসিয়া থাকিতে তাহার বড় ভাল লাগিত। কেবল যে প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্যই সে দেখিতে ভালবাসিত তাহা নহে, তাহার গম্ভীর ভয়াবহ প্রচণ্ড এবং প্রশান্ত দৃশ্যের প্রতিও তাহার বিলক্ষণ আকর্ষণ ছিল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহর রৌদ্র মাঠের মধ্যে বটবৃক্ষতলে, কিম্বা অমানিশার ঘনতমসাচ্ছন্ন নির্জ্জন ভগ্ন দেবমন্দিরের রোয়াকে, অথবা দিগন্তব্যাপী কৃষ্ণ মেঘাবৃত বজ্রবিকম্পিত ভীষণ গর্জ্জমান আকাশনিম্নে একাকী বসিয়া সে প্রকৃতির গম্ভীর এবং রুদ্র বেশ দর্শন করিত। যে যে স্থানে অন্যেরা ভয় পায়, বাঘ বাঘের সেই সেই স্থলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। যখন সে লোকালয়ে বয়স্য বালকবৃন্দের সঙ্গে থাকিত, তখনও একটু যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব। সর্ব্বদাই যেন কি ভাবিতেছে, লোকাতীত কোন রাজ্যে যেন বিচরণ করিতেছে, যাহারা কাছে তাহারা কাছে নয়, যাহা অদৃশ্য তাহার প্রতিই চিত্ত নিমগ্ন। মুখে বেশী কথাবার্ত্তা ছিল না, তবে পুনঃপুনঃ উত্তেজিত করিলে একটু হাসিয়া জটিল দুর্ব্বোধ্য বৈজ্ঞানিক ভাষায় দুই এক কথার প্রত্যুত্তর দিত। সহাধ্যায়ী বালকেরা এইরূপ ভাব স্বভাব দেখিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল ফাইলো। কেহ কেহ পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত।

বাঞ্ছারাম পণ্ডিতকে কেহ কখন চুল আঁচড়াইতে, কিম্বা আয়না বুরুষ ব্যবহার করিতে দেখে নাই। এই জন্য তাহার দীর্ঘ চুলগুলি চিরকাল বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকিত। শরীরের সংবাদ তিনি প্রায় কিছুই লইতেন না। সময়ে সময়ে স্নান দন্তমার্জ্জন, এমন কি আহারে পর্য্যন্ত ভুল হইত। কথাগুলি আস্তে আস্তে মৃদু স্বরে, সমস্ত কার্য্যই ধীর গতিতে। কখন কার সঙ্গে কাপড় চাদর ছাতা জুতা বদল করিতেন, এবং নিজের ঐ সকল ব্যবহার্য্য সামগ্রী কোথায় কখন ফেলিয়া আসিতেন তাহার ঠিক পাওয়া যাইত না। এক দিন ভুলক্রমে একটা ছোট মশারি দোছোট করিয়া বাহির

হইয়াছিলেন। আর এক দিন একটা পিরাণ বুকের দিক্‌টা পিঠে এবং পিঠের দিক্‌টা বুকে বিপরীত ভাবে গায় দিয়া বাহির হন। তাঁহার এই সকল অদ্ভুত বেশ ভূষা অনেকের হাস্যামোদের বিষয় ছিল। এ জন্য সহচর বালকগণ অনেক সময় তাঁহাকে একটু বায়ুরোগগ্রস্ত নির্ব্বোধ মনে করিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপও করিত। যে সকল কার্য্য স্বাভাবিক নিয়ম এবং প্রচলিত প্রথার বিরোধী তাহাতে যখন বালকবৎ সরল নির্দ্দোষ ভাব প্রকাশিত হয়, তখন তাহা দেখিতে নিতান্ত মন্দ লাগে না। বাঞ্ছারাম সরলতার অবতার বিশেষ। সে রাগিতে জানিত না; যে যাহা বলুক, এক নির্দ্দোষ মৃদু হাস্যে সমস্ত উড়াইয়া দিত।

এক দিন বাড়ীতে ঝি ছিল না, বাজার করিবার লোকের অভাব হইল। বনমালীর ভগ্নী রামমণি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, আজ একবার বাজারে যাইতে পারিবে কি? নৈলে ত আর রান্না হয় না।" বাঞ্ছারাম যে এ সকল কাজে নিতান্তই অপটু তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, "কেন পারিব না। দেও, পয়সা দেও, কি কি আনিতে হইবে বল, সব আনিয়া দিতেছি।" রামমণি বহুবিধ দ্রব্যের তালিকা দিয়া তাহাকে বাজারে পাঠাইলেন। বাঞ্ছারাম ভূগোল ইতিহাস মুখস্থের ন্যায় থোড় মোচা ডুমুর কাচকলা আলু পটোল শাক মাচ জপ করিতে করিতে বাজারে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু কিনিবার সময় অধিকাংশ দ্রব্য ভুল করিল। কতক পয়সা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল, কতক দোকানদারেরা ঠকাইয়া লইল। যাহা কিছু ক্রয় করিয়াছিল, তাহা গুছাইয়া বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেওয়া বড় মুস্কিল হইল। বাজারে লোকের ভিড়ে গা ঘামিয়া উঠিয়াছে, এক হাতে মাচ, অপর হাতে নিরামিষ কাঁচকলা শাক, বগলে একখান থোড, কাঁধে গামছায় বাঁধা অন্যান্য তরকারী। চাদর সামলাইতে কাছা কোঁচা খসিয়া পড়ে, কাপড় পরিতে গিয়া চাদর ধূলায় লুটায়। আনিতে আনিতে অর্দ্ধেক আলু পটোল পথেই পড়িয়া রহিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি দূরদর্শী মৎস্যলোভী চিলের পক্ষে এটী বড় শুভ ক্ষণ। অন্যমনস্ক অচতুর লোক দেখিলে তাহারা বেশ চিনিতে পারে। বাঞ্ছারাম যেন চিলের সেবার জন্যই মাচগুলি হাতে ধরিয়া প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। পথের মাঝে চিলে ছোঁ মারিয়া তাঁহার হাত হইতে মাচ লইয়া পলাইল, ভয় পাইয়া বাঞ্ছারাম অবশিষ্ট দ্রব্যাদি মাটীতে হরির লুট দিলেন। পথিকের সাহায্যে কোন প্রকারে শেষ বাজারসামগ্রী কিছু কিছু গৃহে আনীত হয়।

রামমণি পিসী দ্রব্যাদি দেখিয়া অগ্রে খানিক নাকে কাঁদিলেন, বাঞ্ছারামকে ভৎর্সনা করিলেন, শেষ ভ্রাতুষ্পুত্রের অযোগ্যতা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে ছেলে, তোর কি কোন ক্ষমতা নাই? হায় হায় হায়! গায়ে ধূল কাদা মেখে, ঘেমে ত্রিখণ্ডি হয়ে, মুখ রাঙ্গা করে! আর সব সামগ্রী পত্র কৈ? কি কি কিনে আন্‌লি হিসাব দে দিকি দেখি? এমন নির্ব্বোধ ছেলে তুই! হা আমার পোড়া কপাল! হাতে রক্তের দাগ কিসের? মাচ কৈ?" বাঞ্ছারাম হাসিয়া বলিলেন, "পিসী, চিলে ছোঁ মেরে হাত থেকে মাচ নিয়ে গেছে, তাই রক্ত পড়্‌ছে। এই নাও কি কি সামগ্রী এনেছি সব বুঝে সুঝে নাও, আমি আর বাপু অত হিসাব টিসাব দিতে পারিব না।" বাঞ্ছারাম এক খান পুস্তক মুখস্থ করিতে পারে, কিন্তু আলু পটোল থোড় কাঁচকলার হিসাবের কথা মনে হইলে তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়। রামমণি সেই দিন হইতে আর তাহাকে কখনও বাজারের ভার দেন নাই।

বাঞ্ছারামকে ভাল মানুষ পাইয়া অনেকে অনেক সময় ধমক দিত, নির্ব্বোধ বলিত, উপহাস বিদ্রূপ করিত, কিন্তু কিছুতেই কেহ রাগাইতে পারিত না। হয় তো যখন কেহ তাহাকে বকিতেছে, তখন সে অন্য বিষয় ভাবিতেছে; খানিক ক্ষণ পর বলিল, "অঁা, কি বল্‌চ? আমি শুনিতে পাই নাই।" সব মাটী হইয়া গেল। গঞ্জনা ভৎর্সনা উপহাসবাক্য অনেক সময় এইরূপে তাহার কর্ণে প্রবেশই করিতে পারিত না। সে সহজেই চিন্তামগ্ন হইয়া বাহ্যব্যাপার বিস্মৃত হইয়া যাইত। এত অল্প বয়সে কেন সে এমন গম্ভীর স্বভাব অনন্যমনা হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিলাম না, এই মাত্র কেবল শুনা গিয়াছে, যে সে বি, এ, ক্লাসে পড়িবার পূর্ব্বেই চিন্তাশীল জ্ঞানীদিগের বিজ্ঞানগ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক আয়ত্ত করিয়া অবসর কালে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মের

ছুটিতে ঐ সকল গ্রন্থ পড়িত। যাহার যে বিষয়ে স্বাভাবিক রুচি, সে আপনা হইতে সেই দিকে গমন করে। বাঞ্ছারামের মনের গঠন ঐ প্রকার ছিল, সুতরাং চিন্তাশীল জ্ঞানগ্রন্থ তাহার ভাল লাগিত। গ্রীষ্মকালে মাতুল ভবনে গিয়া ক্রমাগত দুই মাস কাল সে বড় বড় লোকের জীবনচরিত, মনোবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন করিত। পরীক্ষা পাঠ্যের উৎপীড়ন না থাকিলে এ পথে সে আরও অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই। এই চিন্তাশীলতা, তত্ত্বপিপাসা এবং গাম্ভীর্য্য বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সমস্ত বাধা বিঘ্ন প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাহার মনের গতি এই দিকে ধাবিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্মশানবৈরাগ্য।

প্রথম যৌবনেই বাঞ্ছারামের জীবনে এমন একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় যাহাতে তাঁহাকে একবারে সংসারসম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলে। ইহা না ঘটিলেও কোন কালে তিনি সাধারণ লোকের মত বিষয়াসক্ত সংসারী হইতেন কি না সন্দেহ; কারণ তাঁহার নিয়তি অন্য প্রকার ছিল। বাহিরের প্রতিকূল ঘটনা তাঁহার প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে নির্দ্দিষ্ট নিয়তির পথে লইয়া যাইবার পক্ষে কেমন অনুকূল হইয়াছিল পরে তাহা সকলে জানিতে পারিবেন। ইহাকে অদৃষ্টের লিখন বলিলে কোন ক্ষতি নাই। সেই অদৃষ্ট ফল ফলিবার পূর্ব্বে নিয়তির সহিত দৈনিক জীবনের গুরুতর ঘটনারাজীর সংঘাতে যে সকল অনন্ত ঘটনাবলী সমুৎপন্ন হয় তাহাই উপন্যাসের লীলা। শেষ যাহা অদৃষ্ট, বহুবিধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ও অবস্থাচক্রের ভিতর দিয়া তাহা পরিণামে দৃষ্ট হয়। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ না পড়িলে সে অদৃষ্ট কি তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বাঞ্ছারামের জীবনপ্রবৃত্তির ভবিষ্যৎ চরিত্রের নিদর্শন সময়ের কিছু অগ্রেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

বনমালী বাবু কুলীন বংশোদ্ভব, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। ইহাঁর পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষেরা বহুবিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি নিজে একটির অধিক দারপরিগ্রহ করেন নাই। করিবার প্রবৃত্তিও কখন হয় নাই। মনে মনে কৌলীন্য প্রথাকে ঘৃণা করিতেন। বিশেষতঃ তদীয় সহধর্ম্মিণী রমণীকুলের রত্নস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সাধুগুণে বনমালীর মন ধর্ম্মপথে অনেক দূর অগ্রসর হয়। মনুষ্যের যত প্রকার সহায় এ পৃথিবীতে আছে তন্মধ্যে সাধ্বী স্ত্রীর মত সহায় আর কেহ নাই। অনেক লোক স্ত্রীর গুণে ধর্ম্মের পথে স্থির থাকে এবং স্ত্রী-বিয়োগে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বিপথে গমন করে। বনমালীর ভাগ্যে শেষ তাহাই ঘটিয়াছিল। বাঞ্ছারামের জননী পুরীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন, সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিয়োগে পিতা পুত্র উভয়েই অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িলেন। গৃহলক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানে সংসার পরিবার শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বনমালীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। বাঞ্ছারাম বিষম শোকের আঘাতে আরও নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। এক জনের অভাবে পরিবারের সমস্ত বন্ধন একবারে শিথিল হইয়া পড়িল। কে আর তখন কাহাকে সান্ত্বনা দিবে? একা রামমণি পিসী, তিনি আর কোন্ দিক্ সামলাইবেন? এক দিকে পিতা, অপর দিকে পুত্র দুঃখ শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর বিরহে বনমালীর মনে অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। চিত্ত এমনি উদাস হইয়া গেল, যে গৃহকর্ম্মে আর তিনি মন দিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে শোকভগ্নহৃদয়ে হতাশ হইয়া এমনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তাহাতে জ্ঞান হয় যেন অর্দ্ধেক পরমায়ু ক্ষয় হইয়া গেল। এত যে সংসারে মায়া মমতা, সমস্ত নিঃশেষিত হইল। একমাত্র সন্তান বাঞ্ছারাম তাঁহার পানে একবার ফিরে চাহিতে ইচ্ছা হয় না। সন্তানের মুখপানে চাহিলে স্ত্রীবিয়োগশোক উথলিয়া পড়ে, প্রাণ পাগল হইয়া উঠে, নয়নজলে বুক ভাসিয়া যায়। সমস্ত সংসার তিনি শূন্য দেখিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েকটা দিন অত্যন্ত কষ্টে কাটিল। শয়নে স্বপনে উপবেশনে কেবল প্রিয়তমার মূর্ত্তিই মনে পড়িত।

শোকের প্রথম আঘাত কোনরূপে সংবরণ করিয়া একটু স্থির হইলেন। তদনন্তর ভবিষ্যৎ জীবন গৃহত্যাগী তপস্বীর ন্যায় অতিবাহিত করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া, গঙ্গাতীরে একটী ক্ষুদ্র উপবন ছিল তথায় এক কুটীর বাঁধিয়া তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। দিনান্তে একবার স্বহস্তে হবিষ্যান্ন ভোজন, গৈরিক বসন পরিধান, জপ তপ সন্ধ্যা আহ্নিক, গীতা ভাগবত যোগবাশিষ্ঠ অধ্যয়ন, ধ্যান চিন্তা ইত্যাদি নিয়মে কালাতিপাত করিতেন। চুল দাড়ি রাখিলেন, রুক্ষ স্নানবশতঃ চুলে ক্রমে জটা বাঁধিতে আরম্ভ হইল। ঠিক এক জন প্রকৃত যোগী সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ঘরে কেবল একা রামমণি পিসী বন্ধ্যা, জন্মবিধবা; তিনি সংসারভার সমস্ত বহন করেন, বাঞ্ছারামকে দেখেন শুনেন। পতিপুত্রহীনা বিধবা ব্রহ্মচারিণী হইয়াও তিনি সংসারভারে আক্রান্ত রহিলেন। গীতাপাঠক জ্ঞানী ব্যক্তি সহজে এরূপে নিষ্কাম ভাবে সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য প্রসন্ন চিত্তে বহন করিতে সক্ষম হন না। তিনি বৈরাগী হইয়া সকলকে বৈরাগ্যানলে দগ্ধ করিতে চাহেন। কিন্তু হিন্দুর বিধবা পরের সুখে সুখী, সে উদার প্রেমিক বৈরাগিনী। ভগবান্ স্ত্রীপ্রকৃতিকে এমনি এক আশ্চর্য্য উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ হিন্দুর বিধবাকে, যে সে সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াও ঘর সংসার করিতে পারে। আত্মীয় অন্তরঙ্গের সুখে তার সুখ। সে সকলের সেবা করিয়া নিজে উপবাসী থাকিয়া বিপুল উৎসাহের সহিত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করে। ইহাই তাহার প্রকৃতি, সুতরাং ইহাতে অপেক্ষাকৃত সে সুখী।

রামমণি পিসী সংসারের ঈদৃশ বিশৃঙ্খল ভাব আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। "আহা! মাতৃহীন বাঞ্ছারামের আমার কোন কিনারা হইল না! ঘর সংসার সব পাঁথারে ভাসিয়া গেল। বাছা আমার মনের দুঃখে কাহারো সঙ্গে কথা কয় না, ভাল খায় না, ভাল পরে না, কেবল কেতাবে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে।" এই ভাবিয়া তিনি এক দিন সেই গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া ভ্রাতার সন্ন্যাস বেশ দর্শন করত

তাঁহার শোক দুঃখ আরও মহাবেগে উথলিয়া উঠিল। স্ত্রীজাতি আপনি অনায়াসে সন্ন্যাসিনী হইয়া সকল সুখ বিলাস ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আত্মীয়গণের নিরামিষ ভোজন বৈরাগ্য ত্যাগস্বীকার সহ্য করিতে পারে না। আপনি ব্রহ্মচারিণী হইয়াও সে আত্মীয় প্রিয় জনের নিমিত্ত মৎস্য মাংস রন্ধন পরিবেশন করে। ভ্রাতার বৈরাগ্য বেশ দেখিয়া তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। ক্ষণ কাল পরে বনমালীকে অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁরে বনমালী, এই কি তোর ধর্ম্ম। আচ্ছা, তুমিই না হয় সন্ন্যাসী হইলে, কিন্তু দুধের ছেলে বাঞ্ছারামকে কেন পাঁথারে ভাসাইবে? তোমার না হয় বয়স হইয়াছে, ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে আছ, থাক; বাছাকে আমার কেন পথের ভিখারী কর? আহা সে যে মা বাপ বিনে ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। ছেলে আমার তিন চারটে পাস দিয়েছে, দুদিন পরে চাকরি করে টাকা আনবে, কত সাধ আহ্লাদ করব, বিয়ে থা দেব, বিধাতা তাতে বাদ সাধলেন। এখন তুমি এক কাজ কর, ছেলের একটা বিয়ে দেও, দিয়ে ঘর সংসার বজায় করে তার পর আপনি যা ভাল বোঝ তা করগে। বল্‌লে তো শুনবে না, তোমারই কি এ বয়সে এরূপ করা সাজে? আপনি বিয়ে করবে, ব্যাটার বউ নিয়ে সুখে ঘর সংসারে থাকিবে, দিব্বি আমোদ আহ্লাদে ক্রিয়া কর্ম্ম হবে, সব একবারে ভেঙ্গে দিলে। তোমাকে আর বলিয়াই বা কি হবে, সকলি বিধির বিড়ম্বনা। এখন যা বল্লেম তাহা যদি ইচ্ছা হয় কর। আমি এখন বাড়ী যাই, ঘর কন্না মেটিয়ে গেল দেখিগে।" কি চমৎকার স্বার্থহীন মায়া! রামমণির চরিত্র দেখিলে হিন্দুর গৃহে যে বিধবা সন্তানহীনা রমণীর জন্য একটা উচ্চতর পবিত্র আসন প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা নির্লিপ্ত নিষ্কাম সাংসারিকতা।

বিধবা ভগ্নীর নিস্বার্থ স্নেহের কথাগুলি বনমালীর প্রাণে বড় লাগিল। পুত্রের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ করত তিনি নিজেও কিছু মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, "সত্যই ত বটে, সন্তানকে কেন আমি পাঁথারে ভাসাইব? তাহার একটা কিনারা করিয়া আমার দেওয়া নিতান্তই উচিত হইতেছে। সুশিক্ষা আর বিবাহ, এই দুইটী পিতার

প্রধান কার্য্য। একটা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি, অবশিষ্টটীও করিতে হইবে। আর বাস্তবিকও এ কথা ঠিক, বাঞ্ছারাম যদি গৃহধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হয়, আমার বৈরাগ্য রক্ষা পাইবে না। অপত্য স্নেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া কি আমি অন্তঃকরণ হইতে সহজে দূর করিতে পারিব? তাহাত বোধ হয় না। সুতরাং ইহাতে আমার তপস্যার ব্যাঘাত জন্মিবে। সংসারের সকল বিলি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সাধন ভজন অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। ভগ্নীর কথা আমি উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। আর এ সাধন ভজন যোগ তপস্যাওত দুই পাঁচ দিনের কর্ম্ম নয়, অনেক কাল ইহা লইয়া থাকিতে হইবে; তাহার ভিতর কত উৎপাত ঘটিতে পারে কে জানে? অতএব সে সকল ঝঞ্ঝট মিটাইয়া ফেলাই ভাল।" এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কিছু দিনের জন্য তপোবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি পুত্রবধূর অন্বেষণে বাহির হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘটনাচক্র।

বনমালী প্রথমে বসন্তপুর গ্রামে আপনার শ্বশুর ভবনে গিয়া উপস্থিত হন। আহার পরিচ্ছদ, সাধন ভজন, জপ তপের যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন তদনুসারে চলিতে লাগিলেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া সংসার সম্বন্ধে এক কালে নিশ্চিন্ত হইয়া বৈরাগ্যধর্ম্ম পালন করিবেন এইটী আন্তরিক অভিপ্রায়।

বসন্তপুর একটী ভদ্রগ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণ সজ্জনের বসতি। নিশানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বনমালীর সম্বন্ধী তথায় বাস করেন। নিশানাথ নিঃসন্তান, স্ত্রী বন্ধ্যা, প্রগল্ভা, স্থূলাঙ্গী এবং প্রতাপশালিনী। তিনি হিন্দু আচার ব্যবহারের অত্যন্ত পক্ষপাতিনী। মূর্ত্তি খানি নিরেট চাঁচা ছোলা। আল্তাপরা দুইখানি পায়ে বিশ পঁচিশ ভরি রূপার ডায়মনকাটা গোল-

গোল দুই গাছা মল, হাতে সোণার বাউটি ও দুই গাছি তাগা। কানে ঢেঁড়ি ঝুমুকো, গলায় এক গাছি দড়া হার। মাথার সিঁতিতে টাক পড়িয়া সে স্থানটী রাজপথের মত প্রশস্ত হইয়াছিল, তাহাতে তেল সিন্দূর শোভা পাইত। নামটী ইহাঁর নয়নতারা, ভারি জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। নায়েব গোমাস্তা দরোয়ান চাকরদের ধমক দিতেন, বাড়ীর খরচ পত্র তাঁহার হাতে থাকিত। নিশানাথের উপর বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল। তিনিও ইহাঁকে ভয় করিয়া চলিতেন। সন্তানাদি না হওয়ায় এবং পুরুষোচিত কার্য্য করায় তাঁহার প্রকৃতি কতকটা পুরুষের মত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীনা শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার ভয়ে কাঁপিতেন।

নিশানাথ বাবুর বাড়ীটী প্রশস্ত এবং দুই তালা, চারি দিকে স্থান অনেক; পুষ্করিণী বাগান অন্দর ও বাহির বাটী লইয়া বোধ হয় বিশ বিঘার কম হইবে না। বাহির মহলে পূজার দালান, তাহার সম্মুখে একখানি আটচালা। তৎ পার্শ্বে বৈঠকখানা ও কাছারি ঘর। পল্লী-গ্রামের জমিদার, তাহাতে আবার এজমালির সম্পত্তি, ঘর দ্বার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দ্রব্যাদি সকল সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন থাকিবে আশা করা যায় না। উঠানে কোথাও জ্বালানি কাষ্ঠের রাশি, কোথাও দুই চারিখানা ভাঙ্গা পাল্কী; এক কোণে অতিথিদিগের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট পাতা ও হাঁড়ি সরাব স্তূপ, অপর কোণে দুই চারিটা গোরু বাঁধা। আটচালার ভিতর এক দিকে গ্রাম্যদেবতাবৎ বৃদ্ধ ষাঁড় দাঁড়াইয়া মুদ্রিত নয়নে অতি প্রশান্ত ভাবে রোমন্থন করিতেছেন, মাঝখানে দুই পাঁচটা ক্ষুধার্ত্ত অশিক্ষিত অসভ্য কুকুর অলস কুটুম্বদিগের ন্যায় দিবানিদ্রায় বৃথা সময় নষ্ট করিতেছে। তাহারা যে কেবল সেখানে শুইয়া থাকে তাহা নহে, কঠিন মৃত্তিকাশয্যাকে নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধূলার গদি প্রস্তুত করিযা লইয়াছে। আশে পাশে কোথাও সামিয়ানা, কোথাও পর্দ্দা, কোথাও নিশা-নের ছড়, কোথাও প্রতিমার কাঠামো। এ অঞ্চলে বাবুদের প্রায় গমনা-গমন নাই, কেবল পূজা পার্ব্বণের সময় তাঁহারা আসেন। তাহার কিছু পূর্ব্বে পুরাতন দেওয়ানজী মহাশয় একবার তদারক করিয়া যান। দালানের দক্ষিণ পার্শ্বে বাস্তু দেবতা কুটুম্বদের ঘর; সেখানে দুই চারি জন পিসতুত

ভাইয়ের মামা, মামাত ভাইয়ের পিসে, খুড়তত সম্বন্ধী, মাসীমায়ের দেওর, মামাশ্বশুর ইত্যাদি নিয়তই বিরাজ করেন। তাঁহাদের কাজের মধ্যে তামাকু সেবন, আর নিদ্রা, আর মাঝে মাঝে বাবুদের বৈঠকখানার এক কোণে বসিয়া থাকা। পাশা কিম্বা তাস খেলিবার সঙ্গী না জুটিলে তাঁহাদের অস্তিত্ব কিছু কাজে লাগে। ইহাঁরা কুটুম্বের কুটুম্ব। জমিদার বাবুদের বাড়ীটীর কোথাও চুণ বালি খসিয়া পড়িতেছে, কোথাও জল বসিয়া ছাতা ধরিয়াছে, কোথাও বা অশ্বত্থ গাছ বাহির হইতেছে, কোথাও ফ্লোরের নীচে গন্ধ-গোকুলা এবং ভাঁদড়ে বাসা করিয়াছে, কেহই সে বিষয়ের তত্ত্ব লইবার লোক নাই।

নিশানাথ যে অংশে বাস করিতেন তাহা বেশ পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, সুসজ্জিত। তিনি প্রায় বাড়ীর ভিতরেই থাকিতেন, এবং অন্দরের পার্শ্বে আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া পড়া শুনা করিতেন। কোন ভদ্র লোক বেড়াইতে আসিলে তাঁহারই কাছে যাইত, এবং থাকিত। গৃহসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানটী তাঁহারই সুরুচির পরিচায়ক। বর্ত্তমান সভ্যতার নিয়মে তিনি থাকিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু নয়নতারার শুচি বাইয়ের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পারিয়া উঠিতেন না। বাড়ীতে একটী অনাথা কন্যা থাকে, তাহাকেই সন্তান নির্ব্বিশেষে দুই জনে পালন করেন। কন্যাটী নিশানাথের পত্নীর ভগ্নীর দুহিতা। ভাগিনেয় বাঞ্ছারাম কালেজের ছুটির সময় এখানে আসিত এবং দুই এক মাস থাকিয়া যাইত।

বনমালীর স্ত্রী বিয়োগ ঘটিলেও শ্বশুর বাড়ীর আদর যত্ন কিছু কমে নাই। জামাতাকে তাদৃশ সন্ন্যাস বেশে দর্শন করিয়া নিশানাথের মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। একে কন্যার মৃত্যুশোক, তাহার উপর জামাতার উদাসীন মূর্ত্তি, দুয়ে মিশিয়া তাঁহার শোক সন্তাপ দ্বিগুণিত করিল। পরলোকগতা দুহিতার নাম ধরিয়া কত ক্ষণ কাঁদিলেন। তাঁহার রোদন শুনিয়া বনমালীর চক্ষেও জল আসিল। অনন্তর শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য আদর যত্ন প্রকাশ করিলেন, আসনে বসাইয়া জল খাইতে দিলেন। পরে বনমালীর যে জন্য তথায় আগমন তদ্বিষয়ে শাশুড়ী সম্বন্ধী এবং বাড়ীর কর্ত্রীর সহিত অনেক কথা বার্ত্তা হইল।

বেলা অবসান প্রায় হইয়াছে, অন্তঃপুর মধ্যে এক নির্জ্জন গৃহে সন্তোষিণী একাকিনী বসিয়া এক খানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। গ্রন্থ পড়িতে বসিয়াছেন বটে, কিন্তু সে দিকে মনোযোগ নাই। সুতরাং যাহা পড়িতেছেন তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। মনের ভিতর অন্য এক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে। বোধ হয় বনমালীর তথায় আগমনের উদ্দেশ্য তিনি শুনিয়াছিলেন। এই জন্য চিত্তের গতি অতি চঞ্চল। কেন না, তিনি যাহাতে আসক্ত তাহারই বিবাহের জন্য চেষ্ট হইতেছে। এই রূপ চিন্তাবিক্ষিপ্ত মনে গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় চপলা সুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চপলা বলিল, "ভগ্নী, অত পড়ে শুনে আর কি হবে? স্ত্রীলোকের বিবাহগত প্রাণ, স্বামীর সোহাগ না পাইলে সে জীবন বিকসিত হয় না, অধিক পড়া শুনায় কেবল উদরের পীড়া জন্মে, শরীর শুকাইয়া যায়, ভেবে ভেবে মাথা ঘোরে, চুল পাকে, নানান রোগে ধরে, এ বিষয়ে আমি এক জন ভুক্তভোগী। স্বামীর শান্তিপ্রদ শীতল ছায়ায় বসিয়া প্রাণটী ঠাণ্ডা হইলে তার পর এ সকল পড়া শুনা ভাল লাগে। তখন পাঠ্য গ্রন্থের মর্ম্মও বুঝা যায়, তদ্ভিন্ন সকলই অন্ধকার। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কেন বাঞ্ছারামের বাপের বিবাহ হউক না। দেখিতেও বেশ সুন্দর পুরুষ, বয়সও তেমন কিছু বেশী বোধ হয় না। দোজবরে ভিন্ন তোমার কপালে কি আর ভাল জুটবে? কত দিন আর এ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকিবে? আহা! ভগ্নী, তোমার কষ্টের কথা মনে হইলে আমার কান্না পায়। কুলীনের বিধবাদের বড় কষ্ট।"

সন্তোষিণী একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "দিদি, তুমি আপনিই যে সব কথা মীমাংসা করিয়া লইলে? আমি যে বিধবা তাহারই বা প্রমাণ কি? আর যদিই বা বিধবা হই, তাহা হইলে হিন্দু সমাজে পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা কোথায়? শুন নাই কি, এই দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহ পাত করিয়াছেন? তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া কি দেশের লোক কাঁদিল? এ হতভাগ্য হিন্দু জাতি উৎসন্ন যাইবে, পাপস্রোতে দেশকে ডুবাইবে, তথাপি বিধবার দুঃখে কর্ণপাত করিবে না। বাঞ্ছারামের পিতা বিবাহ করিবেন এ কথা তুমি কোথায় শুনিলে? উনি যে পুত্রের বিবাহের জন্য কন্যা

দেখিতে আসিয়াছেন। তাও বটে, আর উনি যে এখন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। দেখ নাই কি, কেমন ঋষি তপস্বীর মত গেরুয়া কাপড়পরা, চুল দাড়ি রেখেছেন, নিজ হাতে রেঁধে খান। এমন ধার্ম্মিক লোকে কি আর দুবার তিন বার বিয়ে করে? বিশেষতঃ যে স্ত্রী তাঁহার মারা গিয়াছেন তিনি বড় সতী লক্ষ্মী ছিলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা এখনো ওঁর খুব আছে। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম চিরকালের জন্য, দেহের বিচ্ছেদে তাহার অন্ত হয় না, মেসো মহাশয়ের কাছে আমি শুনিছি। সে প্রকার প্রেম কাহারো সঙ্গে একবার যদি হয়, তাহা ভুলিবার ক্ষমতাও থাকে না। তাহাতে এক জন আর এক জনের সঙ্গে একবারে মিশিয়া অভেদ হইয়া যায়, এ কথাও আমি কত পুস্তকে পড়িয়াছি।

চপলা বড় মুখরা এবং চতুরা, বনমালী যে পুনরায় বিবাহ করিবেন না, কি করিতে পারেন না, ইহা তাহার মনে লাগিল না। সে স্বাভাবিক সংস্কারের গুণে বলিল, "ভাই, পুস্তকই পড়, আর উপদেশই শ্রবণ কর, আমি ও সব অনেক দেখিছি। শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হইলে দুই পাঁচ দিনের জন্য এরূপ অনেকে করিয়া থাকে। কিন্তু মনের একটা ক্ষণিক উত্তেজনায় কি স্বভাব কখন বদল হয়? তা হয় না। কোন কোন লোকের কথা শুনা যায় বটে, তাহারা কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে একবারে নূতন জীবন পাইয়াছে, কিন্তু সচরাচর তাহা ঘটে না। আমি বলছি, তুমি দেখে নিও, উনি আবার বিবাহ করিবেন। আমি ওঁর চেহারা দেখেই তা বুঝতে পেরিছি। আর নাই বা করিবেন কেন? ভবের বাজারে বৈরাগ্য কি এতই সস্তা? সংসারের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল, বয়সও আছে, তাহা ছাড়া বাড়ীতে অন্য কোন স্ত্রীলোক নাই যে সেবা ভক্তি করে। তোমার সঙ্গে হউক না হউক, অনেকে উহাঁকে মেয়ে দিবার জন্য সাধা সাধি করিবে। আমার ইচ্ছা যে তোমার সঙ্গে হয়, ভগবান্ আমাদের দল বৃদ্ধি করুন।"

চপলা উঠিয়া গেলে সন্তোষিণী ভাবিতে লাগিলেন, "আমিত কেবল বাঞ্ছারামকেই বাঞ্ছা করি, অন্য কাহারো সহিত বিবাহ হউক না হউক, সে জন্য কোন দুঃখ নাই। কিন্তু আমার বাঞ্ছা কি পূর্ণ হবে? বাঞ্ছারাম

হিন্দু পরিবারস্থ কুলীন সন্তান, তাতে বি. এ, পাসকরা। আমার এ আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়া মনে হইতেছে। যদি আমি সধবা বলিয়া প্রমাণীত হই, তাহা হইলেত বিবাহের পথ একবারেই বন্দ। আর যদি বিধবা হইয়া থাকি, তাতেই বা আশা কোথায়? মাসী মায়ের যে রূপ দুর্জ্জয় প্রতাপ, মেসো মহাশয় কি এত দূর সাহস করিতে পারিবেন? কোন দিকেই আর কূল কিনারা দেখা যায় না। যাহা হউক, আশাতেও তবু অনেক সুখ আছে। আমার মন এ সুখের আশা ছাড়িবে না। ছাড়িয়া কি লইয়া থাকিব? সে বার যে তিনি কত যত্ন আগ্রহের সহিত আমাকে চাঁপাফুল পাড়িয়া দিয়াছিলেন সেটা কি ভালবাসার চিহ্ন নয়? যে পর্য্যন্ত না আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম ততক্ষণ তিনি সেই গাছ তলাতেই ছিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আর কি ফুল চাই?' ইহাতেও আমার প্রতি যেন তাঁর একটু বিশেষ টান বুঝা যায়। যদি কখন সুযোগ ঘটে আমার মনের ভাব তাঁর কাছে প্রকাশ করিব। প্রকাশ করিবই বা কিরূপে তাওতো বুঝিতে পারি না। দেখি, কোন ছলে কৌশলে আকার ইঙ্গিতে আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি কি না। গোপনে গোপনে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের আলাপ পরিচয় কি হইতে পারে না?"

পাঠক মহাশয়রা বুঝিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, বাঞ্ছারামের প্রতি সন্তোষিণীর ভালবাসাটা এক তরফ। কেন না, যাঁহার প্রতি তিনি মনে মনে এত আসক্ত তাহার হৃদয়ের প্রেমকুসুম এখনো পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত হয় নাই। বাঞ্ছারাম চিন্তাশীল এবং অধ্যয়নশীল যুবা, এত দিন পরীক্ষার পাঠেই অধিকাংশ মনোযোগ সমর্পিত ছিল। অন্য কোন আমোদ প্রমোদ রস বিলাস তিনি জানিতেন না, আমোদের মধ্যে কেবল প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন, নির্জ্জনে একাকী চিন্তা ও ভ্রমণ, ইহাই ভাল লাগিত। লোকসঙ্গে অবস্থান, লোকচরিত্র অধ্যয়ন, মানবস্বভাবের সৌন্দর্য্য দর্শন, কি সামাজিকতার উৎকর্ষ সাধন এ সকল বিষয়ে আদৌ তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। থাকিবার মধ্যে কেবল এইটি ছিল, যে বড় বড় লোকের জীবনচরিত মধ্যে মধ্যে পাঠ করিতেন। সেও যাহারা যাহারা বুদ্ধি বিদ্যাসম্পন্ন জ্ঞানী পণ্ডিত অদ্বৈতবাদী তাহাদের, ভাবুক প্রেমিক বিশ্বাসী ভক্তের নহে।

সুতরাং সন্তোষিণী আপন মনে কি ভাবিতেছেন, কি করিতেছেন তাহার সংবাদ কে লয়? তিনি যে ভালবাসার চিহ্ন দেখিয়াছেন মনে করেন, সে কেবল তাঁহার নিজের অনুরাগপ্রসূত কল্পনার কুহক মাত্র। স্বকপোল কল্পিত কল্পনায় যত কিছু প্রিয় সামগ্রী ছিল তদ্দারা তিনি বাঞ্ছারামকে সাজাইয়া একটী আদর্শ প্রতিমা রূপে তাহাকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইলেন। দিনের পর দিন হৃদয়াভ্যন্তরে যত নব নব অনুরাগ আশা পিপাসার তরঙ্গ উথলিত হইতে লাগিল, তৎসমুদায় ঐ মানসপুত্তলিকাতে তিনি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। নবীনা রমণীর প্রণয়লালসার অদম্য প্রেমাকাঙ্ক্ষা কে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে? সে গভীর রাজ্যে অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। প্রাণের নিভৃত নিলয়ে বসিয়া সন্তোষিণী যত পারিলেন বাঞ্ছারামকে সাজাইলেন, আপনি আপন মনে কত ভাবে কত আশার খেলা খেলিলেন, আদরের ধনকে আদর করিতে লাগিলেন, বালিকারা খেলনা পুতুলের প্রতি যেমন করে তেমনি করিলেন। ঘটনালেখক এবং পাঠক ইহাকে কল্পনা মায়া স্বপ্ন পাগলামি যাহা ইচ্ছা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, কিন্তু প্রেমপিপাসু যুবতীর পক্ষে এ কথা খাটে না। সে কল্পনাকে সত্য মনে করিয়া সুখী; কেবল সুখী নহে, তাহার উপর ভবিষ্যতের সকল আশা ভরসা স্থাপন করিয়া সে নিত্য নব নব রসোল্লাসে উল্লসিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

পর দিবস নিত্যকৃত্য সমাধান্তে বনমালী রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, নিশানাথের পত্নী আহার্য্য বস্তুর আয়োজন করিয়া দিতেছেন, শাশুড়ী ঠাকুরাণী কপাটের আড়ালে বসিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে ক্রন্দনের স্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আমার পোড়া কপাল পুড়ে গেছে, পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল কে আর খণ্ডাবে? তা যা হইবার হইয়াছে, এখন বাবা, তুমি

কি এইরূপ সন্ন্যাসীর বেশে বেড়াবে? আমি বেঁচে থাকতে এটা চক্ষে দেখতে পারব না। আমার একটী দেওরঝি আছে, বয়েসেও বেশ সেয়ানা, বিবাহের যোগ্য বটে, আমার বড় সাধ, সে মেয়েটীকে তোমার হাতে দিই। যে মেয়ে আমার মরে গেল তাকে আরতো পাব না, কিন্তু তোমার মত জামাই কেন আমি হারাব? বাবা, এ অনুরোধটী শোন, আর এমন করে বেড়িও না, যাতে ঘর সংসার বজায় থাকে তা আগে কর, নৈলে মনে বড় কষ্ট পাই। বাঞ্ছারামের বিয়ে পরে দিও, আগে ঘর বজায় কর। আহা! আমার কি দুঃখের কপাল। মেয়ে আমার ব্যাটার বউ দেখে যেতে পারলে না, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই বিদেশে প্রাণটা হারালে।" এই বলিয়া তিনি সেই পরলোকগতা কন্যার উদ্দেশে দুই এক ফোঁটা চক্ষের জলও ফেলিলেন। নিশানাথের পত্নী নয়নতারা দেবীর এ প্রস্তাবে সহানুভূতি ছিল।

বনমালীর মন উদাস, ধর্ম্মসাধনে সর্ব্বদা অনুরক্ত, অন্তরে বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বলিতেছে, সাধ্বী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর বিয়োগ শোকের নিদারুণ মর্ম্মবেদনা তখনো পর্য্যন্ত সম্যক উপশমিত হয় নাই, তদ্ভিন্ন গত কয়েক মাস নির্জ্জনবাস এবং গীতা ভাগবত যোগবাশিষ্ঠ পাঠের ফলে সংসারটা যে ক্রমাগত রূপান্তর অবস্থান্তর হইয়া সরিয়া সরিয়া যাইতেছে এ জ্ঞানটা বড় উজ্জ্বল হইয়াছিল। এই জন্য বৃদ্ধা শোকাতুরা শাশুড়ীর প্রস্তাব মনে স্থান পাইল না। তিনি আপনার ভাবে ভোর হইয়া রাঁধিতে লাগিলেন, কোন কথার উত্তর দিলেন না। প্রস্তাবটা যেন পাখীর মত হৃদয়ের উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার দাগ ভিতরে বসিল কি না, কেহ জানিতে পারিল না।

বনমালী বাবুর এই বর্ত্তমান বৈরাগ্য বেশ যদিও আত্মীয় প্রিয়জনের শোকউদ্দীপক, কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। দাড়িগুলি কাঁচায় পাকায় মিলিত, বেশী লম্বা নয়; গায়ের বর্ণটী বেশ পরিষ্কার গৌর বর্ণ, দেহ খানি হৃষ্ট পুষ্ট এবং তাহাতে বৈরাগ্যের পবিত্র গন্ধ। খুব মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে মুখে কিঞ্চিৎ শোকের কালিমা যেন নয়নগোচর হয়, কিন্তু সে মুখ নিতান্ত নিরাশান্ধকারাচ্ছন্ন অপ্রসন্ন নয়, বরং হঠাৎ দেখিলে অতীব প্রশান্ত

বলিয়াই বোধ হয়। গৌরবর্ণ সুস্থকায় পুরুষ, চিরকাল টানা পাখার বাতাসে আফিসে বসিয়া কেরাণীর কাজ করিয়া আসিয়াছেন, প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ কিম্বা জলসিক্ত শীতল ঝঞ্ঝা বায়ুর কঠোর আঘাত কখন সহ্য করিতে হয় নাই, শরীর চিরকাল ধর্ম্মপত্নীর সেবা শুশ্রূষায় অক্ষুন্ন অবস্থাতেই ছিল। এক্ষণে ইহাতে আর এক প্রকার সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে। নির্ম্মল দেহ কান্তির উপর গৈরিক বসন, মুখমণ্ডল তপস্যার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল, চক্ষের দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী, ধীর পাদবিক্ষেপ, মৃদু বাক্য, দর্শন মাত্রেই মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ বিলাসবাসনোন্মত্ত সংসারাসক্ত জনসমাজে এরূপ প্রিয়দর্শন দিব্যলাবণ্য সাধু পুরুষের দর্শন অতীব সুদুর্লভ; ইহার প্রভাবে মানবের মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

বনমালীর শাশুড়ী যে দেওর ঝির জন্য বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেটী তাঁহার বড় অনুগত, এই জন্য মায়া এত বেশী। বনমালী পুত্রের বিবাহের জন্য তখন ব্যস্ত. সুতরাং মনে মনে ভাবিলেন, "যদি মেয়েটী সুন্দরী হয়, তবে একবার দেখা যাউক।"

এই স্থির করিয়া কন্যা দেখিতে গেলেন। কুলীনের মেয়ে, একটু শেয়ানা হইয়াছে, দূর হইতে দেখিতে অতি সুন্দরী, গৌর বর্ণ, রঙ্গীন বসন, তাহার উপর স্বর্ণালঙ্কার, নারীযৌবনের সঙ্গে এই তিন যখন মিলিত হয়, তখন রূপতৃষিত চক্ষু আর মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। ভিতরে কি আছে না আছে মন তখন তাহা দেখিবার অবসর পায় না। দর্শন মাত্রে চক্ষের উপর বাহিরের উজ্জ্বল ছবি খানি মুদ্রিত হইয়া যায়। এ কাজটা বিচার চিন্তা গবেষণার উপর তত নির্ভর করে না, অজ্ঞাতসারে ইহা মানবচিত্তে আপনার অনতিক্রমনীয় প্রভাব বিস্তার করে। ইহা এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া, মানুষকে ইহাতে একটু ভাবান্তরিত করিয়া ফেলে; বিশেষতঃ যেখানে পুরুষ প্রকৃতির মিলন, সেখানে একটী অভাবনীয় দুর্দ্দমনীয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ব্রতধারী শুদ্ধাচারী সংযতমনা বনমালী এই রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া একটু বিচলিত হইলেন, ঠিক যেন বালির বাঁধের নিম্নে একটু বন্যার জল প্রবেশ করিল, ধর্ম্মগ্রন্থি নিমেষের মধ্যে শিথিল হইয়া গেল, জীবনের মূলে আঘাত

লাগিল। এ সকল কার্য্য এত শীঘ্র আরম্ভ হয় যে লোকে সহসা ধরিতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যই এইরূপে অলক্ষিত ভাবে প্রথমে আরম্ভ হইয়া থাকে। মানসিক দৌর আন্দোলনের মধ্যে ইহার কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয়, এই জন্য আসল ব্যাপারটা কি তাহা সহসা লোকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু পরিণামে তাহা মূর্ত্তিমান আকার যখন ধারণ করে তখন বুঝা যায়। এমন অবস্থায় বুঝা যায় যখন আর তাহাকে তাড়াইবার কোন ক্ষমতা থাকে না।

বনমালী মায়ার ফাঁদে পড়িয়া গেলেন। শাশুড়ীর প্রস্তাবটাই তখন মনে সর্ব্বাগ্রে উদিত হইল। যে সময় প্রস্তাব প্রথমে শ্রবণ করেন তখন আমাদের মনে হইয়াছিল, বুঝি বা কথাটা ভাসিয়া গেল, হৃদয়ে প্রবেশাধিকার পাইল না; বাহ্যাবস্থা দর্শনে এরূপ মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাহা একবারে ভাসিয়া যায় নাই, হৃদয়কে ঈষৎ স্পর্শ করিয়াছিল। সুযোগ পাইয়া এক্ষণে মস্তক উত্তোলন করিল। তখন বনমালীর মনে এই যুক্তির আবির্ভাব হইল যে, "শোকাতুরা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর অনুরোধ উপেক্ষা করাটা কি ঠিক? অন্যান্য যুক্তিও আসিয়া জুটিল। ইচ্ছা যেখানে প্রবল প্রবৃত্তির অধীন, সেখানে আর যুক্তির অভাব কোথায়? পুত্রের জন্য অপর স্থানে পাত্রী অন্বেষণ করিব, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া আপনি পুনর্ব্বার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কন্যার অভিভাবকদিগকে মনের কথা তখন ভাঙ্গিয়া বলিলেন না, বলিলেও তাঁহাদের কোন আপত্তি হইত না। যাহা হউক, মনের ভাব তখনকার জন্য গোপন রাখিয়া সেই বাড়ীতে আর একটী অনূঢ়া বালিকা ছিল তাহারই সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। অভিভাবকদিগের যে একটু আপত্তির সম্ভাবনা ছিল তাহা ইহাদ্বারা খণ্ডন হইয়া গেল। কেন না, তাহারা সামান্য কন্যাকার জন্য আর একটী কন্যা দিয়া বাঞ্ছারামের মত উৎকৃষ্ট জামাতা লাভ করিল। বনমালী ইহাতে লাভবান্ হইলেন। সুন্দরী স্ত্রীরত্ন এবং কিছু নগদ টাকা পাইলেন। কন্যাটী বাঞ্ছারামের মনোনীত হইবে কি না, সে বিষয় ভাবিবারও আর তখন তাঁহার অবসর রহিল না। বাস্তবিক মেয়েটী বিবাহের সম্পূর্ণ অযোগ্য। বয়স কম, নিতান্ত কৃশাঙ্গী, মাথায় চুল নাই, বর্ণ যদিও কাল

নয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যের বড়ই অভাব, পেটে বোধ হয় এক আধটু পিলেও ছিল। বনমালী যদি নিজের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া না পড়িতেন, তাহা হইলে এরূপ পাত্রীর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিতে কখনই পারিতেন না। এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত বয়স্থা সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার মনে জাগিতেছিল. সুতরাং এ দিকে আর বেশী দৃষ্টি রহিল না। সেই মেয়েটীকে পুত্রের জন্য বাখিয়া প্রথমটি আপনি বিবাহ করিলেন।

বনমালী বাবু, এ কাজটী তোমার পক্ষে বড় ভাল হইল না। আপনিত একটা কুদৃষ্টান্ত দেখাইলে অধিকন্তু পুত্রের ভাবীসুখের পথে চিরকালের জন্য কণ্টক রোপণ করিলে। নিজে তুমি পুনর্ব্বার এ বয়সে বিবাহ করিয়া যদি সুখী হইতে চাও হও, কিন্তু তোমার বিবাহযজ্ঞে নির্দ্দোষ মেষ তুল্য সন্তান বাঞ্ছারামকে কেন তুমি বলিদান করিলে? ফলতঃ বনমালী বড় দুর্ব্বলতার পরিচয় দিলেন। আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শান্তির আশায় বঞ্চিত হইলেন। যেরূপ সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলেন তাহার বিপরীত কার্য্য করিয়া বসিলেন। এমন কার্য্য করিলেন যে না মরিলে কিছুতেই আর তাহা হইতে মুক্তি লাভের আশা নাই। পাঠক মহাশয় এখানে শিক্ষা করুন, এক বার বন্ধন শিথিল হইলে মানুষ কোথায় গিয়া শেষ দাঁড়ায়। সাধনের অপরিপক্কাবস্থায় অন্য দিকে একবার যদি মন গেল, তবে জানিবে যে আর তাহাকে পূর্ব্ব স্থানে সহজে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বনমালী সেই যে ভগ্নী রামমণির প্ররোচন বাক্যে সন্তানের ভাবীসুখের আশায় মোহাসক্ত হইয়া পড়িলেন, ইহাই তাঁহার পতনের মসৃণ পথে প্রথম পদ নিক্ষেপ হইল; তার পর যাহা যাহা ঘটিল সকলেই দেখিতে পাইলেন। এই খানেই শেষ হয় নাই, অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন চর্ম্মপাত্রে যদি একটী মাত্র ছিদ্র থাকে, তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত জল বিনিঃসৃত হইয়া পড়ে। মনের বন্ধন ঠিক তেমনি, এক স্থানে একটু আলগা হইলে ক্রমে সমস্ত খুলিয়া যায়। ধারণা শক্তি আর আদৌ থাকিতে পায় না। চপলা সুন্দরী চঞ্চলা নারী, কিন্তু সে যাহা বলিয়াছিল ঠিক তাহাই ঘটিল। স্ত্রীজাতির স্বভাব এ বিষয়ে পুরুষের দুর্ব্বলতা কেমন যেন আপনা আপনি বুঝিতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দাম্পত্যপ্রেমপীড়ন।

বাঞ্ছারাম এখন আর বিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে গৃহে বসিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাসাদি তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংসারে থাকিয়াও যেন নাই। যুবা প্রকৃতি বশতঃ সমবয়স্কদিগের সহিত এক আধ বার মিশিতেন এবং তাহাদের নানা রস রঙ্গের কথা বার্ত্তায় কিছু কিছু আমোদও অনুভব করিতেন। কিন্তু সেটা আপনা হইতে আর বড় ঘটিত না। অধিক ক্ষণ লোকসঙ্গে থাকিয়া অসার আমোদ কৌতুকে যোগ দান করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য ছিল। তাহাতে মনে বিরক্তি এবং অশান্তি বোধ হইত। যুবকদল সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে বেশী সময় থাকিতে ভালও বাসিত না। তরল চিত্ত চপল মতি অস্থির স্বভাবের লোকেরা গম্ভীর চিন্তাশীল নির্জ্জনতাপ্রিয় লোকের সহবাসে বড় কষ্ট পায়। তাহাদের হাস্য পরিহাস বাচালতায় যে যোগ দিতে পারে না তাহাকে অরসিক বলিয়া তাহারা ঘৃণাও করে।

বনমালী যত দিন উদাসীনের ন্যায় ধর্ম্ম সাধনে ব্রতী ছিলেন, নির্জ্জনে বাস করিতেন, তত দিন তাঁহার প্রতি বাঞ্ছারামের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। যখন তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়া পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন সে মনে মনে বীতশ্রদ্ধ এবং ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। পিতা উৎসাহের সহিত বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, অথচ যে বিবাহ করিবে তাহার তাহাতে কিছু মাত্র অনুরাগ নাই, এটা বড় সুখের অবস্থা হইল না। বনমালী ইহাতে একটু ভিতরে ভিতরে চটিলেন, দুই একটা শক্ত কথাও পুত্রকে বলিলেন। শেষ আপনিই মীমাংসা করিয়া লইলেন, "বাঞ্ছারাম কোন কালেইত আমার সম্মুখে মুখ ফুটিয়া

কথা কয় না, সুতরাং এ সম্বন্ধে উহার সঙ্গে কি আর পরামর্শ করিব? আমি যাহা ভাল বুঝিতেছি তাহা করিয়া যাই।"

এরূপ মীমাংসায় যে তাঁহার কিছু গূঢ় স্বার্থ ছিল তাহা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না। পুত্রের অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্বেই যখন সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন তখন আর ভাবিবার বা পরামর্শ করিবার পথ কোথায়? এরূপ সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের বিবাহ দিতে হইলে তাহাকে লইয়া একটা পরামর্শ করিতে হয়, ইহা যে বনমালী বুঝিতেন না তাহা নহে; কিন্তু ইদানীং দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পর হইতে তাঁহার বুদ্ধি কিছু বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

বাঞ্ছারামের মুখে হাঁ, কি না, কোন কথাই নাই, পিতা যাহা করিতে বলিবেন তাহা সে নিরাপত্তিতে করিবে ইহা জানাই আছে। কারণ, পিতৃবাধ্যতা তাহার জীবনের এক প্রধান ব্রত ছিল। সে ব্রত সে নিজে যেমন দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পালন করিত, তেমনি অন্য পাঁচ জন সহচরকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিত। যাহারা কনিষ্ঠ, অধীন, পুত্র, শিষ্য, ছাত্র, ভৃত্য, বাধ্যতাই তাহাদের পরমধর্ম্ম, এই তাহার সংস্কার। কিন্তু স্বার্থের বিষ, অনীতির গরল যেখানে, সেখানে এ বাধ্যতা কত ক্ষণ থাকিতে পারে? স্বভাব অপনি আপনার প্রতিশোধ লয় এবং ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করে। বাঞ্ছারাম মুখে কিছু বলুন, না বলুন, তাঁহার স্ফূর্ত্তিবিহীন বিষণ্ণানন, নির্ব্বাক রসনা, অচঞ্চল চক্ষু, এবং ঔদাসীন্য ভাব এ বিবাহের প্রতিবাদ করিয়াছিল। অবশ্য সে নির্দ্দোষ শিশুপ্রকৃতি যুবা, অকালপক্ক যুবকদিগের ন্যায় বিবাহতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্যের ভিতর কখন অবতরণ করে নাই, তথাপি এ বিষয়ে মোটা মুটি একটা সাধারণ জ্ঞান ছিল। জীবনসঙ্গিনী কিরূপ হওয়া উচিত তাহা সে বুঝিত। কিন্তু তাহার জ্ঞান বুদ্ধি রুচি ও বিবেচনা শক্তি এখানে দাঁড়াইতে পারিল না। পিতার কর্ত্তৃত্বের পেষণে, আর রামমণি পিসীর সাধ আহ্লাদের তুফানে বাঞ্ছারামের অস্তিত্ব একবারে উড়িয়া গেল। তাহার মাতৃশোকদগ্ধ হৃদয়, শান্তিরসপিপাসু স্নেহ আত্মা আপনার ভাবচিন্তা দুঃখ সন্তাপ লইয়া তখন আপনার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে বাহিরে বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

একে অসময়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ প্রস্তাব, তাহার উপর আবার আত্মীয় পুরবাসী প্রতিবাসীদিগের আমোদ কোলাহল, ইহাতে বাঞ্ছারাম বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। এ সকল সামাজিক অত্যাচার উৎপীড়নের কোন প্রতিবিধান নাই, বিচার নাই। তাঁর সংবাদ তখন আর কে লয়? সমাজচক্রে যখন তিনি পড়িয়াছেন তখন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কাঁদিয়া হউক, বা হাসিয়া হউক তাহাতে ঘুরিতে হইবে। কোন যন্ত্রের ভিতর যদি কাহারো পরিধেয় বসনের কোন এক অংশ জড়াইয়া যায়, তাহা হইলে তৎসঙ্গে ক্রমে তাহার সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত নিষ্পেষিত হইয়া থাকে। সমাজযন্ত্র ঠিক তদ্রূপ, তোমার বিবাহে তুমি আহ্লাদিত হও আর না হও, তাহাতে তুমি মর আর বাঁচ, কিম্বা সর্ব্বস্বান্ত হও, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা আপনার প্রাপ্যগণ্ডা ছাড়িবে না।

বাঙ্গালীর মেয়ে ছেলের উদ্বাহ ক্রিয়াটা অনেক স্থলে একটা সামাজিক জুলুম বিশেষ। যাহারা বিবাহিত হয় তাহাদের সুখ দুঃখ মতামত পছন্দ না পছন্দের বিষয়টা আত্মীয় অভিভাবকগণের পক্ষে তত গন্তব্য নহে, লোকলজ্জার ভয়টাই সর্ব্বোপরি। দাম্পত্য জীবনের ভাবী শুভাশুভ ফল কেহ ভাবিয়া দেখে না। বর বা কন্যাকর্ত্তা অপরিমিত ব্যয় করিয়া পরিণামে কারাবাস করুক, কিম্বা ঋণদায়ে উন্মাদ হইয়া যাউক, প্রতিবাসী কুটুম্বগণ সে জন্য কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন নহে। আমোদে মাতাইয়া, সুখ্যাতি গাইয়া, ভোজ ফলার পান তামাক খাইয়া তাহারা সরিয়া পড়িবে, তার পরে ক্রিয়াকর্ত্তা যাবজ্জীবন সুদ গণিতে থাকুন। বাঞ্ছারাম এই সকল অনিষ্ট চিন্তা করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। ওদিকে নহবৎওয়ালা গুড় গুড় নাদে খয়রা তাল বাজাইল, রসনচৌকীর সানাইদার সাহানা বাহারে তান ধরিল, ঢুলি মহাশয়েরা মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া নানা রঙ্গ ভঙ্গে ঢোলে কাটি দিলেন, কাঁসির কাঁই কাঁই শব্দে কান ঝালা পালা হইয়া উঠিল, গায় হরিদ্রার ধূম লাগিয়া গেল। রণবাদ্য শ্রবণে যোদ্ধাগণ যেমন নাচিয়া উঠে, বিবাহবাদ্যে তেমনি নরনারী বালক বালিকা ক্ষেপিয়া উঠিল।

বাড়ীর অন্দর বাহিরের উঠান সামিয়ানা ঢাকা অন্ধকার, তাহার নিম্নে কোথাও কলার পাতা, মাটীর গেলাস খুরী, কোথাও নূতন খেলো হুঁকার রাশি,

কোথাও বাদ্যকরদিগের দরমা আসন, কোথাও মুড়ি মুড়কি ছড়ান। দশদিক্ হইতে বিবিধ সামগ্রী সম্ভার আসিয়া ভাণ্ডার গৃহে স্তূপীকৃত হইতেছে। সূর্য্যপক্ক তাম্রবর্ণ গোপকুল সারি বাঁধিয়া ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা মাখন পনীর ইত্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। বাজার হইতে বাহকগণ কচু কুষ্মাণ্ড কদলী বার্ত্তাকুপূর্ণ করণ্ডিকা সকল আনিয়া রোয়াকের উপর ফেলিতেছে। মসিবরণা স্থূলোদরী ধীবরপত্নী ঘর্ম্মবিগলিতদেহ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া গর্ব্বের সহিত বড় বড় মৎস্য সকল বাহির করিয়া দেখাইতেছেন, আর বলিতেছেন, "আজ কালের বাজারে এমন মাচ আর কেউ দিতে পারিবে না।" সমাগতা কুটুম্বিনীগণ নীল পীত লোহিত ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণের বসনে এবং নানাভরণে ভূষিতা হইয়া পরস্পরের বস্ত্রালঙ্কারের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। ঝি চাকরাণীর দল হাসির রোল তুলিয়া গগন কাঁপাইতেছে। কেহ বটিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক করালবদনা মহিষাসুরমর্দ্দিনীর ন্যায় মৎস্যমুণ্ড খণ্ড বিখণ্ড করত শোণিতস্রোতে ধরাতল ভাসাইতেছে। রন্ধনগৃহে পাচিকাগণ কটিতে অঞ্চল, মস্তকে চূড়া বাঁধিয়া বিবাহযজ্ঞের চতুর্ব্বিধ হবনীয় প্রস্তুত করিয়া থরে থরে সাজাইয়া রাখিতেছেন। তেল মসলা ঘৃত ইত্যাদি দ্বারা ভর্জ্জিত ভক্ষ্য দ্রব্যের গন্ধে আকাশ পরিপ্লাবিত। এই তো গেল রান্নাবাড়ীর ব্যাপার।

অন্তঃপুরমহলে তরুণবয়স্কা ঝি বউ এবং অর্দ্ধপ্রাচীনাগণ চূণে হলুদের গোলা লইয়া পরস্পরের অঙ্গের বসন রঞ্জিত করিতেছে, আর খিল খিল শব্দে হাসিতেছে। কেহ আলপনা দিতেছে, কেহ পান সাজিতেছে, কেহ বা নবাগত কুটুম্বিনী ও জামাই বিহাই বিহানের সঙ্গে হাস্য কৌতুকে মাতিয়াছে। তার সঙ্গে যত রাজ্যের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুল ছুটা ছুটি, হুটাপুটি আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা কেহ ভোজনে, কেহ ক্রন্দনে, কেহ বিবাদ কলহে ব্যস্ত সমস্ত। কেহ কুকুর ঠ্যাঙ্গাইতেছে, কেহ বিড়ালের গলায় মালা, কপালে সিন্দূর পরাইয়া তাহার ল্যাজ ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, কেহ ঢোলে চাটি দিয়া পলাইতেছে, কেহ ভাণ্ডারীর নিকট বার বার জলপান মেঠাই চাহিতেছে, কেহ কাদা ছিটাইতেছে, কেহ কেহ বা অন্যবিধ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। রামমণি পিসীই এখন বাড়ীর গিন্নী।

তাঁর আজ আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি একবার রান্না ঘরে, একবার ভাণ্ডার ঘরে, একবার বিদেশীয় নিমন্ত্রিতদিগের নিকট ক্রমাগত ঘুরিতেছেন। সকলকে আদর যত্ন করিতেছেন আর বলিতেছেন, "বাছা, এ তোমাদেরই ঘর বাড়ী। আপনারা নিয়ে থুয়ে করে কর্ম্মে খাও দাও, দেখ শোনো, পরের মত কেউ মুখ লুকিয়ে থেক না। আহা বাঞ্ছারামের আমার মা নাই, তোমরাই তার মা বোন, সকলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ কর।"

বনমালীর নববিবাহিতা পত্নী এই উপলক্ষে বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। আগন্তুক স্ত্রীলোকেরা দল বাঁধিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। দেখিয়া তাঁহার বসন ভূষণ নাক মুখ চোখ কান কপাল হাত পা চুল নখের সমালোচনা আরম্ভ করিল। কেহ নাক বাঁকাইল, কেহ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখ টিপিল। অনেকে অনেক প্রকার খুঁত ধরিল। কেহ বা অহঙ্কারের হাসি হাসিল। ইহারা যখন অপরের রূপের দোষ গুণ ব্যাখ্যা করে, তখন নিজের মুখপানে চাহিয়া দেখে না। দেখিলেই বা কি হইবে, নিজে কুরূপা হইয়াও অপরের নিন্দা করিতে ছাড়িবে কি? মেয়েটী বয়সে খেঁদা, তাই সব দোষ তখন ঢাকা ছিল। যাই হউক, পরিশেষে ভাল মন্দ গড়ে সকলে একটা রফা করিয়া লইল।

বাঞ্ছারাম স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, যেখানে লোকসমারোহ, নাচ গান আমোদ তামাসা, কিম্বা হৃদয়হীন কপট সামাজিকতা সেখানে তিনি কোন কালে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীর ভিতর মহা হট্টগোল আরম্ভ হইয়াছে। মাছের আঁস্‌টে গন্ধে, খেঁকি কুকুরের খেউ খেউ শব্দে, কাকের চিৎকার, ছেলেদের চেঁচামেচি, মাছির ভেন ভেনানি এবং চাকরাণীদের পিশাচবৎ হাস্যধ্বনিতে, বহু লোকের কোলাহলে অস্থির হইয়া তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। কিন্তু সেখানেও নিরাপদ হইলেন না। বয়স্য যুবকগণ আসিয়া ঠাট্টা তামাসা উস্তুং কুস্তুং আরম্ভ করিল। তোমার মনের ভিতর কি ঘটিয়াছে না ঘটিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য ত কেহ দায়ী নহে। বাহিরে যখন বিবাহের উৎসব তখন তাহার ভোগ তোমাকে ভুগিতেই হইবে। ঘটনাচক্র অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে, ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা অসুবিধা সুখ দুঃখ সে ভাবিতে পারে না। শোকের

আর্ত্তনাদ, বিষাদের ক্রন্দন এবং উৎসবের আনন্দ কোলাহল পাশাপাশি দাড়াইয়া আপনাপন অভিনয় করিয়া চলিয়া যাইতেছে

বাঞ্ছারামকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য সহচর যুবকগণ নানা রস রঙ্গের কথা পাড়িল। কেহ বলিল, "পণ্ডিত বিবাহ করিতে যাইতেছ তা হাসিতেছ না কেন? বিবাহ কি তোমার একটা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মীমাংসা? না শরীরতত্ত্বের পর্য্যবেক্ষণ? না গণিতের সিদ্ধান্ত?" আর এক জন বলিল, "ওহে ভাই, তুমি আমার পরামর্শ শোন। বিবাহের পর তোমার স্ত্রীর নাকে একখান চসমা লাগিয়ে, হাতে একখান বিজ্ঞানের পুস্তক দিয়ে, ঘরের কোনে বসিয়ে রেখ।" আর এক যুবক বলিল, "না হে না, দেখিতেছ না, ওঁর এ সব কিছু ভাল লাগিতেছে না। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে এখনি হয়তো উঠে চলে যাবেন। বাঞ্ছারাম, শুনতে পাচ্ছ কি সব কথা? না আর কিছু ভাবছ?" বাঞ্ছারামের চিত্ত দুঃখভাবে আক্রান্ত, কোন কথারই উত্তর দিলেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড় ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অপর এক রসিক ব্যক্তি বলিল, "ভাই যদি তোমার এতই কষ্ট বোধ হয়, তবে না হয় আমাকে ভার দাও আমি তোমার হইয়া বিবাহ করিয়া আনি!" এ কথাটা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। বাঞ্ছারাম নিজেও মুখ মুচ্‌কিয়া একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধু, তা হলে আমি এ যাত্রা বেঁচে যাই। তোমরা পাঁচ জনে মিলিয়া যদি আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলে আমি বাস্তবিক বড সুখী হই, তোমাদিগকে একটা খুব বড ফিষ্ট দিই।" দলের মধ্যে ইঁচড়ে পাকা ডেঁপো রকমের দুই একটা ব্রহ্মজ্ঞানীর ছেলেও ছিল। তাহারা নিরীহ বাঞ্ছারামকে বাল্যবিবাহ দোষে দোষী, পিতার অন্ধ অনুগত ভীরু সন্তান বলিয়া নিন্দাবাদ করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কৃতবিদ্য শিক্ষিত হইয়া অসভ্য বর্ব্বরের মত বালিকা কন্যার সহিত না দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করাটা যে অত্যন্ত মহাপাপ তদ্বিষয়ে তাহারা দীর্ঘ উপদেশ ও বক্তৃতা ঝাড়িল। বাঞ্ছারাম বিচক্ষণ ব্যক্তি, সে কথাগুলি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, মনে মনে আপনাকে একটু হেয় অপদার্থ জ্ঞান করিলেন। কি করিবেন পিতার বাধ্য সন্তান, হাত পা বদ্ধ। তিনি অধোবদনে ভাবিতে ভাবিতে অন্য এক নিভৃত স্থানে চলিয়া গেলেন।

"যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়া পড়শীর ঘুম নাই " বাড়ীর ভিতর মেয়ে ছেলে গুল আমোদে মাতা মাতি করিতেছে, তাহাদের যেন নিজেরই বিবাহ। বেলা দুই প্রহর একটা বাজিয়া গিয়াছে, বরকে আইবুড় ভাত খাওয়াইবার জন্য মহা ধূম পড়িয়া গেল। কিন্তু বর কোথায় তার ঠিক নাই। বাহির বাড়ী ভিতর বাড়ী সকলে অন্বেষণ করিতে লাগিল, কোন খানেই বাঞ্ছারামের দেখা পাওয়া যায় না। শেষ বামমণি পিসী ছাদের উপর সিঁড়ির ঘরে গিয়া তাহাকে ধরিলেন এবং ধরিয়া আনিয়া আহারে বসাইলেন। বিবাহের সময় পাত্র পাত্রীর উপর মেয়েদের অত্যাচার জুলুম করিবার যেন একটা বিশেষ অধিকার আছে। ভারতের স্বাধীন নৃপতিবর্গের উপর স্থানীয় পলিটিকেল এজেন্টের যেমন একাধিপত্য, গরিব কলুর ছেলের বাপের শ্রাদ্ধের সময় পুরোহিত ঠাকুরের যেমন প্রভুত্ব, বৃদ্ধ কালের বিবাহের ঘটকের যেমন বিবাহকর্ত্তার উপর অধিকার, বিবাহের সময় বরের উপর পাড়া প্রতিবাসী আত্মীয় পুরনারী ও কুলস্ত্রীগণের তেমনি অধিকার। তুমি বি, এ, এম, এ, ই পাস কর; আর ডেপুটী মেজেষ্টর সদর আলা হও, যুবা বৃদ্ধ তেজস্বী গম্ভীর যে পদের লোক হও না কেন, বিবাহ কালে নারীগণের নিকট তোমাকে বশীভূত হইয়া চলিতেই হইবে। বাঞ্ছারাম যেন হাড়কাঠে গলা দিয়া পড়িয়া রহিলেন, যে যাহা পারিল তাঁর মুখে গুঁজিয়া দিল। যাহা হউক, বিবাহের ক্রিয়া সমস্ত এইরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুঃখে সুখ।

বিবাহের পর কিছু কাল বাঞ্ছারাম অতিশয় দুঃখের অবস্থায় কালাতিপাত করেন। পড়া শুনা আর ভাল লাগিত না, কেবল একলা বসিয়া ভাবিতেন, আর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। যে বিবাহবন্ধন মনুষ্যের পার্থিব এবং

অধ্যাত্ম জীবনের পরম সুখের কারণ, তাহা যদি হইল এক জনের স্বার্থ সিদ্ধির উপায়, তবে আর সে ব্যক্তি কি লইয়া সংসারে সুখ ভোগ করিবে? সময়ে সমস্ত কথাই বাহির হইয়া পড়িল। বাঞ্ছারাম বিবাহিত পত্নীর কদাকার শ্রীহীন রুগ্ন শরীর দেখিয়া অন্তরে বড়ই ব্যথা পাইলেন। সেই বিবাহের সময় অনন্যাবলোকন কালে তাহাকে যাহা দেখিযাছিলেন সেই পর্য্যন্ত, তাহার পর আর বড় দেখা শুনা হয় নাই। যদিও তিনি পণ্ডিত মানুষ, রূপ রস সুখ বিলাসের ধার বেশী ধারিতেন না, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্যানুভব রুচি একটু ছিল; সে রুচিতে বড আঘাত লাগিল। তদ্ব্যতীত পিতার স্বার্থপরতার কথা যখন শুনিলেন তখন আরও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, "মনুষ্যের স্বাধীনতা তবে আর কই? আমরা বাস্তবিকই অবস্থার দাস। সামাজিক শত সহস্র বন্ধনে বন্দীভূত। পুরাতন প্রচলিত প্রথার চক্রে বিঘূর্ণিত। আত্মরুচি চরিতার্থের তবে আর আশা কোথায়? বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া সংগ্রাম করিলে তবে এ সকল কুপ্রথার উন্মুলন হইবে। সত্য সত্যই মানুষ জড়ের ন্যায় পরাধীন, পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল; সমাজশক্তি তাহার পরিচালক।"

বনমালীকে অবশ্য এ জন্য সমাজমধ্যে নিন্দিত হইতে হইয়াছিল। যাহারা বাঞ্ছারামকে এ বিষয়ে সহানুভূতি করিত, তাহারা এই বলিয়া তাঁহাকে এবং আপনাদিগকে বুঝাইল, যে কুলীনের ছেলে, তাহাতে আবার বিদ্বান্ পুরুষ, আর একটা সুন্দরী দেখিয়া বিবাহ করিলেই হইবে। কিন্তু তাহারা জানিত না যে বাঞ্ছারাম একাধিক বিবাহের বিরোধী। কুলীন পত্নীগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া বাঞ্ছারাম পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, একটীর অধিক বিবাহ করিবেন না। সুতরাং তাঁহার এ দুঃখ দূর হওয়ার আর উপায় ছিল না। বিবাহ হওয়া না হওয়া তাঁর পক্ষে সমান হইয়া দাঁড়াইল। অধিকন্তু একটা নিতান্ত অপ্রীতিকর কঠোর কর্ত্তব্যের বোঝা আসিয়া মাথায় পড়িল।

বাঞ্ছারাম কতকটা অদৃষ্টবাদীর মত, সুতরাং ধীর প্রকৃতি, কোন ঘটনাতেই সহজে উত্তেজিত হন না, সকল বিষয়েই গভীর ভাবে বিচার করিয়া কার্য্যকারণের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল নির্দ্ধারণ করেন।

এক্ষণে তিনি ভাবিতে বসিলেন, এবং এত দিন পরে মনে মনে বুঝিলেন, "ব্যক্তিত্বের অধিকার সম্পূর্ণরূপে অন্যের ইচ্ছার অধীনে ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক নয়; কারণ, তাহাতে জ্ঞানে দোষ পড়ে এবং সত্যের বিকাশ হয় না। পুত্রের উপর পিতার অধিকার আছে সত্য, অনেক স্থলে তরলমতি যুবক সন্তানকে বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে অনিষ্ট ঘটে, সুতরাং সেই সেই স্থলে অভিভাবকের হস্তে সে ভার ন্যস্ত থাকাই প্রার্থনীয়। কিন্তু যেখানে অভিভাবকের কোন স্বার্থ আছে, যখন তিনি নীচ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন, কিম্বা বিবেচনা শক্তি যদি তাঁহার না থাকে, তখন তাঁহার দোষ ত্রুটি মোচনের জন্য অন্য কর্তৃক বাধা পাওয়া উচিত। বিশেষতঃ ভুক্তভোগী যে ব্যক্তি তাহার ইহাতে হস্তক্ষেপ করা কিছুই অন্যায় নহে। এত দূর আনুগত্য বশ্যতা স্বীকার আমার উচিত হয় নাই। ইহাতে আমি আমার প্রজ্ঞা বিবেক সুরুচি এবং শিক্ষা সংস্কারের অবমাননা করিয়াছি। প্রচলিত প্রথার অন্ধানুগমন কখন ধর্ম্ম নয়, সে কেবল অসার লৌকিক ব্যবহার। কেন আমি আমার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিলাম না? যাহা বিধিনির্দ্দিষ্ট তাহাত হইবেই, সে জন্য আমি দুঃখ করিব না; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট নিয়তির পথে অন্ধভাবে কেন চলিব? স্বাধীন চিন্তা, বিবেক বুদ্ধি আমাকে সজ্ঞানে স্বাধীনভাবে সেই দিকে লইয়া যাইবে। নিয়তি এবং কর্ত্তব্য দুই এক হইবে। এক্ষণে আমার সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের ভাগী কে? নৈতিক জীবনের দায়িত্ব এবং শুভাশুভ কার্য্য ফল সম্পূর্ণরূপে যখন আমারই উপর নির্ভর করিতেছে, তখন কেন এ গুরুতর বিষয়ে সতর্ক হইলাম না? এক্ষণে আর ইহার তো কোন প্রতিবিধান দেখি না। যাহা হউক, স্বাধীনতা আর আমি কাহারো হস্তে দিব না।"

বাঞ্ছারাম স্বভাবতঃ তত্ত্বদর্শী, এবং নিস্পৃহ বৈরাগী, এই জন্য এই দুর্ঘটনায় তাঁহাকে একবারে নির্জ্জীব হতাশ্বাস করিতে পারিল না। সূক্ষ্মবিচারবলে সুখ দুঃখ মঙ্গলামঙ্গলের অপ্রতিবিধেয় কারণ সকল বাহির করিয়া তিনি আপনার মনকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত কোন প্রচলিত শাস্ত্রসম্মত ছিল না, জ্ঞানকাণ্ড বা কর্ম্মকাণ্ড কোন নির্দ্দিষ্ট আকার তখনও প্রাপ্ত হয় নাই। সমস্ত বিশ্ব এবং তাহার বিচিত্র ক্রিয়ার

অভ্যন্তরে এক অবিভাব্য দুর্জ্ঞেয় অদ্ভুত মহাশক্তি স্থিতি করিতেছে তাহাই কেবল তিনি বুঝিতেন। দৃশ্যমান বাহ্যক্রিয়া সকল বিশেষ এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, তৎসমুদায় মায়ামরীচি সদৃশ ক্ষণস্থায়ী, মরণশীল, তাহার ভিতরে যে অখণ্ড নিত্য সারবত্তা তাহাই স্থায়ী পদার্থ। ফলতঃ বাঞ্ছারামের মত কতকটা মায়াবাদী অদ্বৈতবাদীর ন্যায় ছিল।

তদনন্তর ভাবিতে ভাবিতে বিচার করিতে করিতে শেষ তিনি উপস্থিত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ স্থির করিলেন;—"আমি মায়াবিকারগ্রস্ত শারীরিক বিবাহকে যথার্থ বিবাহ বলিয়া কখনইত স্বীকার করি নাই। আত্মা আত্মাকে বিবাহ করে, এবং আত্মাই আত্মাতে মিলিত হইয়া উভয়ে শেষ অনন্তে গিয়া নিত্য কাল স্থিতি করে, তবে কেন আমি শরীরের সৌন্দর্য্যের বিষয় ভাবিব? রূপত চক্ষের বিকার, প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, দেখিতে দেখিতে মৃত্তিকায় পরিণাম প্রাপ্ত হইবে। যৌবনওত জরা বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভ মাত্র। অতএব রূপ যৌবন কাল কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সময়ে বিকৃত এবং অদৃশ্য হইয়া মহাকাশে মিশিয়া যাইবে, তখন আমি এ জন্য কেন শোক করিব? যে পদার্থের ধ্বংস নাই, অংশ নাই, পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তন নাই, চিরকাল যাহা অখণ্ড অবিকৃত অটল উজ্জ্বল, আমি তাহারই সহিত প্রীতিবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকিব। এ ভাবে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারি। প্রেমের চিরমিলনই আমার প্রকৃত বিবাহ।"

এইরূপ অধ্যাত্ম চিন্তা এবং জ্ঞানবিচারবলে বাঞ্ছারাম শোক দুঃখের পরিবর্ত্তে শেষ মহা আনন্দে উল্লসিত হইলেন। ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী যুবকেরা সুন্দরী স্ত্রী পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয় তদ্রূপ আনন্দে তিনি ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মন উদাস হইয়া আকাশে মিশিয়া গেল, ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, জড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সারগ্রাহী সূক্ষ্মদর্শী আত্মা অনন্ত জ্ঞানালোকে বিচরণ করিতে লাগিল। গভীর চিন্তাশীল তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি চিন্তাসমুদ্রে মগ্ন হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় আরাম সম্ভোগ করেন, বুদ্ধ সক্রেটিশ কারলাইল ইমার্সন ক্যাণ্ট কুজিন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবন তাহার প্রমাণ। চিন্তাশীলতা এবং বৈরাগ্য, এই দুইটী মনুষ্যকে পার্থিব

মোহবন্ধন হইতে প্রমুক্ত রাখিয়া পরম শান্তি বিধান করে। বাঞ্ছারামের পক্ষে এ দুইটীই বিশেষ সহায় ছিল। অনন্তর তাঁহার হৃদয়ের ভার চলিয়া গেল, চিত্ত প্রসন্ন হইল; পৃথিবীর সুখ দুঃখ মায়া মমতার অসারতা দিব্য-জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং নিত্য অখণ্ড অনন্ত জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া তিনি যেন আশ্চর্য্য যোগবলে সমস্ত বিকারের কারণকে উড়াইয়া দিলেন। স্বাধীন চিন্তার বল, ইচ্ছার পরাক্রম শক্তিই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, ঈদৃশ শক্তি যাহার হস্তগত, পৃথিবীর দুর্ঘটনায় তাহাকে অধিক কাল মুহ্যমান করিয়া রাখিতে পারে না। অতঃপর মানসিক মহাবলে বাঞ্ছারাম ভোগস্পৃহা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্রোতকে সংযত এবং নিগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ তাহার গতিকে অল্পে অল্পে ফিরাইয়া বিবেকাধীন সাধু ইচ্ছার অধীন করিয়া ফেলিলেন। পরে নিয়তিকে বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে অনন্তের দিকে এমনি বেগে চালাইলেন, যে দ্বৈতজ্ঞান বিকল্প বুদ্ধি আর রহিল না, কিছু সময়ের জন্য তিনি অভেদাত্মা হইয়া আত্মাময় জগতে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ মুক্তাবস্থাকে তিনি স্বর্গসুখ মনে করিতেন। অভ্যাস গুণে এইটী ক্রমে তাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। বিপদ আপদ বা মানসিক উদ্বেগের সময় এইরূপে অনন্তের বিশাল বক্ষে জীবন ভাসাইয়া দিয়া তিনি নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত মনে নির্ব্বাণের শান্তি উপভোগ করিতেন। বিবাহবিভ্রাটজনিত ক্লেশ সন্তাপ দুঃখ বিষাদ এইরূপে শেষ নির্ব্বাণের শান্তিতে পরিণত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুখে দুঃখ।

বাঞ্ছারামের পিতা বনমালী মোহের ছলনে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারে সুখী হইলেন। সে সুখ কি প্রকার, তাহার বিস্তারিত বিবরণ শুনিলে অনেকের চৈতন্যোদয় হইবে। নবপত্নীর প্রথম যৌবনের রূপ লাবণ্যে অন্ধপ্রায় হইয়া আট দশ বৎসর কাল তিনি সংসারে এমনি

ডুবিয়াছিলেন, যে কেহ আর তাঁহার মাথার টিকী দেখিতে পাইত না। একবারে যেন আত্মবিস্মৃত। মনুষ্য কার্য্যদোষে জন্মান্তর লাভ করিয়া পশু উদ্ভিদ্ জড় পাষাণে পরিণত হয়, এ কথার মানে আছে। এক জন্মেই পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর বা অবস্থান্তর ঘটে। পুরাতন পত্নীর তীরোভাবে শ্মশান-বৈরাগ্যের উদয়, আবার নবপত্নীর আবির্ভাবে সমূলে তাহার বিনাশ, ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়। তাঁহার সেই নির্জ্জন উদ্যানের ভজনকুটীর এক্ষণে মালীর ঘরে পরিণত হইল, গেরুয়া বসন গুলি দ্বারা বাড়ীর মেয়েরা লেপ তোষক প্রস্তুত করিয়া ফেলিল, গীতা ভাগবতে উই ধরিল, মৃগচর্ম্ম বর্ষার জলে ভিজিয়া পচিয়া গেল, শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষ মিশ্র শ্মশ্রু রাশি এত দিন গোলে মালে লুকাইয়া কোনরূপে জীবিত ছিল, শেষ ক্রমশঃ শুক্ল পক্ষের সীমা প্রসারিত হওয়াতে গৃহিণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন আর কার সাধ্য যে তাহাকে রক্ষা করে। বনমালী স্ত্রীর অনুরোধে দাড়ি মুড়াইলেন, হবিস্য ছাড়িয়া মৎস্য ধরিলেন, থান ধুতির পরিবর্ত্তে পাড়ওয়ালা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিতে লাগিলেন। অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় সংসারী হইয়া বিষয়মদিরা পানে দিবা নিশি প্রমত্ত রহিলেন। কয়েক বৎসরের যাহা কিছু বাকী পড়িয়াছিল সুদশুদ্ধ তাহা আদায় করিয়া লইলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে কয়েক বৎসরের মধ্যে উপর্য্যুপরি তাঁহার প্রায় ডজন খানেক ছেলে মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাহার মধ্যে আবার যোড়া দুই তিন যমজ। এই সকল লিলিপটিয়ান গুড় গুড়ে সিপাই পণ্টনের রসদ যোগাইবার ভাবনায় এক একবার বনমালীর গায়ের রক্ত শুকাইয়া যাইত, মহা ভয় উপস্থিত হইত, কিন্তু উপায় কি। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবেই। পেনসেন এবং পৈতৃক সম্পত্তির আয়ে সংসার আর চলে না, ব্যয় করিবার লোক অনেক, আয়ের লোক নাই, ধার কর্জ্জ হইল, বিষয় বাঁধা পড়িল। সকল দিকেই তিনি জড়াইয়া পড়িলেন। স্ত্রীর ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু ষষ্ঠী দেবীর অত্যন্ত অনুগ্রহ দেখিয়া মনে মনে তিনি মা ওলাদেবীকে নিজগৃহে আহ্বান করিতেন, এ কথা আমরা অবগত আছি।

সন্তান গুলি গৃহিণীর কাছে আদৌ ঘেঁসিত না, তাঁর অবসরও বড়

কম ছিল। থাকিলেও এ বিষয়ে তিনি আপনাকে তত দায়ী মনে করিতেন না। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের বোধ হয় ইহা একটা বিশেষ সর্ত্ত, যে সন্তানাদি যাহা কিছু জন্মিবে তাহাদের লালন পালনের ভার পিতার উপর। কাজেই ছেলের পাল এক দণ্ড বনমালীর কাচছাড়া হইত না। তাহারা কাঁদিবার সময় মা মা না বলিয়া বাবা বাবা বলিয়া কাঁদিত। বনমালী এখন প্রত্যহ তিন চারি বার বাজারে যান, জিনিষ পত্র ভাল না হইলে স্ত্রীর মুখনাড়া খান। কিন্তু সেটা খাইতে নিহাত মন্দ লাগিত না। একবার হাসি মুখ দেখিলেই আবার সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন। সংসারের এত যে কঠোর যন্ত্রণা ভাবনা দুশ্চিন্তা গৃহিণীর প্রসন্ন বদনের এক হাসিতে সে সব নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইত। তবু গিন্নীর মুখ খানা তত ভাল ছিল না। রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া পথের ধূলা খাইয়া শুষ্ক কণ্ঠে গলদঘর্ম্ম শরীরে যাই বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন, অমনি কোন ছেলেটা পীঠে চড়িয়া বসিল, কোনটা গলা জড়াইয়া ঝুলিতে লাগিল, তাদের দেখাদেখি "আমার বাবা, আমার বাবা" বলিয়া আর গোটা কতক ঘাড়ে পড়িয়া পরস্পরে জড়ামড়ি আরম্ভ করিল। ঘর্ম্মবিগলিত দেহে ধূলায় ধূসরিত সন্তানগণের আলিঙ্গন কেমন সুখকর তাহা সকলে কল্পনা করুন। বনমালী দেখিলেন, একটা ছেলে হুঁকা কলিকা প্রভৃতি তামাকু সেবনের সরঞ্জম দ্রব্যগুলি লইয়া বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার করিতেছে; তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে সেই হুঁকাটী মুখের কাছে আনিয়া ধরিল। কোনটা চীৎকার রবে, কোনটা দমকে দমকে নানা স্বর ভঙ্গীর সহিত কান্না জুড়িয়া দিয়াছে, কেহ কেহ কিলোকিলি আরম্ভ করিয়াছে। সেই সময় আবার গয়লা মিন্সে দুধের দেনার জন্য দরজায় দাঁড়াইয়া বকিতেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভিখারী বৈষ্ণব "বেলা হল আয়রে কানাই গোঠে যাই" বলিয়া গান ধরিয়াছে। বনমালী নাকি কিছু দিন গীতা ভাগবত পড়িয়া কিছু কিছু চিত্ত সংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাই এ সব দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারেন। গৃহী ব্যক্তি সংসারমধ্যে যেরূপ অগাধ ধৈর্য্য সহকারে সন্তানগণের উৎপীড়ন এবং অন্য সহস্র প্রকার ঝঞ্ঝাট সহ্য করে, মহা জিতেন্দ্রিয় সংযত আত্মা যোগীও তেমন পারেন না।

একটা ছেলের একবারকার খুব জোরের কান্না যদি তাঁহার কানে প্রবেশ করে, তাহা হইলে হয়তো তিনি কৌপীন কাঁথা কম্বল কমণ্ডলু ফেলিয়া আরো দূর বনে গিরিগর্ভে পলাইয়া যান। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে গৃহী ব্যক্তির এ সহ্য গুণের কোন অপার্থিব পুরস্কার নাই। সে ভাবে সহ্য করে না বলিয়াই পুরস্কার পায় না। বনমালীর মস্তিষ্ক এ জন্য এক এক বার বিচলপন্ন হইত, দুঃখেতে চক্ষে জল আসিত। কিন্তু তা বলিয়া কি যমে ছাড়ে? এখনি হয়েছে কি! হাড় মাস চিবাইয়া খাইবে, তার পর চিঁ চিঁ করিয়া ডাক ছাড়িতে হইবে। সাধ মিটেছে কি? আর বিয়ে করবে? না গরল হইতে অমৃত উদ্ধারের চেষ্টা দেখিবে?

যখন তিনি এইরূপে সন্তানগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কাতর স্বরে "হায় আমি কি করিলাম এসে ভবে" বলিয়া গীত গাইতেন, তখন তাঁহার নবীনা গৃহিণী ভ্রূকুটী ও তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত "ইহা নাই, উহা নাই, এটা চাই, সেটা চাই, বাজারে গেলেন তা ছাই করে আনুলেন" ইত্যাদি কথার অবতারণা করিতেন; আর ঘ্যান ঘ্যান ক্যান ক্যান প্যান প্যান করিয়া কানের কাছে অবিশ্রান্ত বকিয়া বকিয়া কানের পোকা বাহির করিয়া দিতেন। ইহাতে বনমালীর মনে কীদৃশ অশান্তি উপস্থিত হইত তাহা সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন, বেশী বলা বাহুল্য।

গৃহিণী ঠাকুরাণীর কাজের মধ্যে কেবল স্বামীর কানের কাছে গজর গজর করিয়া বকা আর ভাবন করা, ইহাতেই তাঁহার সমস্ত দিন প্রায় অতিবাহিত হইত। সন্তানগুলিকে কোলে লইবার কিম্বা পরিষ্কার করিয়া দিবার প্রবৃত্তিও ছিল না, তাহার অবসরও পাইতেন না। এক খানি আয়না আর চিরুণি সর্ব্বদা কাছে আছেই। বিবিধ প্রকারে কেশ রচনা করিয়া তাহাতে গন্ধদ্রব্য, সুবাসিত তৈল মাখাইয়া কবরী বন্ধন করিতেন। কখন কখন দুই তিন ঘণ্টা ক্রমাগত আয়নায় মুখ দেখিতেন। মুখ দেখিবার সময় তাঁহার চক্ষু নাসিকা ললাট এবং গণ্ডস্থল ওষ্ঠাধরে ভ্রূযুগলে বহুবিধ ভঙ্গী রঙ্গী প্রকাশ পাইত। গাল দুটি গোলাপ ফুলের ন্যায় লোহিত রাগে রঞ্জিত করিবার জন্য কত যে উৎকণ্ঠিত হইতেন তাহা আর বলা যায় না। এক বার মুছিতেন, আবার লাগাইতেন, কিছুতেই আর মনের মত হইয়া উঠিত না।

ঠোঁটে আলতা, হাত পায়ে আলতা, গালে আলতা মাখিয়া, চুলটি বাঁধিয়া, পানটী খাইয়া, জিহ্বাটী বাহির করিয়া দর্পণে নিজ মূর্ত্তিটী অতি মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেন। কখনো দাঁড়াইয়া, কখনো বসিয়া, কখনো বাঁকা হইয়া নানা অঙ্গভঙ্গীর সহিত আপনার রূপ আপনি দেখিয়া মোহিত হইতেন। এ বিভাগের কার্য্য নিতান্ত সামান্য বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। গ্ল্যাডেষ্টোন প্রভৃতি মহাসভার সভ্যদিগকে যেমন রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, ভাবনকারিণী বিলাসিনীরা তেমনি এ কাজে অনেক চিন্তা এবং পরিশ্রম করিয়া থাকেন। মুখে সর ময়দা মাখিয়া তাহার পর বেশম দিয়া গা ধুইতে মাজিতে ঘসিতে, চুল শুকাইতে, তাহার পরিচর্য্যা করিতে অনেক সময়ের আবশ্যক হয়। তদনন্তর গায়ে রং ফলাইতে, কাপড় গহনা পরিতে, খুটি নাটি মাথা মুণ্ড পিণ্ড দান করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আইসে। বাঞ্ছারামের মত অধ্যয়নশীল কৃতবিদ্য ভদ্র যুবার মনে হইতে পারে, এ সব কাজে কেবল সময় নষ্ট আর অসারতা বৃদ্ধি। কিন্তু মহিলাকুলের সম্বন্ধে তত বৈরাগ্য সম্ভবে না, কেন না, তাহারা গৃহের শ্রীস্বরূপা। সুসজ্জিতা রমণী গৃহের লক্ষ্মী। অবশ্য যাঁহার কথা আমরা বলিতেছি, এরূপ সৌন্দর্য্যানুরাগ অতিশয় নিন্দনীয়। এই ব্রাহ্মণকন্যার রূপ ছিল না বলিয়াই সাজ সজ্জার এত বাড়াবাড়ি। অভিনয়কারী যুবকগণ আপনাদিগকে নারীবেশে সজ্জিত করিবার সময় যেমন হাব ভাব প্রকাশ করে, বনমালীর স্ত্রী প্রতি দিন তাই করিতেন। তিনি অভিনেত্রীর বেশে সাজিয়া গুজিয়া আপনার গরবে আপনি ফাটিয়া মরিতেন।

বনমালী বাবু ইহাতে তত বিরক্ত ছিলেন না, বরং মনে মনে খুসী হইতেন। কিন্তু যখন তিনি কোন রূপ বস্ত্র বা অলঙ্কার দ্বারা কিছুতেই গৃহিণীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিতেন না, তখনই বড় বিপদ উপস্থিত হইত। তাঁহার স্ত্রীর এ বিষয়ে পরিশেষে একটা যেন রোগের মত জন্মিয়া গিয়াছিল। স্বামীর বেশী বয়ঃক্রম বলিয়া তিনি অনেক প্রশ্রয় পাইতেন, সেই জন্য কিছুতেই আর তাঁর কোন সামগ্রীতে মন উঠিত না। তাঁহার ভাবন আর পছন্দের জ্বালায় ব্রাহ্মণের মাথা এক একবার ঘুরিয়া যাইত,

এবং তিনি হতাশ হইয়া সময়ে সময়ে চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতেন। তথাপি চেষ্টার ত্রুটি কখন করেন নাই। স্ত্রীর সুখের উপর যাহাদের সুখ শান্তি নির্ভর করে তাহাদের কি বিষম বিড়ম্বনা! বনমালী স্ত্রীর সেবায় জীবন ঢালিয়া দিয়াও তদ্বিষয়ে সফলকাম হইতে পারেন নাই। স্ত্রৈণ পাঠকগণের এ কথাটি যেন মনে থাকে।

এরূপ বিলাস আমরাও ভাল মনে করি না। এমন কিছু বিশেষ সৌন্দর্য্য তাঁহার ছিল না যাহাতে তিনি সারা দিনটা কেবল অঙ্গরাগে আর বেশ বিন্যাসে কাটাইয়া দিতে পারেন। বর্ণটা গৌর বর্ণ ছিল তাহা আমরা মানি, কিন্তু কেবল গৌর বর্ণই কি রূপের পরাকাষ্ঠা? পাঠিকা-গণ ক্ষমা করিবেন, আমরা স্পষ্ট বলিতে বাধ্য হইতেছি, এই রূপসীর নাকটী ভাল ছিল না। তাহা ছাড়া গাল দুইটা বসা, চোখ ছোট, মুখ লম্বা, মাথাটা আকা বাঁকা, চুল পাতলা এবং খাট, কোন রূপে কায় ক্লেশে ছেঁড়া চুল পরচুলের সাহায্যে খোঁপাটী বাঁধিতেন। স্বভাব যেখানে প্রতি-কূল, কৃত্রিমতার সেইখানে আতিশয্য। কিন্তু তাহাতে কি স্বভাবের ক্ষতি পূরণ হয়? হউক আর না হউক, এই ব্রাহ্মণকন্যা প্রাণপণে তজ্জন্য চেষ্টা করিত। কিন্তু এক মুখের দোষেই তাঁহার সকল আয়োজন নিস্ফল করিয়া রাখিয়াছিল। যিনি যাহা মনে করুন আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, বনমালীর পত্নী ঘোটকবদনী, ভেকগামিনী এবং বিড়ালাক্ষী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শ্রী সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এত যে চেষ্টা যত্ন সে সমস্ত কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হইত। কাহারো নিন্দাবান্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বিশেষতঃ ভদ্রলোকের ঘরের কুলবধূর রূপের দোষ গুণ বর্ণনা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা। তথাপি যাহা সত্য তাহা বলা ভাল। যাঁর রূপ নাই, অথচ যিনি রূপের বড়াই করেন, কিম্বা এক গুণ রূপ আছে তাহাকে দশ গুণ করিতে চাহেন, তিনি যেই কেন হউন না, তাঁহার সম্বন্ধে স্বরূপ কথা না বলিলে আমাদের ধর্ম্ম থাকে না।

বনমালী বাবু কি দেখিয়া যে এত মোহিত হইয়াছিলেন তাহা যদি ছাই আমরা কিছু বুঝিতে পারি। মেয়েটী শেয়ানা ডাগর ডোগর, আর গায়ের চামড়া খানি ফর্সা; দূর হইতে বঙ্গীন কাপড় গহনার সঙ্গে ইহা দেখিয়া

তিনি একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এটাকে অবশ্য মোহেরই কাজ বলিতে হইবে। মোহে যখন চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়, তখন চক্ষুও কি দেখিতে কি দেখিয়া ফেলে। যে যাহা বাস্তবিক নয় তাহাকে তাহা মনে করে। স্ত্রী সৌন্দর্য্যের ভিতর শতকরা নিরানব্বই জনের শ্রী কৃত্রিম। তাহারা রং বেরং কাপড় গহনা পরিয়া এমনি সাজে, যে কত টুকু সৌন্দর্য্য তাহাদের নিজের এবং কত টুকুই বা ধার করা তাহা ধরা বড় কঠিন। আপাতদৃষ্টিতে যিনি পরমাসুন্দরী, বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাঁহার রূপের ভিতর অনেক গলদ বাহির হইয়া পড়ে। যুবকগণ, তোমরা সাবধানে আপনাপন উত্তমার্দ্ধকে নির্ব্বাচন করিবে। কেবল শাদা চামড়ার উপর সমস্ত মূল্য স্থির করিও না, তাহাতে ঠকিবে। বরং একটু ময়লা হইলে কিছু যায় আসে না, গঠন সুপ্রণালীশুদ্ধ কি না, আর জ্ঞান চৈতন্যবিশিষ্ট মানুষের আত্মা তার মধ্যে আছে কিনা, এইটী অগ্রে দেখিও। এ সব তাড়াতাড়ির কাজ নয়, স্থির শান্ত মনে স্ত্রীনির্ব্বাচন করিতে হয়। ভবিষ্যতে কার কপালে কি দাঁড়াবে কেহ জানে না, স্ত্রীভাগ্য সকলের সমান নয়। কিন্তু এ জিনিষ ঝাঁকড়ে মিলে না, একবার ঘরে আনিলে আর ফিরবে না। এই জন্য বলি, সাবধান। হুসিয়ার। আর যদি বনমালীর মত পিতার হস্তে ভারার্পণ কর, তাহা হইলে আর এ বিষয়ে কোনই ভাবনা থাকিবে না।

• মানুষ কি দুর্ভাগ্য! যদি কোন ঘটনায় পড়িয়া তাহার মনে একটু বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, কোথা হইতে এমন একটা উপসর্গ আসিয়া জুটিবে, যে তাহাকে এককালে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। ভ্রান্ত মতি বিপ্রের এক একবার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত। যখন পরিবারবর্গের উৎপীড়নে, সংসারের দুর্ভাবনায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন সেই শ্মশানবৈরাগ্যের প্রতি তিনি অতি কাতর ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন। কিন্তু সে ভদ্র লোক তখন আর কি করিবে? স্ত্রী মরিলে সে এক আধ বার দেখা দিতে পারে, তার যাহা কিছু পরাক্রম বিক্রম মৃতপত্নিকের নিকট, জ্যান্ত মেয়ে মানুষ বিশেষতঃ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তাহার পক্ষে যমস্বরূপ। তাহার ভয়ে সে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং বনমালী বার বার ডাকিয়াও আর

তাঁহার সাড়া শব্দ পাইলেন না। অগত্যা শেষ জীবন তাঁহাকে শৃগাল কুকুরের মত অতিবাহিত করিতে হইল। পূর্ব্বজীবনের তপস্যা আর পুনর্জ্জীবিত হইল না। হায় কত কত অমূল্য মানব জীবন যে পরিণামে এই-রূপে অধঃপতিত হয় তাহা কে গণনা করিবে?

নবম পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসন।

যে সময়ের কথা আমরা এত ক্ষণ বিবৃত করিলাম তৎকালমধ্যে বাঞ্ছারামের জীবনেতিহাসে দুই তিনিটী গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয়। (১) স্ত্রীবিয়োগ, (২) গৃহ হইতে নির্ব্বাসন, (৩) মত পরিবর্ত্তন। তাঁহার সেই চিররুগ্ন প্লীহাগ্রস্ত সংক্রামক জ্বরাক্রান্ত স্ত্রীর পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। তাহার রূপ যৌবন বয়স আর বাড়িল না, কেবল রোগই বাড়িল। পিলে অগ্রমাস কাঁসব ইত্যাদিতে পেট পূরিয়া গেল, পা ফুলিল, চক্ষে ন্যাবা হইল, অষ্ট প্রহর জ্বরভোগ, অরুচি, মুখে ঘা, নানা রোগে তাহাকে ঘেরিল। শেষ ভুগিয়া এবং ভোগাইয়া দেহলীলা সম্বরণ করিল। বাঞ্ছারাম একাই তাহার সেবা করিতেন। তাঁহার পিতা নিজের ছেলে মেয়ে লইয়াই বিব্রত, বিমাতা আপনার অঙ্গরাগেই ব্যতিব্যস্ত, রুগ্ন বধূটীর প্রতি তাঁহারা একবার ফিরিয়া চাহিতেন না। বাঞ্ছারাম বিবাহ করিয়া চির অসুখী হন, অধিকন্তু রুগ্ন স্ত্রীর সেবা করিতে করিতে তাঁহার দুঃখভারাক্রান্ত জীবন আরো ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কি করিবেন, জীবে দয়া মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিশেষতঃ অসহায় নিরাশ্রয় রোগী চক্ষের সমক্ষে কষ্ট পাইতেছে ইহা দেখিয়া কোন্ হৃদয়বান পুরুষ স্থির থাকিতে পারে? যাহা হউক, এইরূপ নিস্বার্থ ভাবে স্ত্রীর সেবা করিয়া তাঁহার কিছু আত্মপ্রসাদও লাভ হইয়াছিল, দাম্পত্য জীবনের এই টুকু মাত্র কেবল তাঁহার পুরস্কার।

বনমালী যে সময় সংসারচক্রে পড়িয়া নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেন, সেই সময় বাঞ্ছারাম বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র পাঠে প্রাণ মন একবারে উৎসর্গ

করিয়া রাখিয়াছিলেন। সংসারের সকল প্রকার দুঃখ শোক তিনি এইরূপে ভুলিয়া থাকিতেন। কিন্তু বনমালী তাহাতে বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। উপযুক্ত সন্তান, যাহাকে এত দিন যত্ন করিয়া লেখা পড়া শিখাইলেন, এক্ষণে সে অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা পরিবারের সাহায্য করিবে মনে মনে এই প্রত্যাশা। তাহা পূর্ণ না হওয়াতে ক্রমশঃ অসন্তুষ্টি বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। অনন্তর সেই বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল। গৃহিণীর অত্যাচার উৎপীড়ন, উত্তমর্ণদিগের তাড়না গঞ্জনা, সন্তানগণের দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া করিয়া সঞ্চিত অপরিতৃপ্ত রাগ টুকু শেষ এখন বাঞ্ছারামের উপরেই তিনি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায়, পৃথিবীতে কোন শক্তির বিনাশ নাই, আপাততঃ যাহার কার্য্য অপ্রকাশিত, সময়ে কার্য্যান্তরে অন্য কোন উপলক্ষে তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যখন বাহির হয় তখন আবার সে সুদ শুদ্ধ আদায় করিয়া লয়। সেই যে বনমালী স্ত্রীর নিকট নানা প্রকারে লাঞ্ছিত অপমানিত হইয়া, পুত্র কন্যাগণের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়াও কিছু বলিতেন না, চুপ করিয়া থাকিতেন, তাহাতে তাঁহার ক্রোধ বিরক্তি জীর্ণ প্রাপ্ত হইত না; যথা সময়ে এখন তাহা মহা বেগের সহিত বাঞ্ছারামের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। নিরীহ বাঞ্ছারাম যেন পিতার প্রত্যেক উত্তেজিত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রসন্নতা সম্পাদনের বলি-স্বরূপ ছিলেন। বনমালী প্রথম বিবাহে কিছু অর্থ লইয়া রুগ্ন কুৎসিত জরাগ্রস্ত বধূকে গৃহে আনেন। পরে তাহার দুরারোগ্য ব্যাধি জানিয়া পুনরায় অর্থ লালসায় পুত্রকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন।

বঙ্গসমাজে এক্ষণে কৃতবিদ্য সুপাত্র যেরূপ মূল্যবান সামগ্রী তাহাতে বাঞ্ছারামকে আমরা প্রথম শ্রেণীর পাত্র মনে করিতে পারি। বিবাহ দিলে নগদ দুই হাজার টাকাত অনায়াসেই পাওয়া যায়। পরিবার বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য কষ্টের সময় এরূপ লাভজনক কার্য্যের লোভ সম্বরণ করা বড় সহজ কথা নহে। নির্লজ্জ স্বার্থপর মোহান্ধ বনমালী পুত্রকে একবার বলিদান করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, দ্বিতীয় বার বলিদানের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু বাঞ্ছারাম এ বিষয়ে এখন ঠেকিয়া শিখিয়াছে। লোকের দেখিয়া শুনিয়া বিবাহের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। অধিকন্তু পিতার নীচ স্বার্থপরতা

বুঝিতে পারিয়া সে আরো সাবধান হইল। বনমালী তজ্জন্য অনেক শাপ মুন্যি দিলেন, কটু কাটব্য বলিলেন, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাঞ্ছারাম গ্রন্থ অধ্যয়নে দিবা নিশি মগ্ন থাকিতেন, সে সকল কথা কানে করিতেন না। বরং সংসারভূতগ্রস্ত পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি আপনাকে সুখী ও নিরাপদ ভাবিয়া মনে মনে একটু আহ্লাদিত হইতেন।

চারিদিকের অবস্থা যেরূপ অশান্তিজনক হইয়া উঠিল তাহাতে বাঞ্ছারাম পণ্ডিত আর বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। একে পিতার ক্রোধ অভিসম্পাত অভিমান, তাহার উপর পরিবারমধ্যে দিবা নিশি কোলাহল বিবাদ, ইহাতে তাঁহার চিন্তা অধ্যয়নেরও সমূহ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। বাস্তবিক বনমালীর বাসভবন যেন পিশাচগণের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বদা কেবল পান ভোজন বস্ত্র অলঙ্কারের কথা, আর অসার কুটুম্বিতার লৌকিক আড়ম্বর। প্রতিদিনের আহারের সময় যেন একটা ভূতের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। এক পাল ছেলে মেয়ে, এই খাইয়া উঠিল, আবার খাইতে বসিল। কেহ এক খান বেশী মাচ পায় নাই বলিয়া ষাড়ের মত চীৎকার করিতেছে, সেই অবসরে আর একটা আসিয়া তাহার পাতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা লইয়া প্রস্থানপরায়ণ হইয়াছে। কেহ বিবস্ত্র বিকটবেশে পেট মোটা গণেশের মত শুইয়া শুইয়া আঁবের আঁটি চুসিতেছে, কোনটা বা ভাত ডাল তরকারি লইয়া চারিদিকে ছিটাইতেছে আর সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছে। আহার করিতে করিতে কেহ বা তাহার বিপরীত কার্য্যও করিয়া বসিয়া আছে। একজন আর এক জনের মুখে ভাত তুলিয়া দিতেছিল, সে তাহার আঙ্গুল কামড়াইয়া লইয়াছে। একটা আপনার ভাগ খাইয়া আবার অপরের অবিকৃত অংশ আত্মসাতের উদ্যোগ করিতেছিল তজ্জন্য তাহাকে সে চুলে ধরিয়া কিলাইতেছে; এবং নিদারুণ নখাঘাতে তাহার গণ্ডস্থল অঙ্কিত করিতেছে। ইহা দর্শন করিয়া গিন্নী চেঁচাইতেছেন, কর্ত্তা চেঁচাইতেছেন, চাকরাণী ব্রাহ্মণী চেঁচাইতেছে, মহা চীৎকারের রোলে গৃহ পরিপূর্ণ। তিলার্দ্ধ কালের জন্য বাড়ীতে শান্তি নাই। বাঞ্ছারাম নানা প্রকারে জ্বালাতন হইয়া পরিশেষে গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বনমালী এবং তস্য পত্নীর হাড়ে বাতাস লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিজ্ঞানবিকার।

বাঞ্ছারাম যদি অগভীর চিত্ত চিন্তাহীন কোমল হৃদয় যুবক হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয় গৃহ পরিত্যাগ কালে তাঁহাকে কাঁদিতে হইত। অতিরিক্ত অধ্যয়নজন্য এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনায় তিনি ইদানীং কিছু কঠোর জ্ঞানী হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরিবারমধ্যে যে তাঁহাকে কেহ একটু স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিয়া কাঁদিবে এবং কাঁদিয়া কাঁদাইবে এমন এক জনও ছিল না। ভালবাসিবার লোক এক বামমণি পিসী, তিনিও কিছু দিন পূর্ব্বে পরলোক চলিয়া গিয়াছেন। নানাপ্রকার দুরবস্থা ও দৈব ঘটনায় মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার উপর বিজ্ঞান গ্রন্থ পাঠে চিত্ত এক কালে ঔদাসিন্য ভাব ধারণ করে। তদ্ভিন্ন পিতার দুর্ব্যবহারে এবং বিবাহবিভ্রাটে বাঞ্ছারামের হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যদিও মানসিক বল পরাক্রমে সে শোকাবেগ ফিরাইয়া তিনি মনকে কিয়ৎপরিমাণে আত্মবশে আনিয়াছিলেন, কিন্তু মর্ম্মে যে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহা সম্যকরূপে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এই নিদারুণ মর্ম্মবেদনা ভুলিবার জন্য তিনি অধিকতর উদ্যমের সহিত কয়েক বৎসর ক্রমাগত গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এই অধ্যয়ন এবং অতিরিক্ত চিন্তা গবেষণা বিচার তর্কে তাঁহাকে আবার আর এক প্রকারে গঠিত করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বের বিশ্বাস সংস্কার চিন্তাপ্রণালী আর এক নূতনবিধ পথে চলিতে লাগিল। প্রত্যক্ষবাদ অজ্ঞাতবাদ এবং জড়বাদ মতাবলম্বী আধুনিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে তাঁহাদের চিন্তা ও যুক্তি তর্কের ঘূর্ণাজলের মধ্যে তিনি পড়িয়া গেলেন। যাহাদের মতামত এবং চরিত্র ভালরূপে গঠিত হয় নাই, তাহাদের তরল মন বর্ষে বর্ষে মাসে মাসে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যখন যে গ্রন্থকারের গ্রন্থ তাহারা পাঠ করে, মনে হয়, ইহার তুল্য বিদ্বান্ আর কেহ নাই।

তরল পদার্থ পাত্রভেদে যেমন বিবিধ আকারে পরিণত হয়, যুবকগণের মনও তদ্রূপ। চতুর লোকদিগের বিকৃত মাস্তিষ্কপ্রসূত একদেশদর্শী বৈজ্ঞানিক মোহে প্রবঞ্চিত হইয়া তাহারা বড়ই অস্থিরতা প্রকাশ করে। বাঞ্ছারাম ভায়ার মানসিক অবস্থার ঘোর পরিবর্তন উপস্থিত হইল। ভৌতিক জ্ঞানের চাকচিক্যে তিনি আত্মতত্ত্ব একবারে ভুলিয়া গেলেন। ইতঃপূর্ব্বে কতকটা মায়াবাদী অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের ন্যায় ছিলেন, এক্ষণে জড়-বাদী অদৃষ্টবাদী অনাত্মবাদী হইয়া উঠিলেন। জগৎকারণের অনুসন্ধান, তাহার সহিত মনুষ্যের সাধারণ ও বিশেষ সম্বন্ধ নির্ণয়, এ সকল নিস্ফল-যত্ন জানিয়া বহির্মুখ পথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দিকে ধাবিত হইলেন। পদার্থ ছাড়িয়া ছায়া, সত্য ছাড়িয়া মায়া, নিয়ন্তা ছাড়িয়া নিয়ম, ধর্ম্ম ছাড়িয়া নীতি, ব্যক্তি ছাড়িয়া শক্তি, কারণ ছাড়িয়া কার্য্য লইয়া রহিলেন। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অদৃশ্য মহাশক্তির আলোচনা এখন আর ভাল লাগিত না, তাহা কবিকল্পনা, দুর্ব্বোধ্য অনায়ত্ত অনাবশ্যক পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে হইল।

জ্ঞানচর্চ্চা করিতে করিতে ইদানীং তাঁহার মনে কিছু তমোগুণেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অল্প বয়সে বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম হন, তাহার পর বিজ্ঞান বিষয়ে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করেন, ইহাতে মনটা একটু গরম হইয়া গেল। মনে করিতেন, "আমি সব বুঝিব, সমস্ত অমীমাং-সিত তত্ত্বের মীমাংসা করিব। কেনই বা না করিব? এত লেখা পড়া শিখিয়াছি তবে কিসের জন্য? বিদেশীয় ভাষায় যদি এত বড় বড় কঠিন গ্রন্থের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলাম; তবে অন্ধবিশ্বাসী অজ্ঞের ন্যায় হইয়া আর থাকিব না। বুদ্ধির আলোকে জ্ঞানের বিচারে সমস্ত তন্ন বিতন্ন খণ্ড বিখণ্ড করিয়া বুঝিব তবে ছাড়িব। কোন্ কালে সেই মান্ধাতার আমলে নিউটন বলিয়া গিয়াছেন, জ্ঞান উপার্জ্জন আর সমুদ্রের বেলাভূমিতে উপলখণ্ড সংগ্রহ দুই সমান, এখন এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কি সেই কথা মানিতে হইবে? মানুষ না পারে কি? এই মানুষই জ্ঞানোন্নতি সহকারে ক্রমে ঈশ্বরপদ লাভ করিবে। তবে আর তার পক্ষে অসাধ্য কি আছে? আমি এত দিন ধরিয়া যাহা পড়িলাম বুঝি-

লাম চিন্তা করিলাম তাহাত বড় সামান্য নয়, পর্ব্বত প্রমাণ গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছি। মূর্খ অন্ধদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাস অপেক্ষা নাস্তিক জ্ঞানী হওয়া ভাল। অজ্ঞানান্ধকারে সুখভোগ অপেক্ষা জ্ঞানে আত্মহত্যাও শ্রেয়স্কর।

তরুণবয়স্ক যুবকগণের বিদ্যার গরিমা হইলে যে দশা ঘটে বাঞ্ছারামের তাহাই হইল। তিনি খোদার উপর খোদগারি করিতে গিয়া মহা বিপদে পড়িলেন। প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্যের অনন্ত কার্য্যকারণের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শেষ না পারেন অগ্রসর হইতে, না পারেন ফিরিয়া আসিতে, মধ্যপথে পড়িয়া চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিলেন, বুদ্ধির ক্ষুদ্র দীপালোক নির্ব্বাণ হইয়া গেল। চারিদিকে অনন্ত অন্ধকার। সৃষ্টির গভীর রহস্য, নৈসর্গিক নিয়মাবলীর দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা মীমাংসা করিতে গিয়া শেষ আপনাকে পর্য্যন্ত আর খুঁজিয়া পান না। ভগবানের দূতেরা যেন গলা ধাক্কা দিয়া এক বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রের মধ্যে তাঁহাকে ফেলিয়া দিল। কোন দিকে কূল কিনারা দেখিতে না পাইয়া, অনেক নাকানি চোবানি হাবু ডুবু খাইয়া পরিশেষ এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন, যে "অপবিজ্ঞেয় তত্ত্বের অনুসন্ধানে কোন পুরুষার্থ নাই, যাহা দেখিতে শুনিতে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায়, যাহা আপাততঃ কাজে লাগে তাহা লইয়াই থাকা ভাল।" এই বলিয়া মৃত জড় পদার্থের রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। লাভের মধ্যে এই হইল, অনধিকার চর্চ্চা করিতে গিয়া মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যে যে মতে বিশ্বাস করিতেন, যে আদর্শ ধরিয়াছিলেন তাহার ঠিক বিপরীতদিকে চলিলেন।

প্রথমে ছিল যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর সে সমস্ত মায়ামরীচি স্বপ্ন কল্পনা, রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ মিথ্যা, কেবল নির্গুণ অবিভাজ্য শক্তিই সর্ব্বস্ব, এক্ষণ কেবল জড় আর জড়ীয় নিয়মাবলী সার জ্ঞান করিলেন। আত্মা বিবেক জ্ঞান চৈতন্য ইচ্ছা ভাব এ সমুদয়ের অস্তিত্ব উড়িয়া গেল, রহিল কেবল পরমাণুপুঞ্জ তাড়িৎ ইথার অক্সিজন্ নাইট্রজন্ কার্ব্বণ ফস্‌ফরাস্ প্রোটোপ্লজম মোলকিউল, আকর্ষণ বিশ্লেষণ আর সংযোগ বিয়োগ। এই নূতন পথে নূতন মতে দীক্ষিত হইয়া এক একবার বাঞ্ছারাম পণ্ডিত মনে ভাবিতেন, তিনি নিজেও যেন কেবল পরমাণুপিণ্ড, কতকগুলি জড়ীয়

পার্থিব উপাদানের সমষ্টি মাত্র, কতকটা যেন যন্ত্রপরিচালক বাষ্পের মত, এতদ্ভিন্ন তাঁহার ব্যক্তিত্ব বা আমিত্বের স্বতন্ত্রতা কিছু নাই। কখন বা মনে করিতেন, "আমি নাই, ভৌতিক পদার্থপুঞ্জের সহিত আমি এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছি। পঙ্কে পঙ্ক লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। জলের সঙ্গে জল হইয়া, আগুনের সঙ্গে আগুন হইয়া, ফুল ফল তরুলতার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াই সুখ, ব্যক্তিত্বের ভার বহন বড় কষ্টকর। আমি নাই, এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান" "আমি আছি, আমি ভাবিতেছি, চিন্তা করিতেছি" ইত্যাদি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানেও সংশয় জন্মিল। সময়ে সময়ে নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা মহা কষ্টকর হইত। দেশীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রে পাঁচটা ভূত ছিল, তাহাদের জ্বালাতেই লোকে জ্বলিয়া মরিত বিলাতি বিজ্ঞানের পঞ্চষষ্টি ভূত ঘাড়ে চাপিয়া বাঞ্ছারামকে ঘুরাইতে লাগিল। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য ইহা স্থির ও হয় না, মনে শান্তিও পান না, যেন আঁধারে ছুটা ছুটি আরম্ভ করিলেন। অনেক প্রকার কূট শব্দ সংজ্ঞা নিয়ম ব্যবস্থা মুখস্থ হইল, কিন্তু জ্ঞান জন্মিল না। জ্ঞানময়কে ছাড়িয়া জ্ঞানানুসন্ধান! হরি-ছাড়া কীর্ত্তন। ইহা কি কখন হইতে পারে?

পণ্ডিত এইরূপে জড় ভাবিতে ভাবিতে জড় ভরতের মত জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। শুষ্ক চিন্তায় হৃদয় শুকাইয়া গিয়াছিল, স্নেহ মমতা ভক্তি প্রীতি-রস অনুভব করিতে পারিতেন না, ঠিক যেন এক খণ্ড দগ্ধ দারুর ন্যায় নীরস মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। যে যেমন চিন্তা করে, পরিণামে সে সেই ভাবে পরিণত হয়, এ কথা অতি সুসঙ্গত। চৈতন্যের রাজ্য ছাড়িয়া মনুষ্য হতচৈতন্য জড়ভূত হইয়া উঠে তখন তাহার মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। আবার চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করিলে ভাব ভক্তি প্রেম আনন্দে প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় সে সুন্দর এবং সরস দেব প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। একে বাঞ্ছারাম স্নেহ বাৎসল্য দাম্পত্য প্রেম, বন্ধু বান্ধবের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত, তাহার উপর কঠোর চিন্তা বিজ্ঞানবিকার, ইহাতে তিনি একটী নিতান্ত দয়ার পাত্র হইয়া পড়িলেন। সুবিধার মধ্যে এই, জড়বাদ মতে সচরাচর লোকদিগকে যেমন যথেচ্ছাচারী করিয়া ফেলে তাঁহাকে সেরূপ করিতে পারে নাই। বরং জড়ের জড়ত্ব তাঁহাকে নির্ব্বাণগতিপরায়ণ শান্ত চিত্ত

করিয়া দিয়াছিল। তাহার অনুকরণে তিনি এক প্রকার সাম্যাবস্থা লাভ করেন। কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা ভাবান্ধতা বা জ্ঞানানুশীলনে তাঁহাকে পাপের পথে কখনো লইয়া যাইতে পারে নাই। জ্ঞান বিষয়েই যাহা কিছু একটু পাগলামি ছিল। তিনি যেন ছোট খাট একটী লাইব্রেরি। যে সংবাদ শুনিতে চাহিবে তাহা এখানে পাইতে পারিবে। কেবল দুঃখের বিষয় এই, মিল্ কোমৎ স্পেনসার দারউইন হিউম বেকন বেন টিণ্ডেল হক্সিলী, আরো কত কত (যাহাদের নাম এ কালের ছেলেরা বক্তৃতার সময় ফড় ফড় করিয়া সচরাচর বলে; আমাদের মত সেকেলে লোকের মুখে যাহাদের নাম উচ্চারিত হয় না,) জ্ঞানীদিগের নাম যখন তখন উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু একটী বার ভুলিয়াও ভগবানের নাম মুখে আনিতেন না। সে বিষয়ে একবারে উদাসীন নির্লিপ্ত বৈরাগী। তিনি সৃষ্টির শোভা, প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খল কৌশল দেখিয়া কর্ত্তাকে একবারে ভুলিয়া যান। কিন্তু ভদ্রতা সৌজন্য সত্যপ্রিয়তা ন্যায়পরতা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে চিরদিন ভূষিত ছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পথে।

বাঞ্ছারাম যৎকালে পৈতৃকভবন হইতে নির্ব্বাসিত হন তখন তাঁহার এইরূপ মনের অবস্থা। এই পরিবর্ত্তিত মানসিক অবস্থা লইয়া নন্দনগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি বসন্তপুরাভিমুখে মাতুলালয়ে যাত্রা করিলেন। পথের সম্বল কয়েক খণ্ড গ্রন্থ, আর পুরাতন সংখ্যার নাইটিন্থ সেঞ্চুরি রিভিউ। জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ, সম্প্রতি দুই পাঁচটা বৃষ্টি হইয়া রাস্তা ঘাট মাঠ বাগানকে ধৌত করিয়া গিয়াছে। হরিদ্বর্ণ নবীন দূর্ব্বাদলশোভিত তটপ্রবাহিনী সুরশৈবলিনী জাহ্নবী গৈরিক বসন পরিধানপূর্ব্বক প্রেমোন্মাদিনী যোগিনীর বেশে সুমন্দ মারুত হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া সিন্ধুর উদ্দেশে ধাবিত হইতেছেন। তাঁহার সেই হাস্যময় শীতল বক্ষবিহারিণী ক্রীড়াশীল

উর্ম্মীমালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শ্বেত পক্ষবিশিষ্ট শত শত তরণী শ্রেণীবদ্ধ রূপে সবেগে ছুটিতেছে। স্নানার্থী নরনারী বালক যুবকের জনতায় ঘাট পরিপূর্ণ। মহিলাগণ আর্দ্রবসনে উর্দ্ধনয়নে আলুলায়িত কেশে কৃতাঞ্জলি পুটে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার পূজা অর্চ্চনা করিতেছে, কেহবা নৈবিদ্য ফুল ফল গঙ্গাতরঙ্গে ভাসাইয়া দিতেছে। সন্তরণপটু অভিভাবকবিহীন বালকগণ তাহা ধরিবার জন্য জলজন্তুর ন্যায় ডুবিতেছে উঠিতেছে ছুটিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক জন দীর্ঘশিখাধারী উন্নতনাসা লম্বোদর ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ কুটিল কটাক্ষপাতের সহিত তার স্বরে গর্ব্বিত ভাবে এমনি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, যেন শাস্ত্র তন্ত্র সমস্ত তাঁহার উদরস্থ; তিনি যেন ধর্ম্মকর্ম্মের জন্মদাতা পিতা; তাঁহার বাড়ীতেই যেন ধর্ম্মবিধি সকল প্রস্তুত হয়। গুলিখোর বাবু গামছা কাঁধে ফেলিয়া কিনারায় বসিয়া ভাবিতেছেন, স্নান করিবেন কি না। পাছে নেশা ছুটিয়া যায়, ছয়টী পয়সার আফিং লোকসান্ হয় এই তাঁর ভাবনা। তিনি ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া শেষ অঙ্গুলী দ্বারা একটু একটু জল মাথায় দিতেছেন, আর ঘন দুগ্ধের সর ভোজন কেমন সুখের বিষয় মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতেছেন। যণ্ডা যুবকের দল ঘাটে বসিয়া জটলা করিতেছে, পথ ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না। ইহারা প্রাতে উঠিয়া তাস খেলে, আবার স্নানের পর পাশা সতরঞ্চ লইয়া বসে, সুতরাং তত তাড়া তাড়ি নাই। বসিয়া বসিয়া বিলম্ব করিবার আরও একটা মন্দ উদ্দেশ্য আছে। মুদি দোকানদার সরিষার তৈলে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া ঝুপ ঝাপ শব্দে জলে পড়িল, ডুব দিল, সূর্য্যের দিকে চাহিয়া হাত যোড় করিল, তিন অঞ্জলি জল তুলিয়া জলে ফেলিল, শেষ প্রণাম করিয়া দোকানে ফিরিয়া গেল। নিজ ব্যবসায় ছাড়া তার অন্য চিন্তাও নাই, অন্য দৃষ্টিও নাই।

স্নানের ঘাটের উপরেই ঘোড়াগাড়ীর আড্ডা। কোচমান আলিজান্ মাটীর আলবোলায় তামাকু খাইতে খাইতে আধা বাঙ্গালা আধা হিন্দিতে বাঞ্ছারামের সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি আরম্ভ করিলেন। দুই পাঁচটা ইংরাজি কথাও তাঁহার জানা ছিল। আলিজান মিঞার শরীরটী গুলি খাইয়া খাইয়া পোড়া কাঠ খানির মত হইয়াছে, গলায় এক গাছা পত বুননীর

বাসি বেল ফুলের মালা, কোটরে প্রবিষ্ট ঈষৎ লোহিত চক্ষুর্দ্বয় মিট্ মিট্ করিতেছে। ঘাড়ের চুল ছাঁটা, মাথায় সিঁতি কাটা, গায়ে একটা রঙ্গীন কাপড়ের ফতুয়া আঁটা। হাসিতে হাসিতে নানা রঙ্গ ভঙ্গে নিজের গাড়ী ঘোড়ার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া এক গুণ ভাড়ার জায়গায় চারি গুণ হাঁকিলেন। তৎসঙ্গে অপরের গাড়ীর দোষ ঘোষণা করিলেন। বাঞ্ছারাম জীবনের মধ্যে কেবল সেই এক দিন মাত্র বাজার করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, পিসী ঠাকুরাণীর ধমক খাইয়া আর সে বিষয়ে কখন সাহসীও হন নাই। পৃথিবীর ব্যবসায়ী চতুর লোকদিগের শ্রুতিমধুর কপট বাক্যের যথার্থ অর্থ অবধারণে তাঁহার ক্ষমতা আদৌ ছিল না। তবে এই মাত্র জানিতেন যে, যে যত দর বলে তাহার অর্দ্ধেকে রফা করিতে হয়। কিন্তু আলিজান যে চতুর্গুণ দাম হাঁকিয়াছিল তাহা তিনি কিরূপে বুঝিবেন? বিশেষতঃ সে দামের কথাটা ইংরাজিতে বলে, এবং তৎসঙ্গে একপ তাঁহাকে আশা দেয়, যে ষোল মাইল পথ দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়া দিবে। ইংরাজি কথার সম্ভ্রম আছে, কারণ ইংরাজেরা মিথ্যা কথা কয় না, কাজেই বাঞ্ছারাম ভাড়ায় ঠকিয়া এক গুণের স্থানে দ্বিগুণ স্বীকার করিয়া গমনোদ্যত হইলেন এবং অর্দ্ধেক মূল্য অগ্রিম দিয়া আলিজানের হাতে প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

আলিজান আস্তাবেলে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমতঃ বদনার জলে গোসোল করিল, তার পর রুটী কাবাবের সানুক লইয়া নাস্তায় বসিল। নাস্তা করিয়া একখানা ভাঙ্গা কাঠের চিরুণি দ্বারা চুল আঁচড়াইয়া দুই চক্ষের কিনারে সুর্ম্মা লাগাইতে লাগিল, আর সহিস রহিমবক্সকে আলবোলায় তামাকু তৈয়ার করিতে হুকুম দিল। পরে তাহাকে ঘোড়ায় সাজ চড়াইতে বলিয়া সে আস্তাবোলের বাঁদরের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিল। এ দিকে বাঞ্ছারাম রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ এবং গলদঘর্ম্ম হইয়া ক্রমাগত অপেক্ষা করিতেছেন। ভাগ্যে তাঁর চিন্তাশীল মন পথে ঘাটে যেখানে সেখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চিন্তায় সহজে মগ্ন হইতে পারিত তাই রক্ষা, নতুবা অন্য কেহ হইলে এত ক্ষণ চটিয়া লাল হইত সন্দেহ নাই। এক একবার গাড়ীর কথাটা স্মরণ হওয়াতে "কৈ হে, সময় যে গেল, শীঘ্র এস না?" এই বলিয়া ডাকিতেছেন। কেইবা

তাঁর ডাক শুনে ? কোচমান সাহেব তখনো নাস্তা করিয়া সুর্ম্মা পরিয়া তামাকু সেবনে মগ্ন আছেন। বাঞ্ছারাম যেমন তত্ত্বচিন্তার আবেশে বিভোর, অহিফেনসেবী আলিজান ধূম পানে তাহা অপেক্ষা গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়া আরসায় মুখ দেখিতেছে, চুল ফিরাইতেছে, পয়সায় এক তোলা যে আতর তাহা গোঁফ এবং দাড়িতে মাখিতেছে॥ সহিস রহিমবক্স তখন ঘোড়ায় সাজ দিতেছিল। সে একটা হাড়পেকে মুসলমানের ছেলে, ন্যাংটে ডাল কুকুরের মত চেহারা, বুড় গরুর পাকা হাড় মাস চিবাইয়া চিবাইয়া তাহার মুখে শিরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে; দেখিলেই বোধ হয় যেন যমের অরুচি, অথবা হজম করিতে পারিবেন না বলিয়া যমরাজ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহার বাহ্য আকার যেমন কঠোর, আন্তরিক স্বভাবটিও তেমনি কাঁকড়া বিছার মত বিষাক্ত। পাথরে আছাড় মারিলেও তাহার মরণ হয় কি না সন্দেহ। রৌদ্র বৃষ্টিতে কোচমানের চাবুক প্রহার এবং গালাগালিতে এমনি সে তৈয়ার হইয়া উঠিতেছে, যে ভবিষ্যতে সে যখন আবার কোচমান হবে, তখন ভদ্রসন্তানদিগের হাড় জ্বালাতন করিয়া তুলিবে।

প্রায় ঘণ্টা দুই কাল বাঞ্ছারামের প্রচুর ধৈর্য্যরাশিকে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন করিয়া আলিজান রথারোহণে বহির্গত হইলেন।

গাড়ী খানি নগরমধ্যে বহুকাল পথে পথে রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া পাথরের খোয়া এবং ট্রামওয়ের রেলের ধাক্কা খাইয়া জরা জীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি ঘুসের গুণে লাইসেন্স ইনেস্পেক্টর বাবু কয়েক বৎসর রেজিষ্টারি করিয়া চালাইয়া দিয়াছিলেন; শেষ যখন নিতান্ত অচল হইয়া পড়িল, তখন সহরে সে আর স্থান পাইল না, কাজেই সেই নাগরিক উচ্ছিষ্ট এক্ষণে গ্রাম্য বাবুদের নিকট প্রসাদ রূপে উপস্থিত হইয়াছে। একে তৃতীয় শ্রেণী তাহাতে ভগ্ন জীর্ণ পুরাতন, আলিজান মিঞা গোটা কুড়িক টাকায় তাহা কিনিয়া যেখানে যেখানে রং উঠিয়া গিয়াছিল সেখানে আলকাতরার পটী দিয়াছেন, ভগ্ন স্থান সকলে দড়ি জড়াইয়াছেন। আর গদী দুইটী, তার কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল; সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, তার অয়েল ক্লথ ফাটিয়া ছোবড়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। খাবড়া

মারিলে ধূলায় গগন আচ্ছন্ন হয়। কত পচা ইলিস মাচ, আর বসন্ত ওলা-উঠার মৃতদেহ যে সে বহন করিয়াছে তাহা বলা যায় না।

পশ্চাদ্দেশে রহিমবক্স আলবোলা হস্তে দণ্ডায়মান. অ'লিজান ধীরে ধীরে ঝর্ঝর ঘর্ঘর থনন্ থনন্ ঝনন্ ঝনন্ নজ বজ হ্যাঁকোচ কেঁাকোচ শব্দে গাড়ী লইয়া বাঞ্ছারামের অদূরে দাঁড়াইল,এবং "বাবু আসুন মহাশয়!" বলিয়া দুই একবার ডাকিল। বাবু তখনও চিন্তার ঘোরেই ছিলেন। প্রথম দুই একটা ডাক কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। তখন সেই সয়তানের অবতার কোচমান ধমক দিয়া বলিল, "কি মশায় আপনি দেরি করিতেছেন! ঘণ্টাভোর গাড়ী নিয়ে বসে আছি। এ সতো এস, নৈলে আমি দোসরা ভাড়া নিয়ে এখনি চলে যাব! এতক্ষণ বেফয়দা খাড়া করিয়ে রাখলে, এর জন্য আর আট আনা ভাড়া বেশী দিতে হবে।" এরূপ বেয়াদবি আর দুষ্টমির কথা শুনিলে মরা মানুষের ক্রোধের উদয় হয়। বাঞ্ছারাম একটু চটিয়া বলিলেন, "তুমি আপনি বিলম্ব করিয়া শেষ আমার উপর দোষারোপ করিতেছ? কি রমক তোমাদের ধর্ম্ম হে বাপু?" আলিজান তখন আরো দুষ্টমির সহিত গর্ব্বিত ভাবে বলিল, "আরে যাও মশায়, তোমার মত অনেক বাবু দেখা আছে। এখন জল্দি জল্দি এসত এস, আমার ঘোড়া থামছে না, গরম হয়ে উঠেছে।"

বাঞ্ছারাম আর কোন কথার উত্তর না দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। উঠিবার সময় প্রেকের খোঁচা লাগিয়া গায়ে রক্ত পড়িল, চাদর খানি ছিঁড়িয়া গেল। অনন্তর কোচমান ঘোটকের রাসরজ্জু ধরিয়া টানিল, ঘোড়া নড়িল না; দ্বিতীয় বার টানিল তাহাতেও না; শেষ পুনঃ পুনঃ সজোরে টানাটানি আরম্ভ করায় তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং তাহারা ঘাড় ফিরাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত দন্তপাতি বাহির করিয়া যেন বলিয়া উঠিল, "আঃ কর কি! একটু থাম না, যাওয়া যাচ্চে! এত ব্যস্ত কেন?" গদ্যপ্রিয় কবিত্বরসহীন পাঠক পাঠিকাগণ হয়তো বলিবেন, ঘোড়া চতুষ্পদ পশু, তারা কি কথা কহিতে পারে? আমরা বলি, কেন পারিবে না? সকলেই নিজ নিজ ভাষায় কথা কহিতে পারে। প্রেমিক জন তাহা শুনিতে পান। কথা কহা ছাড়া অনেক রকম ভাষা জগতে প্রচলিত আছে। ঘোড়া দুইটী দাঁতের

দাড়ি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, চারি পা ছুড়িয়া এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদের দুঃখ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। শ্রান্ত দুর্ব্বল ক্ষতাঙ্গ অশ্বযোজিত তৃতীয় শ্রেণীতে যাঁহারা আরোহণ করিয়াছেন তাঁহারা ঘোটকের ইঙ্গিতের ভাষার অর্থ অবশ্যই জানেন। অশ্বদ্বয়ের এরূপ বিরক্তির বিশেষ কারণ ছিল। তাহারা পূর্ব্ব দিবসে সমস্ত নিশি জাগিয়া বসন্তপুর হইতে নন্দনগ্রামে আসে, একবারও নিদ্রা যাইতে পায় নাই, তার পর শ্রান্তি দূর হইতে না হইতে আবার চলিতে হইবে, কাজেই ইহাতে বিরক্তি হয় আর না হয়!

ঘোড়া দুইটী কিরূপ দুর্দ্দশাপন্ন তদ্বিবরণ শুনিলে অনেকের চক্ষে জল আসিবে। একটী বড একটী ছোট। বড়টী নূতন, একটু শাঁসে জলে আছে। চাবুকের প্রহারে ছোটটীর গায়ের লোম প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। মুরগীর ছোট ছানা গুলি যেমন, কিম্বা যে সকল শালিক পাখীর পাখা উঠে নাই তাদের যেমন দেখিতে, এই ঘোড়া দুইটীর চেহারা ঠিক তেমনি। পক্ষীরাজের দুই দিকের ডানা বাহির হইয়াছে, ভূচর হইয়াও সে যেন খেচর হইয়া পড়িয়াছে, গলায় এবং পায়ে ঘা দগ্ দগ্ করিতেছে, চক্ষে ছানিভরা, তাহাতে মাছি বসিয়াছে, লাঙ্গুলটী গিরগিটির ল্যাজের ন্যায় নিলোম, তাহা সহস্র কীটের আবাস স্থান। উদরে দানা পানি নাই, নিদ্রার ভারে চক্ষে জল ঝরিতেছে, এমনি কাহিল যে ঠেলা দিলে যেন পড়িয়া মরে। তাহার উপর শত গ্রন্থিযুক্ত পচা চামড়ার সাজ। যাহাই হউক, সোয়ার পৌঁছিয়া দিয়া ভাড়া লওয়া মাত্র কোচমানের প্রয়োজন, দয়া মায়া করিলে তাহার ব্যবসায় চলে না; বিশেষতঃ ভাঙ্গা গাড়ী মরা ঘোড়া তাড়াইয়া সে নিজেও খেঁকি কুকুরের মত হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় সে রাস ধরিয়া সবলে টানিল, তৎসঙ্গে প্রথম দুই চারি বার মিষ্ট বাক্যে আশা ভরসা দিয়া আদর স্নেহ দেখাইল; তদনন্তর দড়ির চাবুক মারিল, তাহাতে কিছু হইল না, লাঠী সোটা বাহির করিয়া তাহা দ্বারা যত পারিল ঠেঙ্গাইল, অশ্লীল দুর্ব্বাক্যে গালি দিয়া ঘোড়ার বংশের চতুর্দ্দশ পুরুষের নিন্দা গ্লানি প্রচার করিল; তবু ঘোড়া নড়িল না, ক্রমে পথপার্শ্বে খানার দিকে যাইতে লাগিল, আস্তাবোলের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। পশুরা যদি নিজ নিজ

স্বাধীনতার ব্যবহার করে, কার সাধ্য তাহাদিগের দ্বারা কাজ করাইয়া লয় ? পরিশেষে আলিজান ঘোড়ার ঠ্যাঙ্গে দড়ি দিয়া টানা টানি আরম্ভ করিল, এবং বহিমবক্স চাকা ম্যারতে লাগিল। যখন এত দূর পর্য্যন্ত পীড়াপীড়ি হইল তখন কনিষ্ঠ দুর্দ্দশ ঘোটকটী পথের মাঝ খানে একেবারে শুইয়া পড়িল। সে স্পষ্টই বলিল, "আমি একটু না ঘুমাইলে কিছুতেই আর যাইতে পারিব না।" এই বলিয়া কাঁদিয়া সে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আমাদের পণ্ডিতজী ভিতরে বসিয়াছিলেন, সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতে পান নাই, দেখিলে হয়তো পশুর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তিনি একটা বালিস বিছানা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনিয়া দিতেন। অনেক চেষ্টা যত্নের পর শেষ গাড়ী খানি আস্তাবোল ছাড়িয়া গম্যস্থানের দিকে শনৈঃ শনৈঃ গমনে প্রবৃত্ত হয়।

বাঞ্ছারাম গাড়ীর ভিতরে চাহিয়া দেখেন, পায়ের নীচে কতকগুলা বসা বসি, কোচমান সহিসের বিছানা আসবাব, কাঁথা কম্বল, ও খাদ্য ; ঘোড়ার থরা তুষ এবং থলে পোরা ঘাসের রাশি। গাড়ীর দরজা জানালা নামাইতে উঠাইতে সরাইতে গেলেন তাহারা কেহ উঠিলও না, নামিলও না, এক আঙ্গুল সরিলও না, অনেক ঠেলা ঠেলিতে যদিও দুই একটা নড়িল, কিন্তু স্থানচ্যুত হইয়া একবারেই নামিয়া পড়িল। তখন তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া আবার গাড়ীর মধ্যে সাবধানে স্থান করিয়া দিতে হইল। কোচমান হতভাগাটা সে সময় ঝিমাইতেছিল, নতুবা জাগ্রত থাকিলে নিশ্চয় কতক বকিত এবং ভর্ৎসনা করিত। মধ্যপথে আসিয়া মাঝে মাঝে ঘোড়া দুইটি ক্ষেপিয়া উঠে, তজ্জন্য বার বার বাঞ্ছারামকে নামিতে হয়, এবং নিজেও চাকা ঠেলিতে হয়। পেটরোগা ঘোড়া, না পারে চলিতে, না পারে দৌড়িতে। দুই এক পা যায়, আবার থমকিয়া দাঁড়ায়, ইহা ব্যতীত একটা উপসর্গ আছে যাহাতে পুনঃ পুনঃ নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিতে হয়। কখনো চাকা ঠেলিয়া, কখন গুণ টানিয়া, কখন বা আরোহীকে নামাইয়া সারথী রথ চালাইতে লাগিল। এক এক বার খুব বেগে চলিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অন্য প্রকার বিপদ ঘটিল ; চাকা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। ফলতঃ বাঞ্ছারামের ইহা অপেক্ষা হাঁটিয়া যাওয়া অনেক

ভাল ছিল। তাঁহার দুঃখের কাহিনী আর সবিস্তারে বলিবার আবশ্যকতা নাই, অবশিষ্ট কষ্টভোগ সকলে বুঝিয়া লইন। কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই।

বসন্তপুর পৌঁছিতে এক ক্রোশ পথ বাকী আছে, এমন সময় কোচমান বলিল, "বাবু, তুমি এইখানে নাব, আর গাড়ী চলিবে না।" এই বলিয়া সে ঘোড়া গাড়ী রাসরজ্জু এবং আরোহীর উদ্দেশে আপন মনে বিজির বিজির করিয়া বকিতে লাগিল। দুই পাঁচটা গালাগালিও দিল। বাঞ্ছারাম তখন তাহার ভাব গতি দেখিয়া না হাসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। শেষ দেখিলেন, বড বেগতিক, পথের মাঝে মারিয়া ধরিয়া কাপড় চোপড় কাড়িয়া লইয়া যদি বিদায় করে, অনায়াসে পারে।

চলিতে চলিতে পশ্চাদ্ভাগের এক খান চাকা খসিয়া গড়াইতে গড়াইতে পথ-পার্শ্বে পড়িয়া গেল, আর তাহা আপন স্থানে সম্বদ্ধ হইল না। তিন চাকাতেও গাড়ী চলিতে পারে দেখা গিয়াছে, কিন্তু আরোহী তাহাতে থাকিতে পারে না। কাজেই বাঞ্ছারামকে নামিতে হইল। এ দিকে বেলাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় দৈবক্রমে আকাশের উত্তর পশ্চিম কোণে এক খানি ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস উঠিল, এবং দিগ্‌ হইতে দিগন্তরে বিজলীর মালা চমকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নিবিড় জলদজালে সমস্ত গগনমণ্ডল ছাইয়া ফেলিল। শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, ঘনপল্লবিত হরিদ্বর্ণ আম্রকাননের ছায়া, তাহার উপর গাঢ কৃষ্ণ মেঘ-মালা, এমনি অন্ধকার হইয়া উঠিল যে আর কোন দিকে কিছুই নয়নগোচর হয় না। ক্রমে জোর বাতাস বহিতে লাগিল। শেষ বিষম বৃষ্টি ঝড় তুফানে একবারে প্রাণিপুঞ্জকে আকুল করিয়া তুলিল। পথের উড্ডীয়মান ধূলিরাশিতে ঘোটক ও সারথীর চক্ষুকে অন্ধপ্রায় করিয়া গাড়ী ঘোড়া কোচমানকে বায়ু-বেগে উড়াইয়া একবারে খানার মধ্যে আনিয়া ফেলিল। তাহার কিছু পূর্ব্বে বাঞ্ছারাম নামিয়া পড়িয়াছেন এবং নিকটস্থ আমবাগানের আম্রবিক্রেতাদিগের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়াছেন। তখন আলিজানের ভগ্ন গাড়ী ভাঙ্গিয়া গেল, মরা ঘোড়া খাবি খাইতে লাগিল, সে নিজেও নাস্তা নাবুদ হইয়া পড়িল। তাহার উপর দিয়া মহা বিক্রমের সহিত ঝড় বহিয়া গেল, গম গম

গুড় গুড় নাদে মেঘ গর্জ্জিল, শেষ বৃষ্টির ধমকে আর বাতাসের ঝাপটে তাহার প্রাণকে ওষ্ঠাগত করিল।

অনন্তর ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেলে বাঞ্ছারাম অবশিষ্ট পথ টুকু পদব্রজেই গমন করিতে বাধ্য হন। এত ক্ষণ তাঁহাকে যেন মামদ ভূতে পাইয়াছিল, শেষ ঝড় জলের সঙ্গে আপনার ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া সে ভূত পলায়ন করিল। পূর্ব্ব গগনে কাল মেঘ তখনও জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, তাহার শিখরাগ্রভাগে অস্তাচলগামী সূর্য্যের রশ্মিমালা নিপতিত হইয়া আকাশকে বিচিত্র বর্ণে সুচিত্রিত করিয়াছে। নিদাঘ কালের উত্তপ্ত মেদিনী বৃষ্টির শীতল জলে যখন স্নান করিয়া উঠে এবং তাহার উপর অস্তমিত তপনের হেম বর্ণ কিরণচ্ছটা এবং সন্ধ্যার শীতল ছায়া আসিয়া যখন পতিত হয়, তখন তৃণপত্রাচ্ছাদিত ভূভাগ, বৃক্ষ লতা সমাকীর্ণ উদ্যান, বনভূমি এবং সরসী স্রোতস্বতী তরুরাজী সকল কি এক স্নিগ্ধ মূর্ত্তিই ধারণ করে। পথের ধূলা উড়িয়া গিয়াছে, সুরকির লোহিত বর্ণরঞ্জিত সরল রাজবর্ত্মটী বারিধারা সংস্পর্শে সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে আম্রকাননশ্রেণী হরিদ্বর্ণে পথশ্রান্ত জনের তাপিত চক্ষুকে শীতল করিতেছে, নিকুঞ্জ বনের মধ্যে বসিয়া দয়েল পাখী পরমানন্দে গীত গাইতেছে, বাঞ্ছারাম এই নয়নরঞ্জন শোভা সন্দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। ইহা দর্শনে তাঁহার প্রথশ্রান্তি দূর হইল কেবল তাহা নহে, মনে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক চিন্তার তরঙ্গ উঠিল। প্রকৃতি দেবীর অনুপম শোভা দেখিতে দেখিতে বসন্তপুর গ্রামে মাতুলভবনে তিনি প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শূন্যে গৃহ নির্ম্মাণ।

সন্তোষিণীকে আমরা পূর্ব্বে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সে অবস্থায় আর তিনি এখন নাই, তাঁহার প্রেমকল্পনা অতিমাত্র তেজস্বিনী উম্মাদিনী হইয়া তাঁহাকে দিবা রাত্রি প্রিয়তমের জন্য মত্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। দুঃখিনী অবলার প্রেমে বাঞ্ছারামের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই, কারণ সে ইহার সংবাদ কিছুই জানে না, অপরের নিকটতো সম্পূর্ণই প্রচ্ছন্ন, কেবল আপনার হৃদয়াধারে আবদ্ধ থাকিয়া সে প্রেম নিত্য নব নব কল্পনা পান ভোজন করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে কল্পনারথে চড়িয়া বিচিত্র কল্পনার রাজ্যে মহানন্দে সে বিচরণ করিত, কখন বা দুশ্চিন্তা নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবায়ুর তাড়নাতে অবসাদগ্রস্ত হইয়া বিষাদ অন্ধকারের গভীর গহ্বরে শুইয়া পড়িত। বাঞ্ছারামের সহিত সন্তোষিণীর ইতঃপূর্ব্বে বসন্তপুরে অল্প দিনের জন্য দুই একবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাহার পর বিচ্ছেদ সময়ে দুই একখানি পত্রও তিনি প্রাপ্ত হন। এই চাক্ষুষ দর্শন এবং পত্র কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সুখকল্পনার মনোহর নিকেতনের ভিত্তি ভূমির দৃঢ়তা সাধন করে। কিন্তু এমন কিছু ইহাতে প্রকাশ পায় নাই যাহাতে তাঁহার আশা পিপাসা চরিতার্থ হয়। মানুষ কি ভ্রান্ত! বিশেষতঃ প্রেমবিকারগ্রস্ত যুবক যুবতী। সে তিলকে তাল মনে করিয়া বসে, শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। যে সকল পবিত্র কল্পনা কল্পনাতীত নিত্য সত্য আদিপুরুষের জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ভাবের গাম্ভীর্য্য মহত্ত্ব সৌন্দর্য্য রমণীয়তাকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করত অমর জীবের অনন্তজীবনের জীবিকা রূপে নিরন্তর চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখে, তাহা চর্ম্মচক্ষেরগোচরীভূত প্রত্যক্ষ ঘটনার ন্যায় না হইলেও তদবলম্বনে মানবজীবন স্বর্গের সুখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অসার ভোগ সুখাসক্ত জীব সচরাচর সে পথে যাইতে চাহে না।

হায়। যদি কল্পনাতেই সুখী হইতে হইল, তবে নরক কল্পনা করিয়া কেন নারকী হইব? কল্পনায় কেন স্বর্গভোগ করি না? খরচত একই, পরিশ্রমেরও কিছু ইতর বিশেষ নাই। স্বর্গ নরক খুব কাছাকাছি। স্বর্গের অস্তিত্ব আছে, নিত্যতা আছে, তাহার সুখ সৌন্দর্য্যও অনন্ত; এ সম্বন্ধে কল্পনাও সত্য হইয়া আত্মার বৃত্তি সমুদয়কে নিত্যকাল পরিপোষণ এবং সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিতে পারে। কিন্তু যাহার অস্তিত্ব অনেক সময় থাকে না, থাকিলেও যাহা চিরদিন সম্ভোগ করা যায় না; অথবা আদৌ যাহা দুষ্প্রাপ্য, কিম্বা প্রাপ্য হইলেও অসার ক্ষণধ্বংসী; কল্পনা শক্তি কেন তাহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে। অথবা পার্থিব সুখের অতীত অপার্থিব স্বর্গসুখকে যাহারা কবিকল্পনা মনে করিয়া বসিয়া আছে, ইহ জীবনই যাহাদের সর্ব্বস্ব, তাহাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। সন্তোষিণী বুদ্ধিমতী ধর্ম্মভীরু নারী, অপার্থিব অনন্ত স্বর্গের অস্তিত্বে সে বিশ্বাস না করিত এমন নহে, কিন্তু তাহার বিশ্বাস সংস্কার বাস্তবামের মত বলশালী ছিল না; সুতরাং তাহা বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যতে, স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম, জড় ছাড়িয়া অনন্ত চৈতন্যের দিকে প্রসারিত হইল না, কার্য্যকালে সে বিশ্বাস বিদ্যুৎবৎ চমকিয়া তাহাকে ঘোর নিরাশান্ধকারে ফেলিয়া গেল। সুতরাং সন্তোষিণী মিথ্যা অসার অনিত্যের উপর কল্পনার মায়াপুরী গঠন করিতে ছাড়িলেন না। তাহাকে এখন বুঝান বৃথা। শেষ পর্য্যন্ত সে দেখিবে, দেখিয়া যখন প্রতিঘাত পাইবে তখন মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখন তাহাকে কল্পনার সুখ কিছু দিন ভোগ করিতে দেওয়া যাউক। ইহাতে ভালই হইবে, শিক্ষা পাইবে, ভবিষ্যতে আর এ পথে সে কখন যাইবে না।

সন্তোষিণী মেয়েটী কে, তাহা এত ক্ষণ আমরা পরিষ্কার করিয়া বলি নাই। ইহাঁর সবিশেষ পরিচয় এক্ষণে কিছু দেওয়া যাইতেছে। ইনি নিশানাথের স্ত্রীর ভগ্নীর কন্যা। পিতা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তিনি কেবল জন্মদাতা মাত্র। মাতা নাই। বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সেও কেবল কুললক্ষ্মীর অকৃপা হইতে বাঁচিবার জন্য, অর্থাৎ বহুবিবাহকারী এক হতভাগ্য কুলীনের সঙ্গে তাহার এক দিনের জন্য অজ্ঞাতসারে বিবাহ হয়, তাহার পর সে ব্যক্তির সঙ্গে আর দেখা শুনা নাই, আছে কি মরিয়াছে তদ্বিষয়েও কেহ কিছু জানে না। এই

সকল কারণে সন্তোষিণীকে এক প্রকার বিধবা বলিলেও বলা যায়; আবার কুমারী মনে করিয়া লইলেও যে কিছু অন্যায় হয় তাহাও নহে। যাহাই হউক,মেয়েটী রূপে গুণে অতি মনোহর। তাহার নামের সঙ্গে স্বভাবের বেশ একতা ছিল। নিশানাথ নিঃসন্তান, এই অনাথা দুঃখিনী কন্যাটীকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ মমতা করিতেন। লেখা পড়া যাহা কিছু সে শিখিয়াছিল তাহা নিশানাথেরই পরিশ্রমের ফল। বাঙ্গালা ভাষার প্রচলিত এবং পাঠযোগ্য গ্রন্থগুলি তিনি তাহাকে বেশ করিয়া পড়াইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাহাকে দিয়া গ্রন্থ বিশেষ পড়াইয়া আপনি শুনিতেন এবং চিঠি পত্র লেখাইতেন। সন্তোষিণীর বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি অধিক, মুখস্থ পড়া শুনা অপেক্ষা সহজজ্ঞান এবং চিন্তাশীলতা ভাবুকতা অতি গভীর ও প্রখর ছিল। স্বাভাবিক ধারণা শক্তি এত বেশী, যে সে সকল বিষয়ের ভিতরেই প্রবেশ করিতে পারিত। ফলতঃ বুঝিবার সম্বন্ধে তাহার একটু অসাধারণ ক্ষমতা দেখা গিয়াছে। ইংরাজি ভাষাও জানিত, সহজ সহজ গ্রন্থ পড়িতে এবং বুঝিতে পারিত।

পাঠক পাঠিকাগণ হয়তো এত ক্ষণ ইহার রূপের ছবি খানি দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া থাকিবেন। তাঁহাদের কৌতূহল আমরা কত দূর চরিতার্থ করিতে পারিব বুঝিতে পারিতেছি না। যদি এক কথায় সকলে বলিতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে সন্তোষিণীর শ্রী ঠিক স্ত্রীলোকের মত। তাহার মুখমণ্ডল ললাট গণ্ডস্থল চক্ষু কর্ণ নাসিকা দন্ত ওষ্ঠ হস্ত পদ গ্রীবা কণ্ঠ পৃষ্ঠ কটি বক্ষ এবং মস্তকের কেশরাশি প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং তৎসমুদয়ের সঞ্চালন ক্রিয়ার মধ্যে স্ত্রী প্রকৃতির কমনীয় সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব মাধুর্য্য অনুভূত হইত। প্রতিভাশালী সুকবি কাব্যলেখকগণ যেরূপ দক্ষতার সহিত নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণন করেন তত দূর বিদ্যা আমাদের নাই। বিশেষতঃ চক্ষে দেখিয়া অন্তরে যে সংস্কার লাভ করা যায় তাহা লেখনীতে ব্যক্ত হওয়াও সুকঠিন।

অনেকে হয়তো মনে করিতেছেন, সেই জন্যই বুঝি সন্তোষিণীর শ্রী স্ত্রীলোকের মত বলিয়া এক কথায় আমরা সব কাজ শেষ করিয়া দিলাম। না, বাস্তবিক তা নয়, ইহার ভিতর আরো কিছু গভীর বিজ্ঞান আছে, বাঙ্গা-

রাম পণ্ডিত তাহা জানেন। প্রকৃত কথাটী এই, যে স্ত্রীলোকের স্ত্রীত্ব অর্থাৎ ভাবুকতা সরলতা কোমলতা তীক্ষ্ণতা রসগ্রাহিতা প্রেমমাধুর্য্য ভীরুতা বালকবৎ ক্রীড়াশীলতা তাহার সঙ্গে তেজস্বীতা লজ্জা শান্তি স্নেহ মমতা গাম্ভীর্য্য সহিষ্ণুতা নাই তাহাকে যথার্থ স্ত্রী আমরা বলিতে পারি না। কেবল কি নারী মূর্ত্তি ধরিয়া স্ত্রীলোকের সাজ পোসাক পরিয়া সন্তান পালন করিলেই স্ত্রীনামে অভিহিত হওয়া যায়? কখনই না। আমরা পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক দেখি তন্মধ্যে অনেকে পুরুষভাবাপন্ন। স্ত্রী জন্ম পাইয়াও তাহারা স্ত্রীত্বের উৎকর্ষ সাধন করে না। এই জন্য এ সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের ভয়ানক প্রতিবাদ আছে। কেহ উপহাস করুন, বা অজ্ঞ বলুন, এ সংস্কার আমাদের কিছুতেই অপনীত হইবে না। যাহাকে নিংড়াইলে এক ফোঁটা রস পাওয়া যায় না, তাহাকে স্ত্রীলোক বলিতে ইচ্ছা হয় না। ব্যাকরণে দোষ পড়ে তাই বলিতে বাধ্য হই; কিন্তু মনের সঙ্গে মিলে না। আমরা যে কুলবালার সৌন্দর্য্যের কথা বলিতে যাইতেছি অনেকে সে জাতীয় স্ত্রী নহে। ইহার প্রমাণ আমরা স্বচক্ষে অনেক দেখিয়াছি, এই উপন্যাসের ভিতরেও সেরূপ দৃষ্টান্ত পরে প্রদর্শিত হইবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রূপ বর্ণনায় আর আমাদের বড় প্রবৃত্তি নাই। তবে পাছে পাঠকবৃন্দ বিরক্ত হন, তাই আমরা সংক্ষেপে কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম। একটু বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির সহিত সকলে ইহা পাঠ করিবেন।

এই অলোকসামান্যা বরাঙ্গনার চক্ষু পটোল চেরা, কি চুল কালভুজঙ্গিনীর মত; হস্ত মৃণাল সদৃশ, কি কটি কেশরীর ন্যায় ক্ষীণ; ইনি বিম্বোষ্ঠা, কি মরালগমনা, কি খঞ্জনগঞ্জননয়না, এত সূক্ষ্ম হিসাব আমরা দিয়া উঠিতে পারিব না; রূপে গুণে মিশিয়া তিনি অতি গৌরবশালিনী প্রভাবতী দিব্যাঙ্গী রমণী ছিলেন এই পর্য্যন্ত কেবল জানি। যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি, তখন তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নবযৌবনপ্রভায় প্রদীপ্ত এবং বিকসিত হইয়াছিল। পাদমূল হইতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত যেখানে যাহা ফুটিবার এবং পূরিবার তাহা ফুটিয়াছিল এবং পূরিয়াছিল। আকৃতি নাতিদীর্ঘ, কিম্বা সুদীর্ঘ বলিলেও বলা যায়। অর্থাৎ তেমন দীর্ঘ নয়, যে কাপড়ের ওসারে কুলায় না, কি পায়ের গোড়ালি খানিকটা বাহির হইয়া থাকে। সে দীর্ঘতার ভিতর

মনের মহত্ত্ব এবং ঔদার্য্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। অঙ্গ সকল যথা পরিমাণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে পরস্পরের সহিত সন্নিবিষ্ট ছিল। তাঁহার অলকাবলী-শোভিত সুন্দর ললাটের নিম্ন দেশে প্রোজ্জ্বল এবং আয়ত লোচন দ্বয় মধুর প্রেমরাগে নিরন্তর রঞ্জিত থাকিত এবং গৌরকান্তির সুন্দর লাবণ্য ছটায়, কোমল কণ্ঠের শ্রবণমনোহর বাক্যনিনাদে ও উৎসাহ-পূর্ণ কার্য্যদক্ষতায় নিশানাথের আলয় লক্ষ্মীর আলয় রূপে প্রকাশ পাইত। সন্তোষিণী স্নানান্তে বিধৌত স্নিগ্ধোজ্জ্বল গাত্রে নীল কৌশেয় বসন পরিধানপূর্ব্বক পরিমার্জ্জিত কক্ষ সূক্ষ্ম কুটিল কেশদাম পৃষ্ঠদেশে লম্বিত করিয়া যখন পূতভাবে মাসী ঠাকুরাণীর জন্য ঠাকুর ঘরে বিচিত্র বর্ণের সুগন্ধ কুসুমাবলী পুষ্পপাত্রে পৃথক পৃথক রূপে সাজাইয়া রাখিতেন এবং তাহা চন্দনচর্চ্চিত করিতেন, তখন তাঁহার সেই পবিত্র মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব দেবশ্রী পরিস্ফুটিত হইত। কুসুমরাশির শ্বেত পীত নীল লোহিত বর্ণের উপর তদীয় গৌর অঙ্গের শুভ্র আভা নিপতিত হইয়া উভয় উভয়কে যেন সৌন্দর্য্যকিরণে ভাসাইত। সচেতন ফুলের সঙ্গে অচেতন ফুল মিশিয়া একাকার হইয়া যাইত। তদবস্থায় তাঁহার অনিন্দনীয় অপরূপ শোভা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি অবনীতলে স্বর্গের ভগবতীর প্রতিচ্ছায়া দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। নারী-যৌবনের বিভূতিময় বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপর যখন ভগবদ্ভক্তির সুনির্ম্মল জ্যোৎস্নারাশি প্রতিবিম্বিত হয় তখন স্ত্রী প্রকৃতির প্রকৃত গৌরব এবং রমণীয় শোভা আমরা পৃথিবীতে দেখিতে পাই।

সন্তোষিণীকে আমরা বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বেশে দর্শন করিয়াছি। তিনি যখন নানা অভরণে সুসজ্জিত হইয়া, বিচিত্র বর্ণের পট্ট বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক সুগন্ধ তৈলচর্চ্চিত বেণীবদ্ধ মস্তকে অলক্তরঞ্জিত পদে সগৌরবে কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে যাইতেন এবং সেই বেশে সমবয়স্কা প্রতিবাসিনী কামিনীমণ্ডলে বিরাজ করিতেন তখনকার এক প্রকার শোভা, আবার যখন মুক্তকেশে চঞ্চলা চপলার ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে গৃহকার্য্যে কিম্বা নিশানাথের পান ভোজনের আয়োজনে ব্রতী থাকিতেন তখনকার আর এক প্রকার শোভা। সময়ে সময়ে নিশানাথ তাঁহাকে ইংরাজি পুস্তক হইতে ভাল ভাল গল্প পড়িয়া শুনাইতেন। তৎকালে সন্তোষিণীর শিক্ষালিপ্সায়

চিত্ত এমনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিশানাথের পানে চাহিয়া থাকিত, যেন মনে হইত, তাহার বিস্ফারিত নয়ন, প্রফুল্ল মুখপদ্ম এবং বিকসিত অপরাজিত পুষ্প সদৃশ কর্ণদ্বয় তাহা অতিমাত্র ব্যাকুলতার সহিত পান করিতেছে। তদবস্থায় কখন কখন তাহার মুখমণ্ডলে এক প্রকার উল্লাসকর মৃদু মধুর হাস্যরসের জ্যোতি উদ্ভাসিত হইত। সে হাসি অস্ফুট বটে, কিন্তু তাহার ভিতর প্রেমতত্ত্বের কত যে গভীরতা বিলাসচাতুর্য্য ফুটিয়া উঠিত তাহা আর বলিয়া উঠা যায় না; যে চক্ষু তাহা স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছে সেই কেবল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে সক্ষম। দুঃখ অভিমানের সময় শিশিরধৌত স্থলপদ্মের ন্যায় সে মুখের শোভা হইত। আবার নিরাশ ভাবনা দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া যখন তিনি বসিয়া থাকিতেন তখন অস্তগামী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার চারুচন্দ্রানন ক্রমে বিষাদ অন্ধকারে ডুবিয়া যাইত। নানা সময়ে নানা বেশে এই রমণীরত্নকে আমরা দেখিয়াছি, সে সমস্তই অতি হৃদয়ানন্দকর; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঐ যে ঠাকুর ঘরে দেবপ্রতিমার বেশে তাঁহাকে দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে কোন সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। সমীরণ সঞ্চালিত নিবিড় জলদজাল সদৃশ সেই কুটিল কুন্তলরাশি কি লোচনানন্দকর। অচিরস্নাত সেই সুস্থ সুগোল স্নিগ্ধোজ্জ্বল অঙ্গকান্তি কি প্রভাবশালিনী! সারদীয় চন্দ্রমার অমিয় মাখা কমনীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় সে রূপের জ্যোতি, দর্শনে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, স্বর্গের দেবতারাও তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু অধিক ক্ষণ সে দিকে যে সে লোক চাহিয়া থাকিতে পারে না, কারণ তাহাতে মোহ আছে, মহামায়ার মহাশক্তি আছে। সন্তোষিণীর চারু গণ্ডস্থলে, মুখমণ্ডলে, নয়ন কমলে, গ্রীবাদেশে, কর্ণদ্বয়ে ও বাহুযুগলে শ্রী প্রকৃতি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিত। প্রস্ফুটোন্মুখ অথবা অর্দ্ধবিকসিত বড় বড় মার্শেল নীল কিম্বা বসরাই গোলাপ ফুলের সঙ্গে এ রূপের তুলনা দিলে যদি কোন দোষ না হয় তবে আমরা তাহাই দিলাম। দেবমন্দিরে পূজার আয়োজন কালীন তাঁহার যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে যেন কেহ এমন সিদ্ধান্ত না করেন যে তিনি এক জন অতি অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণা তপস্বিনী নারী ছিলেন; কঠোর সাধন ভজন, ব্রতানুষ্ঠানের বাহ্য আড়ম্বর অধিক কিছু তাঁহার ছিল

না, পুষ্প চন্দন নৈবিদ্যাদি দ্বারা নিজে. কোন দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনাও তিনি বড় একটা করিতেন না, কেবল মাসী ঠাকুরাণীর ভয়ে কয়েক বৎসরের জন্য একবার শিবপূজার ব্রত লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য বাঞ্ছা-রামকে পাইবার জন্য। অন্যান্য পূজা অনুষ্ঠান যদিও তাঁহার বেশী ছিল না, কিন্তু স্বাভাবিক ভক্তিতে ভগবানকে তিনি বড় ভালবাসিতেন, এবং সেই ভালবাসার ভাবে, পুষ্পচয়ন, চন্দন ঘর্ষণ, দেবমন্দির পরিমার্জ্জন, ভোগ নৈবিদ্য ধূপ দীপ কুসুমাদি দ্বারা পূজার আয়োজন ইত্যাদি কার্য্যে নিবিষ্টমনা হইয়া এতই আনন্দ এবং দেবপ্রসাদ সম্ভোগ করিতেন যে, এক জন দুই পাঁচ ঘণ্টা পূজা ধ্যান স্তব স্তুতি ব্রত উপবাস করিয়াও তাদৃশ সুফল লাভে সক্ষম হন কি না সন্দেহ। নিষ্ঠাযুক্ত মনে, পূত চিত্তে, প্রফুল্ল হৃদয়ে যে নারী ঠাকুরঘরে নিত্যপূজার আয়োজন করে দেবতারা তাহার প্রতি বোধ হয় অতিশয় সন্তুষ্ট হন, সেই জন্য তৎকালে তাহার মুখশ্রীতে ঈদৃশ দিব্য শোভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কুমারীগণ, তোমরা যদি ভাল বর চাও, তবে ঋষিকন্যার মত আহ্লাদিত মনে ঠাকুরঘরের পরি-চর্য্যা আরম্ভ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেমতত্ত্ব।

সন্তোষিণী এত দিন যাঁহাকে হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া একাকী গোপনে গোপনে ভালবাসিতেন সেই হৃদয়রঞ্জন প্রেমভাজন এক্ষণে সশরীরে তাঁহার সমীপাগত। প্রিয়তমের বিদ্যমানতার সুমিষ্ট আঘ্রাণে তাঁহার গুপ্ত প্রণয় শতধা উৎসারিত হইয়া চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়পথে ধাবিত হইতে লাগিল। অনুরাগের আবেশে সমস্ত দেহ মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তত্ত্বজ্ঞ রসিক সাধুগণ বলেন, প্রেম পক্ষপাতী, এবং অন্ধ। বিশেষ কোন এক ব্যক্তিতে একাধারে তাহা ঘনীভূত না হইলে তাহার মাধুর্য্য এবং প্রভাব

বুঝা যায় না। যখন উহা অন্ধভাবে ব্যক্তিগত ভাবে পক্ষপাতী হইয়া পড়ে, তখন কেবল সেই ব্যক্তির সঙ্গই প্রার্থনীয় হয়, আর কাহাকেও ভাল লাগে না। অপর সহস্র ব্যক্তি রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু অন্ধপ্রেম তাহাতে মজে না। সে অন্য পাঁচ জনকেও ভালবাসে, যাহাকে যত টুকু দেয় তাহা দান করে, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞানে। বিশেষ প্রণয়াবদ্ধ ব্যক্তিকে সহজে প্রাণের টানে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসে। এই জন্য তাহার দেশ কাল পাত্র জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভূত ভবিষ্যৎ অগ্র পশ্চাৎ ভাল মন্দ ফলাফল সে ভাবে না। আগে আপনাকে বিস্মৃত হয়, তদনন্তর যাহাকে ভালবাসে তাহার গুণাগুণ অবস্থা সমস্ত ভুলিয়া যায়। সন্তোষিণী আপনি কি অবস্থার লোক, সে বিধবা কি সধবা, না কুমারী; বাঞ্ছারামের প্রতি তাহার এরূপ আসক্ত হওয়া উচিত কি না, উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক, এ সকল চিন্তা তাহার মনে কখনই উদয় হয় নাই। তাহা সে ভাবিতেও চায় না, কেবল হৃদয়ের উথলিত প্রেমাবেগ ঢালিয়া দিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে চায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার তর্ক করিয়া কেহ কাহাকে ভাল বাসিতে পারেও না। সেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রেম কেবল আমাদের বাঞ্ছারাম পণ্ডিতের পক্ষে পোষায়। প্রকৃত প্রেম অযত্নসম্ভূত হেতুবর্জ্জিত, তাহা শুভ যোগের ফল। যাহারা ইহার ভুক্তভোগী তাহারাও জানে না কেন ভাল বাসে। প্রেমের ধর্ম্ম বেদ বিধি দেশাচার এবং সাধারণ লৌকিক নীতির অতীত। এ সমুদায়কে অগ্রাহ্য করিয়া সে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যথেচ্ছা গমন করে। তাই প্রেমরসমত্ত বৈষ্ণবেরা গান করিয়াছে, "কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম, কবে যাবে ভয় ভাবনা শরম, হায় আমি কবে হব দুরাচার।" রাধাকৃষ্ণের প্রেমে তাই প্রচলিত দাম্পত্য ধর্ম্মও উপেক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে বিচার করিতে গেলে রস থাকে না, আকর্ষণ প্রলোভন কমিয়া যায়; তখন উহা চিকিৎসালয়ের শবব্যবচ্ছেদের ব্যাপার হইয়া উঠে। যেখানে উপযোগিতা, দৈবনির্ব্বন্ধতা, প্রকৃতিগত একতা থাকে সেই খানেই ইহার আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। প্রেমবন্ধনের এই মাত্র প্রমাণ, যে মনে হইবে, এইটী আমারই জন্য ঠিক করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া মাপিয়া জুকিয়া কাটিয়া ছাটিয়া

ভগবান্ প্রেরণ করিয়াছেন। এই জন্য. দেখা যায়, আপাততঃ যেখানে কোন সৌসাদৃশ্য নাই, বরং হঠাৎ জ্ঞান হয় অনেক বিষয়ে বিসদৃশ, সেখানেও প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে, যেন জলে জল মিলিয়াছে। দুইটী আত্মা বিধাতার চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে আপনা আপনি এক জায়গায় আসিয়া ভাবে রুচিতে ইচ্ছায় মিশিয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই পক্ষপাতী অন্ধপ্রেম আবার এক দিকে মানুষকে পশুবৎ করিয়া ফেলে, এবং পরিণামে ঘোর নিরাশান্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রেমে মজিয়া যদি আর আর সকলের প্রতি মানুষ উদাসীন প্রেমহীন হয়, তাহা হইলে প্রেমে ব্যভিচার দোষ ঘটে। প্রেমের পক্ষপাতিতা ও অন্ধতার তাৎপর্য্য তাহার ঘনীভূত অবস্থা দর্শন করা; এক আধারে ঘনীভূত হইয়া তাহা জগৎময় বিস্তার হইয়া পড়া। যাহাতে বিশুদ্ধ চৈতন্যের, নির্ম্মল বিবেকের যোগ নাই, অপরিবর্ত্তনীয় সার্ব্বভৌমিক নীতির অনুমোদন নাই, তাহা প্রেম নহে, অবিদ্যার খেলা। যে প্রেম স্বভাবের সরসভূমিতে সঞ্জাত হইয়া দিব্যজ্ঞানের অনুসরণ করে, তাহা অনন্তের নিত্যপ্রেমের অঙ্গীভূত ; তাহাতে ভয় নাই, বিকার নাই। তদবলম্বনে নিরাপদে প্রেমধামে উপনীত হওয়া যায়। প্রকৃত প্রেম হেতুবিহীন হইলেও তাহা স্বর্গীয়, সুতরাং পবিত্র।

প্রেম এক দিকে অন্ধ পক্ষপাতী, অপর দিকে সে আবার চক্ষুষ্মান্। আর কাহাকেও চিনিতে পারুক না পারুক, যাহাকে সে ভালবাসে তাহার প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে সে যেন অনুপ্রবিষ্ট হয়। অন্ধভাবে আপনার বাঞ্ছিত বস্তুকে দেখিয়া সে প্রথমে বিমুগ্ধ হয়, তদনন্তর তন্ন তন্ন করিয়া তাহাকে বুঝিয়া লয়, তদ্বিষয়ে প্রবঞ্চিত হয় না। কিন্তু সচরাচর এই দোষটী ঘটে, যে এক গুণ ভালবাসাকে মোহ বশতঃ সে দশগুণ মনে করে। তবে এ কথা সত্য, যে যাহাকে ভাল বাসিয়াছে সে তাহার স্বভাবের গূঢ় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। সেখান হইতে কেহ তাহাকে বিদায় করিতে পারে না। নরনারীর অকৃত্রিম প্রেমের ভিতর প্রেমিকচূড়ামণি ভগবানের অনেক কৌশল চাতুরী আছে। ধন্য তিনি! বলিহারী তাঁহাকে! যিনি প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া দুইকে এক করেন।

সন্তোষিণীর এ প্রেম কোন্ জাতীয়, তাহা পরে জানা যাইবে; সদোষ কি নির্দ্দোষ, সবল কি কপট, স্বার্থমূলক কি নিঃস্বার্থ, দৈহিক কি আধ্যাত্মিক, কি দুয়ে মিশ্রিত, তাহাও নির্দ্ধারিত হইবে। আমরা লোকের অভিপ্রায়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি না। কেবল এই জানি, মানুষ অবস্থার দাস এবং অবস্থার প্রভু; দাস হইয়া জন্মে, প্রভু হইয়া স্বর্গে যায়। অসার অনিত্য জড় জগতে জন্মিয়া শেষে তাহা হইতে সে সার নিত্য এবং গরল হইতে অমৃত উদ্ধার করে। ইহারই নাম মানবস্বভাবের বিকাশ এবং উন্নতি। অথবা পশু হইতে মানব, মানব হইতে দেবতার উৎপাত্তিক্রিয়া।

লজ্জাবতী কুলবালা লোকভয়ে অন্তরের দুর্দ্দমনীয় ভালবাসাকে এত দিন ক্রমাগত চাপিয়া চাপিয়া তাহাকে ক্ষীরবৎ ঘন করিয়া তুলিয়াছে। কোন রূপে তাহা বাহির হইবার পথ পায় নাই। প্রাণ ফাটিয়া, চক্ষুর্দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অশ্রুরূপে সময়ে সময়ে তাহা বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহাতে গাঢতা যে কিছু কমিয়াছিল তাহা বোধ হয় না। বরং আরো ঘনতর হইয়াছিল। বাহির হওয়াই যাহার নিয়তি, অন্তরের উদ্দাম ভিতর হইতে এক দিকে যাহাকে ঠেলিয়া দিতেছে এবং বাহিরের আকষণ অপর দিক দিয়া যাহাকে বহির্ম্মুখে টানিয়া আনিতেছে, তাহার উপর অধিক দিন চাপাচাপি করিলে থাকিবে কেন? তাহার গতি রোধ করিবেই বা কে? সচরাচর ইহাতে মানুষ পাগল হইয়া যায়। সন্তোষিণীর প্রেম প্রায় শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, এক্ষণে তাহার কোন একটা বিহিত হওয়া উচিত। স্বভাবের সমস্ত গতিশক্তি এবং ক্রিয়ার সমতা রক্ষা না হইলে জগৎ সংসার চলে না। কি অন্তর জগতে, কি বহির্জ্জগতে, এইরূপ সংগ্রাম এবং সামঞ্জস্য ক্ষতি ও পূরণ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। সন্তোষিণীর হৃদয়াবেগ বাঁধ ভাঙ্গিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবে তাহার সুযোগ এক্ষণে সমুপস্থিত। পর্ব্বতনিঃসন্দিনী তটিনী সকল পায়ে পায়ে বাধা ঠেলিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন আপনার গম্য স্থানের দিকে নামিয়া আইসে; কখন মৃত্তিকার অভ্যন্তর দিয়া, কখন বা শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যায়, নর নারীর হৃদ্গত গূঢ় ভালবাসার স্রোত তেমনি বিপুল বিঘ্নরাশির মধ্যে আপনি আপনার পথ করিয়া লয়। সন্তোষিণীর প্রেমগঙ্গা বাঞ্ছারামের প্রীতিযমুনার সঙ্গে কোন্

পথে কি প্রণালীতে আসিয়া মিশিয়াছিল তাহার অনুধাবনে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইলাম। লীলাবিহারী প্রেমময় বিধাতার ইহার ভিতর কত রঙ্গের খেলা, শিক্ষা ও শাসন নিবদ্ধ আছে তাহা দেখা যাউক। কি অপূর্ব্ব পুরাণ শাস্ত্র রচনার জন্য তিনি এই কন্যার হৃদয়ে প্রেমস্রোতঃ উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার তত্ত্ব মনোযোগপূর্ব্বক আমরা পাঠ করি। জাতীয় ইতিহাসে এবং প্রত্যেক নর নারীর জীবনকাহিনীর গরলময় লৌকিক ঘটনারাজীর ভিতর হইতে কালে কালে আশ্চর্য্য রূপে তিনি অমৃত উৎপাদন করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি; এক্ষণে বাঞ্ছারাম সন্তোষিণীর চরিত্রে তাঁহার কি মঙ্গলসঙ্কল্প সংসিদ্ধ হয় তাহা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হই। পৃথিবীর অনন্ত কার্য্যকারণবিমিশ্র বিচিত্র ঘটনাবলীর দুরবগাহ্য গভীর অন্ধকার গুহামধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ভগবান্ প্রজাপতি নিত্য নিত্য নব নব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি পুরাতন নির্জ্জীব অবস্থার ভিতর হইতে নূতন সৃষ্টি বিকাশ করেন, এবং পূতি গন্ধময় গলিত পদার্থ-রাশিকে মন্থন করিয়া তদ্দ্বারা প্রকৃতির চিরনবীনত্ব এবং উৎপাদনী শক্তিকে পরিপোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার মঙ্গল নিয়মে সরস সুন্দর ফল ফুলে শোভিত তরুলতাগণ পার্থিব জঞ্জাল দুর্গন্ধময় গলিত ঘৃণ্য পদার্থ দ্বারা পুষ্টিতা প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টিকে তিনি পুরাতন হইতে দেন না; পুরাতনকেই প্রতিনিয়ত নবভাবে পরিণত করিতেছেন। প্রেম এই নবীনত্বের চির-প্রসূতী। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, তাঁহারই প্রেমপ্রভাবে মনুষ্য নবজীবন লাভ করিয়া বহুবিধ ঘটনার উপলক্ষে অনন্ত কাল তাঁহাতে নব নব সৌন্দর্য্যসুধা সম্ভোগ করিতে থাকে। মানবজীবনের উপন্যাসের ভিতর তিনি কেমন লীলা বিহার করেন, তাই দেখাইবার জন্যই এই "গরলে অমৃত" রচিত হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেমোৎপাদন।

বাঞ্ছারাম বহু দুঃখ কষ্ট সহিয়া মাতুল গৃহে আসিয়াছেন, এ কথা শ্রবণে সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। এক বাড়ীতে ভাই ভগিনীর ন্যায় তিনি এবং সন্তোষিণী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নিশানাথ এবং তদীয় পত্নী এই দুইটীকে সন্তাননির্ব্বিশেষে সস্নেহে প্রতিপালন করিতেন। তাহাদের অবস্থানে বাড়ীর শ্রী ফিরিল। নিশানাথ এক জন সংস্কৃতমনা উন্নতিশীল শিক্ষিত হিন্দু, পড়া শুনার বেশ চর্চ্চা রাখেন, বাড়ীতে পুস্তকাধারে অনেকগুলি সদগ্রন্থ আছে, এই জন্যই এখানে বাঞ্ছারামের থাকিবার এক প্রধান আকর্ষণ। নিশানাথ যদি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন, তাঁহার পালিতা কন্যাটী বিধবা, তাহা হইলে চাই কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে তাহার বিবাহও দিতে পারেন। কিন্তু সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয় সংবাদ এখনো পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

সন্তোষিণী গৃহকার্য্যে অনেক সহায়তা করে, লেখা পড়া শিক্ষা জ্ঞানানুশীলন বিষয়েও তাহার যেমন অনুরাগ, আবার রন্ধন পরিবেশন, গৃহমার্জ্জন, জলখাবার প্রস্তুত করা, দ্রব্যাদি গোছান এ সকলেতেও যথেষ্ট আস্থা এবং দক্ষতা। সেবা উপলক্ষে সে বাঞ্ছারামের নিকট বার বার আসিত, এবং তাঁহার প্রতি আপনার গুপ্ত প্রণয় গোপনে মনে মনে চরিতার্থ করিত। সন্তোষিণী বাঞ্ছারামকে দাদা বলিয়া ডাকে, জলখাবার দেয়, তাঁহার অধীত গ্রন্থগুলি টেবিলে সাজাইয়া রাখে, অন্যান্য ফাই ফরমাস খাটে, কখন বা পড়া বলিয়া লয় এবং জ্ঞানগর্ভ কথা শ্রবণ করে। এবম্বিধ নানা কার্য্যোপলক্ষে নানা সময়ে সে হৃদয়ের বাঞ্ছনীয় বাঞ্ছারামকে দিবসের মধ্যে অনেক বার দেখিতে পাইত। যতই কাছে আসিত, কথা কহিত, এবং দেখিত, ততই আপনাকে সে কৃতার্থ মনে করিত। বিশেষ প্রণয়যোগে অপরের অজ্ঞাতসারে সন্তোষিণী বাঞ্ছারামের সেবা করিতেন, তিনি ব্যতীত তাহা

অন্যে জানিতে পারিত না। এইরূপে সেই প্রেমানুরক্তা কামিনী আকার ইঙ্গিতে, ভাব ভঙ্গিতে আন্তরিক অনুরাগ প্রিয়জনের সমীপে ব্যক্ত করিতে লাগিল,—মোহান্ধ হইয়া আপনাকে এক প্রকার ভুলিয়া গিয়া ব্যক্ত করিতে লাগিল। তাহার প্রেম এমন এক আধারে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে সেখানে সহজে চরিতার্থ হইবার নয়। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন সে অন্ধের ন্যায় পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ, বাঞ্ছারাম সে তত্ত্বে এখনও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু এখানে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত একটা বিশেষ উপযোগিতা ছিল, নতুবা এমন ঘটিত না।

বাঞ্ছারাম মনের যে অবস্থা লইয়া পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই অবস্থাতেই আছেন। তিনি স্বয়ংই এক অভিনব রাজ্য, অপরের মনোগত ভাব বুঝিবার তাঁহার অবসর বা প্রবৃত্তি নাই। যে বিস্তীর্ণ চিন্তারাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে গিয়া তিনি পড়িয়াছেন তথা হইতে কত দিনে যে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন কেহই বলিতে পারে না। তবে স্বভাবের কার্য্য একেবারে তিনি বন্ধ করিতে পারেন নাই। দুঃখ বিষাদে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিতর্কে হৃদয় কঠোর হইয়া গেলেও উপকারী বা অনুগত জনের প্রতি ভালবাসা কতকটা ছিল। অনাথা বলিয়াই হউক, কিম্বা বুদ্ধিমতী শান্তস্বভাবা প্রিয়দর্শনা বলিয়াই হউক, সন্তোষিণী তাঁহার স্নেহভাগিনী হইয়াছিলেন। কথাবার্ত্তায় চাল চলনে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু সে স্নেহ ভালবাসা সন্তোষিণীর প্রেমপিপাসার যথার্থ উত্তর স্বরূপ নহে, তাহাকে সাধারণ ভদ্রতা বা দয়াশীলতার পরিচয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু একটু বিচক্ষণতার সহিত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, উভয়ের প্রকৃতির মূলে অলক্ষিত ভাবে আরও কিছু নিগূঢ় প্রেমাকর্ষণ এবং মিলনোপযোগীতা ছিল, তাহা তখন কেহই জানিতে পারে নাই। সন্তোষিণী সাহস করিয়া স্পষ্টরূপে কোন কথা বলিতে পারে না, পারিলেও কৃতকার্য্য হইত কি না সন্দেহ; কেন না বাঞ্ছারাম তখন যে রাজ্যে বিচরণ করিতেন তথায় প্রেমতত্ত্বের কোন সংবাদ বা রসাস্বাদ পৌঁছে নাই। সন্তোষিণী যে কিঞ্চিৎ প্রীতি স্নেহের চিহ্ন দেখিতে পায় তাহাকে আপনার ভাবের প্রতিরূপ ভাবিয়া মনে মনে আশ্বস্ত হয়। ফলতঃ বাঞ্ছারাম তাহাকে চায় না ইহা সে কখনো বিশ্বাস

করে নাই, বরং ইহাই তাহার সুদৃঢ় সংস্কার যে আপনি যেমন ব্যাকুল পিপাসু, সেও তেমনি; বেশী না হউক, সমান সমানত বটেই। অনেক দিনের ভ্রান্ত সংস্কার এইরূপে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, সে ভ্রম দূর হইবার কোন উপায় ছিল না। যদি কখন নিরাশ অবিশ্বাস আসিয়া চিত্তকে আন্দোলিত করিত, তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ঘটনামূলক অভ্রান্ত প্রমাণ সন্তোষিণীর হস্তগত ছিল। কার সাধ্য সে সমস্ত প্রমাণ কেহ খণ্ডন করে? বাঞ্ছারামের প্রতি তাহার ভালবাসা হৃদ্গত সংশয়রহিত জ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা জ্ঞানে মানুষকে কত দূর অন্ধ করিয়া রাখে তাহা আমরা এ স্থলে দেখিতে পাইলাম।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং তাহার কল্পিত অভ্রান্ত প্রমাণ দর্শন করিয়া সন্তোষিণীর সাহস ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। কোন দিন মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিবে ফেলিবে এইরূপ মনে করে। সময়ে সময়ে অন্য মনস্কের মত বাঞ্ছারামের প্রতি চাহিয়া থাকিত, চোখো চোখি হইলে নয়ন ফিরাইয়া লইত। বাঞ্ছারাম যদি কোন কার্য্যের জন্য তাহাকে ডাকিতেন, কিম্বা মমতা প্রকাশ করিয়া কোন কথা বলিতেন, তাহা সে বিশেষ ভালবাসার প্রমাণ স্বরূপ মনে করিয়া লইত। এরূপ প্রেমকল্পনা এক প্রকার রোগ বিশেষ, স্ত্রী পুরুষ কেহই ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। কত যুবা এ জন্য পাগল হইয়া গিয়াছে। পথের ভিখারী হইয়াও সে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চায়।

এইরূপে একাধারে নির্ব্বিঘ্নে সেই প্রেমানুরাগ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনের একটী বৃত্তি প্রবল হইলে বুদ্ধি কল্পনা ইচ্ছা উৎসাহ আশা সমস্তই তাহার অধীন হইয়া পড়ে। এক আলোকে সমস্ত জীবন আলোকিত হয়। তদবস্থায় সে আপনি যেমন অন্যকেও ঠিক তেমনিটী মনে করে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে এত অনুরাগ, অন্ধানুরক্তি সত্ত্বেও সন্তোষিণীর হৃদয় যেন খালি খালি বোধ হইত। বিশ্বাসের ভিতর অবিশ্বাস, আশার ভিতর সংশয়, উৎসাহের ভিতর নিরাশা লুক্কায়িত থাকিয়া যেন তাহাকে এক একবার কাতর করিয়া ফেলিত। স্বভাব আপনিই প্রমাণ করিয়া দিতে লাগিল, যে তাহার হৃদয়তন্ত্রীর সুর বাঞ্ছারামের হৃদয়তন্ত্রীকে

এখনো স্পর্শ করে নাই, উভয়ের মধ্যে এখনো সমহৃদয়তা জন্মে নাই। তথাপি কি মোহ, দুরাশা মিথ্যা কল্পনা আসিয়া আবার সে সমস্ত অভাবকে ভুলাইয়া দিত। এ দিকে এই অবস্থা, অপর দিকে বাঞ্ছারাম একাকী এক নির্জ্জন গৃহে বসিয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, বিচার চিন্তা করেন, মধ্যে মধ্যে সেই পুষ্পোদ্যানে গিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার জন্য একটী স্ত্রীলোক আকুল হইয়াছে, দুঃখে মরিতেছে, হৃদয়মধ্যে ঘনীভূত প্রেম সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে ইহার সংবাদ তিনি কিছুই জানেন না। সর্ব্বদা যেন উন্মনা, চিত্ত যেন বিজ্ঞানসমুদ্রে নিমগ্ন, আত্মবিস্মৃত হইয়া তত্ত্বচিন্তাস্রোতে নিরন্তর তিনি ভাসিতেন।

বাঞ্ছারামের আন্তরিক প্রকৃতিতে যেমন, বাহ্য আকারেও তেমনি কিছু বিশেষত্ব ছিল। এক্ষণে তিনি যৌবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শরীর সুস্থ সবল নিষ্কলঙ্ক, মূর্ত্তিটী ঋষি তপস্বীর ন্যায় প্রশান্ত সৌম্য। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শান্তির স্নিগ্ধপ্রভা বিরাজিত। এমন এক প্রকার অকৃত্রিম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য তাঁহার ছিল যাহা সচরাচর অন্যত্র দর্শন সুলভ নহে। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে তিনি নিজে জানিতেন না কেমন তিনি সুন্দর পুরুষ; যেহেতু, শরীরের খবর লইবার তাঁহার প্রবৃত্তি এবং অবসর ছিল না। এইজন্য তাহার আকর্ষণ অধিক। বিলাসী নব্য যুবক বহু যত্নে আপনার দৈহিক শোভার উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাতে এই ফল হয়, যে যাহা কিছু তাহার স্বাভাবিক শোভা সৌন্দর্য্য থাকে তাহাও বিকৃত হইয়া যায়; বস্তুতঃ আপনি আপনাকে যেরূপ সুন্দর শ্রীমন্ত সে মনে করে তাহা নয়, বরং তাহার বিপরীত। "আহা আমি কেমন দেখিতে সুন্দর! এমন মুখের শোভা আর কি কাহারো আছে? পোষাক পরিলে আমাকে বেশ দেখায়!" এইরূপ ভাবিয়া যে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ আপনার পানে চায়, নানা প্রকারে চুল ফিরায়, কেবলই আয়নায় মুখ দেখে, তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে আকর্ষণ হওয়া দূরে থাকুক, মনে রাগ হয়, লজ্জা হয়। দেখাইবার প্রবল পিপাসাই তাহার সৌন্দর্য্য বিনাশের কারণ। সে উপহাসের পাত্র হইয়া পড়ে, যে হেতু তাহার অভিপ্রায় মন্দ, অহঙ্কার দুর্ব্বাসনা তাহার ললাটে মুখমণ্ডলে কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত করে। রক্ত দূষিত হইলে সহস্র

কৃত্রিম বেশ ভূষায় যেমন শরীরের লাবণ্য রক্ষা করা যায় না, তেমনি মনে যদি নীচ কামনা অসাধু কল্পনা বলবতী থাকে, তাহা হইলে রাশি রাশি সুগন্ধি তৈল দ্বারা কেশ বিন্যাসই কর, আর নানা রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া দর্পণে মুখই দেখ, আর বিচিত্র বসন ভূষণেই অঙ্গকে সাজাও, কিছুতেই আপনাকে প্রিয়দর্শন করিয়া তুলিতে পারিবে না। বাঞ্ছারামের ভিতরে নির্ব্বাণের সাম্য এবং নৈতিক নির্ম্মলতা ছিল; তদ্ভিন্ন তিনি আপনি সুন্দর কি না তাহা জানিতেন না; আহার পরিচ্ছদ আড়ম্বরবিহীন; মিতাচারিতা আত্মসংযম প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ পবিত্র প্রতিভা তাঁহার এই পবিত্র সৌন্দর্য্যের নিদান। তরলমতি চঞ্চলেন্দ্রিয় যুবকগণ তাহা কোথায় পাইবে? সন্তোষিণীর চক্ষে বাঞ্ছারামের এই অভিনব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। তিনি ইহার বিনিময়ে মহার্ঘ্য রত্নাভরণভূষিত রাজপুত্রকেও প্রার্থনা করিতেন না। কিন্তু আর এক দিকে দেখিতে গেলে সেই প্রেমোন্মাদিনী সুন্দরীর পক্ষে তাহা দারু পুত্তলিকাস্বরূপ; কেন না, তাহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রেমরস সঞ্চারিত হয় নাই। সন্তোষিণী যাহাকে দূর হইতে ভাবিয়া সুখী হইতেন, কল্পনার বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া হৃদয়সিংহাসনে যাহার পূজা করিতেন, তাহাকে চক্ষের নিকট পাইয়াও তাঁহার পিপাসা মিটিল না; অপিচ তাহা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কিরূপে এই বিজ্ঞানরসপিপাসু চিন্তানিমগ্ন ভদ্রযুবার হৃদয়কমল প্রেমরসাভিষিক্ত হয় তাহাই এখন তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল। তিনি কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। প্রস্তরভূমিতে কূপ খননের ন্যায় দুরূহ কার্য্যে তিনি ব্রতী হইলেন। অতি উৎকৃষ্ট নির্ম্মল শীতল প্রেমবারি তাহার মধ্যে আছে, কিন্তু অনেক গভীর নিম্নে; শুভ যোগে তাহা উৎসারিত হইবে, এবং এক বার উৎসারিত হইলে আর তাহার বেগ সহজে থামিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বশীকরণ মন্ত্রণা।

নিশানাথের ভবনটী গ্রামের মধ্যে অনেকের বসিবার দাঁড়াইবার খেলা ও গল্প করিবার স্থান। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি জাতির হুঁকা সরকারী বৈঠকখানায় থরে থরে সাজান আছে। বৈকালে তাস পাশা সতরঞ্চ খেলার সময় যখন বহু লোক একত্রিত হইয়া স্ব স্ব জাতির হুঁকা ধরিয়া ধূম পান করিতেন, তখন গৃহটী লোকোমটিভ্ এঞ্জিনগৃহের মত শোভা ধারণ করিত। ধূমরাশিতে আকাশ আচ্ছন্ন হইত। বাড়ীটী সাধারণ সম্পত্তি, নিশানাথের আর দুইটী ভ্রাতা তথায় থাকেন, তাঁহাদেরই উৎসাহে এবং উদ্যোগে তথায় প্রতি দিন দুই এক সের তামাকু পোড়ে। দিনে রাত্রে খেলার ধূম এবং তামাকের ধূমে মজলিস সরগরম। গ্রামের যত নাখেরাজভোগী পেন্‌সেনভোগী, অলস কুটম্ব এবং পরের গলগ্রহ উদরম্ভরীদিগের সেই আড্ডা। কখন দলাদলির ঘোঁট, কখন ফলারের গল্প, কখন পরনিন্দা, কখনো ধর্ম্মমতের তর্ক বিতর্ক, শালিষি মধ্যস্থ বিবাদ মীমাংসা সব রকম কথারই আলোচনা তথায় হয়। নিশানাথ তাহাদের সঙ্গে কদাচিৎ যোগ দান করেন। তিনি কি না একটু বিদ্যারসের আস্বাদন পাইয়াছেন, সুতরাং অবিদ্যার অনুচরগণের সহবাস তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? যাহাতে দেশের কোন যথার্থ হিত হয়, লোকদিগের জ্ঞান নীতির প্রতি আস্থা বাড়ে, সামাজিক দূষিত রীতি পদ্ধতি উঠিয়া যায়, এই চেষ্টায় তিনি ফিরিতেন। এরূপ রসহীন বৃথা আমোদ, বিশেষতঃ দায়িত্ববোধবিহীন অসার ব্যক্তিদিগের সঙ্গ তাঁহার ভালই লাগিত না। যে সকল ব্যক্তি বৃথা গল্পে সময় ক্ষেপণ করে, অসার চিন্তাহীন কথা কয়, লেখা পড়া শিখিয়াও যাহারা অশিক্ষিত বর্ব্বরের ন্যায় কাল কাটায়; যাহাদের আমোদে বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না, রসিকতায় কেবল পুরাতন অসভ্য রুচি প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে বসিলে বা কথা কহিলে জ্ঞান কি ভাব

কোন বৃত্তিরই স্ফূর্ত্তি জন্মে না, তাহাদের সহবাস নিশানাথের নিতান্ত অপ্রিয় ছিল। *

বহির্ব্বাটীতে যেমন পুরুষদের, অন্তঃপুরে তেমনি প্রতিবাসিনী মহিলাদের গতিবিধির স্থান। তাহাদের ভিতর অশিক্ষিতা হিন্দুর মেয়েও আসিত, মধ্যে মধ্যে খৃষ্টীয়ান এবং ব্রাহ্মদের মেয়েও আসিয়া জুটিত, এ কাল এবং সে কাল উভয় কালের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া নানা বিষয়ে চর্চ্চা করিতেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের সময় মনে হইত যেন অন্তঃপুরে হাট বাজার বসিয়া গিয়াছে। সকলে মিলে এক সঙ্গে কথা কহা মেয়েদের রোগ। আপনার কথাই পাঁচ কাহন। এক দিন সন্তোষিণী গৃহে বসিয়া স্বীয় মনোরথ সিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতেছেন এবং বিষাদিত মনে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অস্থির ভাবে কখনো বসিতেছেন, কখনো উঠিতেছেন, এক এক বার এ দিক্ ও দিক্ পদসঞ্চালন করিতেছেন, এমন সময় রসমঞ্জরী এবং চপলা সুন্দরী বেড়াইতে আসিল। চপলার কোলে দুই আড়াই বৎসর বয়সের একটি দিব্য হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর ছেলে। ঠিক যেন যশোদার কোলে নীলমণি। রসমঞ্জরী জন্মবাঁজা, এবং বিধবা। তাহার মূর্ত্তি এমন এক নূতন রকমের যে বয়স কত তাহা ঠিক করা যায় না। কখনো বোধ হয় পঞ্চাশোর্দ্ধ, কখন বা চল্লিশেরও কম। ইহারা দুই জনে সন্তোষিণীর নিকট আসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

সন্তোষিণীর একই চিন্তা, একই ভাবনা দিন রাত্রি মনের ভিতর জাগিতেছে। তিনি ঘুমাইলেও চিন্তা কিছুতেই ঘুমাইতে চাহে না, সে সারা নিশি জাগিয়া তাঁহাকে স্বপ্ন দেখায়, প্রাতে শয্যা হইতে উঠিতে না উঠিতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। কখন বা রাত্রি দুই প্রহরের সময় মাথা গরম করিয়া দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া উন্মাদিনী দানবীর বেশে মানসচক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়। এই চিন্তাস্বজনী নানা মূর্ত্তি ধারণ করিতে জানেন। ডাকিনী যোগিনী পিশাচিনী সাজিয়া বিরহিণী কামিনীদিগকে লইয়া নানা রঙ্গরসে ক্রীড়া করেন।

রসমঞ্জরীকে দেখিয়া সন্তোষিণী ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন, "মাসি, তুমিত অনেক প্রকার তন্ত্র মন্ত্র জান, আমার দাদার মনকে তুমি ভাল করিয়া

দিতে পার? আহা! ঘর সংসারে আর তাঁহার মন নাই, আমোদ প্রমোদ ভালবাসেন না, দেখিলে বড় দুঃখ হয়, পড়িয়া পড়িয়া মাথাটা খারাপ হইয়া গিয়াছে, কেবলই বই আর বই, আর কিছু না।" রসমুঞ্জরী সে কথা শুনিয়া গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি যে এক জন গুণশালিনী উচ্চ দরের স্ত্রীলোক তাহার প্রমাণ পাইয়া মনে মনে স্ফীত হইতে লাগিলেন।

রসমুঞ্জরী গ্রামের মধ্যে এক জন বিশেষ পরিচিতা। তন্ত্র মন্ত্র শ্লোক কবিতা সে অনেক জানে। প্রতি বর্ষে বর্ষে ঘোষপাড়ায় যায়, প্রতি শুক্র বারে পঙ্গতে মিশিয়া গীত গায়, রাত্রি জাগিয়া কৃষ্ণলীলার কথা কয়। তাহার গায়ের রংটী বেশ তেল চুক চুকে, গলায় এক গাছি সোণার দানা, হাতে রূপার তাগা, বাঁ পায়ের বুড় আঙ্গুলে একটা তামার আংটী, পরিধান এক খানি দিব্য ধোপ ধাপ সূক্ষ্ম শাদা ধূতি, নাকের উপর প্রতিপদের চাঁদের মত সরু রেখার তিলক শোভমান। মুখ খানি চতুষ্কোন, মাথার চুলগুলি কাল কুচ কুচে, এক পায়ে একটা গোদ, বক্ষটী অতি বিস্তৃত, তাহাতে উল্কির দাগ, চক্ষু দুইটী পটোলের ভাই আলুচেরার মত গোল গোল। পুরুষ মানুষের মত ডাবা হুঁকায় গড গড় শব্দে সে তামাকু খায়, কিছু কিছু অহিফেন সেবনও অভ্যাস ছিল। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ সমাজেই তাহার অধিক গতি বিধি। গৃহপালিত জামাতা, অলস বেকার কুটুম্ব, চাকরীর উমেদার, গুরু মহাশয়, গ্রামের নাপিত ও স্বর্ণকারদের সঙ্গে তাহার বেশী আলাপ পরিচয়। কবে যে সে আবাগী বিধবা হইয়াছে, তাহা কাহারো মনে পড়ে না, এই ভাবেই চিরকাল সকলে তাহাকে দেখিয়া আসিতেছে। আগে ঝি চাকরাণীর কাজ করিত, আর গরু পুষিয়া দুধ ঘি বেচিত, এক্ষণে মধ্যে মধ্যে ঠিকে ঠাকার কাজ করিয়া বেড়ায়, কখন বা দিশি কাপড়ের ফেরি করে। কুটুম্ববাড়ী তত্ত্ব করা, নববিবাহিতা কন্যার সহিত শ্বশুরগৃহে যাওয়া, গৃহস্থের বউ ঝির কাছে গল্প করা গান গাওয়া, ঘটকালীর সম্বন্ধ জুটিয়ে দেওয়া, এই সমস্ত কার্য্যে সে বিশেষ পটু। টোট্‌কা টাট্‌কি ঔষধও কিছু কিছু জানিত। বেশ চৌকশ লোকটী। যিনি যত বড় লোক কেন হউন না, রসমুঞ্জরীর কথার ফাঁদে পড়িলে তাঁহাকে আর শীঘ্র বাড়ী ফিরে যাইতে হইবে না। কথায় কথায়

সে ছড়া বলে। মুখের বাক্যগুলি যেন কুঁদিকাটা, সাহস ভরসাও যথেষ্ট। অধিক বয়স্কা বিধবা হইলেও তাহার ঐ শাদা ধুতি, তিলক এবং সোণার দানার ভিতর বিলক্ষণ বাহার ছিল। বৈধব্য রূপকে নয়নরঞ্জন করিতে সে যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি করিত না। দুঃখের বিষয় এই যে, সে রূপের যে প্রশংসা করিবে সে সম্প্রতি ছাড়িয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি, স্ত্রীলোক মাত্রেই স্ত্রীলোকের মত নহে, কেহ কেহ পুরুষের মত হয়। এই নারী সেই শ্রেণীর লোক। অবশ্য তাহার লম্বা লম্বা দাড়ি ছিল না, কিন্তু গোঁফ ছিল। যদিও অধিক বড় নয়, কিছু গোঁফের রেখা স্পষ্ট অনুভূত হইত। মেয়ে মানুষের গোঁফ হয়, এটা কবির কাব্য বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, আমরা গম্ভীর ভাবে এ কথা বলিতেছি, রসমুঞ্জরীর গোঁফ ছিল। তাহার গলার আওযাজ দূর হইতে পুরুষের আওয়াজ বলিয়া বাস্তবিকই মনে হইত। সে রাগিলে মেয়ে মানুষের মত গালি দিত না, শালা ভেড়ো পাজি ছুঁচো ইত্যাদি ভাষায় পুরুষকে গালাগালি দিত। স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা ভয় মৃদুতাব নাম গন্ধও তাহাতে ছিল না। সে মেয়েলী ভাব ভঙ্গী দেখাইবাব চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু তাহা হইত না; কেমন এক রকম বিশ্রী দেখাইত। গোঁফকামান পুরুষেরা যাত্রাদলে সখী সাজিলে যেমন দেখায়, তাহাদের স্ত্রীত্ব যেমন অস্বাভাবিক, ইহারও তদ্রূপ।

রসমুঞ্জরী সগৌরবে সন্তোষিণীকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিল, "আমি এক দিনেই তোমার দাদার মন ভাল কবিয়া দিতে পারি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলামাহাত্ম্য শুনিলে শুষ্কতরুও মুঞ্জরিত হয়। আমি সেই কথায় তাঁহার মন ভাল কবিয়া দিব।"

চপলার কানে এ কথাটা বড়ই কর্কশ বলিয়া বোধ হইল। সে এক জন ব্রহ্মজ্ঞানীর স্ত্রী, অল্প বয়সে বিধবা হয়, শেষ বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ করে। স্বামীর নাম সঙ্কটাচরণ গাঙ্গুলী। তিনি বিধবা বিবাহ করিয়া জাতি কুল হারাইয়া এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞানীর দলে মিশিয়াছেন। চপলা স্বামীর মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাতন বাঁধি গদ দুই পাঁচটা যাহা শিখিয়াছিল তাহা লইয়া রসমুঞ্জরীর সঙ্গে তর্ক বাঁধাইল, এবং সদর্পে বলিতে লাগিল, "ও কর্ত্তাভজা

মাগী, ও আবার তোমার দাদার মনকে ভাল করিয়া দিবে? হা অদৃষ্ট! রাধা কৃষ্ণের লীলার কথা শুনিয়ে? তবেই প্রতুল আর কি! ছি ছি ছি রাধা-কৃষ্ণের কথা শুনিলে লোকের মন যে বিগড়ে যায়!. বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদিগের কি দুর্দ্দশা তাহা কি জান না? ইহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য ভগবানকে পতিরূপে সম্বোধন করে। তোমার দাদাকে আমি ব্রাহ্মসমাজে লইয়া গিয়া ভাল করিয়া দিব। না হয় আমার স্বামীকে বলিব তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়া তর্ক যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া তাঁহাকে গৃহধর্ম্মে অনুরাগী করিবেন। আমাদের ধর্ম্মত উদাসীনের ধর্ম্ম নয়, গৃহে থাকিয়া আমরা পরব্রহ্মের পূজা করি। সংসারই আমাদের পবিত্র তীর্থ স্থান।”

এই সকল শ্লেষ বাক্য শুনিয়া রসমুঞ্জরী কুপিতা কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় বিষাক্ত বাক্যবাণে চপলাকে একবারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল। সে হইল কর্ত্তাভজা, কত কত দিগ্‌গজ পুরুষকে সে ঘোল খাওয়াইয়াছে, চপলা কি তাহার মুখের সামনে দাঁড়াইতে পারে? যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া তিরস্কার করিল। কত শাস্ত্রের কথা, কত ছড়া তাহার মুখ দিয়া অনর্গল বাহির হইতে লাগিল। নানা রঙ্গরসে স্বর ও বাক্‌ভঙ্গীর সহিত মুখ বাঁকাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, হাত পা নাড়িয়া, নাচিয়া, গান গাইয়া চপলাকে একবারে থ করিয়া দিল।

এতটা রাগ হইবার তার কথা নয়, রাগের বিশেষ কোন একটা নিগূঢ় কারণ ছিল। সঙ্কট বাবুর সহিত চপলার বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রসমুঞ্জরী তাঁহার বাটীতে চাকরাণীর কাজ করিত, এবং সে সময় ইহাকে তিনি একটু বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। এক্ষণে সে সম্বন্ধটা লোপ পাইয়া গিয়াছে, সুতরাং তজ্জন্য সে পূর্ব্বের ঝাল ঝাড়িল। তদ্ভিন্ন কর্ত্তাভজাদের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানীদের চিরকাল আদা কাঁচকলা সম্বন্ধ, উভয় উভয়কে বিষনয়নে দর্শন করে। দুই দলের ভিতরে বড়ই বিদ্বেষ। কিন্তু কর্ত্তাভজার গুরুদের খুব বাহাদুরী বলিতে হইবে। এমন যে কুতর্কপ্রিয় জ্ঞানগর্ব্বিত ব্রহ্মজ্ঞানী তাহাদের দুই পাঁচ জন প্রধান পাণ্ডার স্কন্ধেও তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া দিয়া, দুই একটাকে যক্ষাকাশের রোগে ফেলিয়া শমনভবনেও প্রেরণ করিয়াছে। কেবল তাহা নহে, দুই পাঁচ জন প্রধান ব্রহ্মজ্ঞানীকে শিষ্য

করিয়া তাঁহাদের দলের মধ্যে তাহারা মহা গণ্ড গোল বাধাইয়া দিয়াছে। কোন্দল করিবার কালে রসমুঞ্জরী সে কথাটা বলিতে ছাড়িল না। খুব অহঙ্কারের সহিত বলিল, "ওলো, তোরা কি আর মিছে জাঁক করিস্। দেখ্‌গে যা, আমাদের অমুক মহাশয়ের পায়ের তলে তোদের কত বিদ্দি পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। কিসের এত বড়াই? থাক্ না আর কিছু দিন, তোদের দলকে দল ঘোষপাড়ায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করব। শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন শীঘ্র আমাদের গোত্র বৃদ্ধি করুন। কেন মিছে চালভাজা চিবিয়ে মরবি, তোর স্বামীকে বল্‌গে যা, আমাদের কাছে এসে একটু রসগোল্লার রস খেয়ে যেন প্রাণ ঠাণ্ডা করে যায়। আহা! হা! তোদের জাত কুল হারিয়ে কি নাস্তনাই হলো। তোরা ষাঁড়ের গোবর হয়ে শেষ রইলি। ব্রহ্মসভার যারা বিদ্বান জ্ঞানী ভক্ত তারা আমাদের দলে মিশে গেল, কেন আর পাতিনেড়ে কয় জন তোরা বাইরে পড়ে থাকিস্? আয়, আয়, রাধাকৃষ্ণ ভজবি, সুখে থাকবি। জাত কুল সব ফিরে পাবি। "লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার।" তোদের ব্রহ্মসভায় এত কান্না কাটি হয় কেন লা? জাত গেঁয়াত হারিয়েছিস্ বলে বুঝি? আমাদের পল্লতে শুক্রবারে এক দিন গিয়ে দেখে আসিস, কত প্রেমের তরঙ্গ, কত লীলা রসের রঙ্গ; কত আনন্দের ঘটা, কত হাসির ছটা; হাতে হাতে স্বর্গ।

সকল রসের সার কৃষ্ণপ্রেমামৃত।
রাধারাণী যার লাগি সদাই তৃষিত॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম শেয়াকুলের কাঁটা,
যেন কাঁটালের আঠা;
গুরুদত্ত নিত্যধন আট ঘাট আঁটা।
রংমহলে রসের মাণিক জ্বলে অন্ধকারে।
সহজ মানুষ বিনা সে ধন কে চিনিতে পারে।
সে কি সহজে মেলে;
উদয় হয় শুভ যোগ পেলে।
পুরুষ প্রকৃতি যুগল মুরতি,
মাধুর্য্য রসের কূপ;

জুড়ায় নয়ন, করি দরশন
আহা কিবা অপরূপ।
প্রেমরসে গলি, রসের পুঁতলী,
করে কেলী বৃন্দাবনে;
সে রূপ ভজিয়া, আনন্দে মজিয়া
চিরসুখী ভক্তগণে।
বৃথাই জনম, ধরম করম
যদি না মজিলি তায়;
কি হইবে গতি, ওরে মূঢ়মতি
হায় হায় মরি হায়।

(গীত) "প্রেমের কথা বল্‌লে কি হয়, শুন্‌লে কি হয় রে।
সাধু গুরুর করণ বিষম দায় রে। যেমন মড়ার উপরে
মড়া রে, তারা দুজন মড়া, প্রেমজলে জীয়ায় রে।"

তুমুল ঝগড়া করিয়া, ছড়া কাটিয়া, গান গাইয়া শেষ রসমুঞ্জরীর রাগের ঝড় তুফান কিছু নরম পড়িল। তখন সে শান্ত ভাবে চপলাকে দুই একটা উপদেশ দিয়া তাহার মনকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা পাইল। চপলা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলেন, তাঁর কোলের ছেলেটা ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রসমুঞ্জরীর কি দুর্জ্জয় প্রতাপ তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

যে সময়ে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক বচসা হইতেছিল, তৎকালে সন্তোষিণী বসনাবৃত মুখে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। অতঃপর তিনি দুই জনকেই বিনম্র বচনে বলিলেন, "তোমরা ভাই অনুগ্রহ করিয়া কাল একবার এস, সকলে এক সঙ্গে দাদার কাছে যাব, এবং তোমাদের কার কত বিদ্যের দৌড় তাহা দেখা যাবে।" তখন সকলেরই মুখে হাসি বাহির হইল। সন্তোষিণী রসমুঞ্জরীকে বলিলেন, "মাসি, তোমাদের একটা প্রেমলীলার গান গাও না শুনি। রসমুঞ্জরী গলা কাঁপাইয়া গান ধরিলেন।

"আমার মন কি যেতে চাও, সুধা খেতে আনন্দপুরে। তথায় রাগের মানুষ চলে নির্ব্বিকারে।

তথা নাই হিংসা নিন্দে, জরা মৃত্যু প্রভাত সন্ধ্যে, রত্নছটায় দীপ্তিমান

করে; তথায় নাহি চন্দ্র দিবাকর, ব্রহ্মা বিষ্ণুর অগোচর, তথায় পবন যেতে নারে, তুই যাবি কি করে, সাহসে কি ঢেঁকি গিল্‌তে পারে।

আনন্দময় বাজার খানি, নিত্য উঠে প্রেমের ধ্বনি, বারুদে আগুনে এক ঘরে; তথায় কামী লোভী যেতে বারণ, শুদ্ধ হয় যার রাগের কারণ, লয়ে রূপের প্রদীপ হাতে, যেতে হবে পথে, সন্দতম কেবল দূর করে।

গোসাঞী বৈষ্ণব চাঁদের বাণী, শুদ্ধ হয় যার ভক্তি খানি, মনে করলে সে যেতে পারে; ও চাকুরে বেনাগাছে বসে, ডুমুর গেল কোন্ সাহসে, তোর কি যাবার এমনি ধারা, শোন যে চাকুরে, পিঁপড়ের পাখা উঠে মরবার তরে।”

গীত শ্রবণে সকলের মন আমোদিত হইল, বিবাদ মিটিয়া গেল, শেষ সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল। চপলার চিত্তের কিন্তু ভাব ঘুচিল না। তাহার দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তি কর্ত্তাভজার শিষ্য হইয়াছে শুনিয়া সে মরমে মরিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া উঠিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রসসঞ্চার।

বাঞ্ছারাম যে গৃহে বসিয়া সদা সর্ব্বদা পড়া শুনা করেন, টিকটিকির মক্ষীকাভোজন দেখেন, পিঁপড়ার পা গণেন, হাঁ করিয়া বাসয়া ভাবেন, স্থির নয়নে টবের গাছের ফুল পাতা দর্শন করেন, তাহার একটী দরজা বাড়ীর ভিতরের দিকে, আর একটী বাহিরের দিকে। তিনি একাকী গ্রন্থ অধ্যয়নে নিমগ্ন আছেন, সন্তোষিণী চপলা এবং রসমঞ্জরীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সন্তোষিণী বলিলেন, “দাদা, আমাদের এই রসমঞ্জরী মাসী তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, ইহাঁর নিক তুমি অনেক তত্ত্বকথা শুনিতে পাবে, অনেক রকমের শাস্ত্র তন্ত্র ইা জানেন।”

বাঞ্ছারাম অন্যমনস্কের ন্যায় একবার তাহার পানে গম্ভীর ভাবে চাহিলেন, এবং ক্ষণকাল পরে একটু মৃদু হাস্য করিলেন। কি বুঝিয়া তিনি হাসিলেন তাহা বলা বড় সোজা কথা নয়। হয়তো সেই নরাকৃতি ঘন শ্যামবর্ণা বিকটদর্শনা নারীর দেহে কত পরিমাণে কোন্ কোন্ উপাদানের সংহতি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিলেন। তাঁহার হাস্যমুখ দর্শনে রসমঞ্জরী একটা প্রণাম করিয়া কথা আরম্ভ করিল। সে দুই পাঁচটা সাধু ভাষার কথাও শিখিয়াছিল; তাহা দ্বারা কখন আপনি, কখন তুমি ইত্যাদি সম্বোধনে আলাপ করিতে লাগিল। নিজেই নাক মুখ চোখ ঘুরাইয়া, হাত নাড়িয়া কথা কহিয়া যাইতেছে, বাঞ্ছারাম সে সব কথার মানেই বা কি জানেন, আর উত্তরই বা কি দিবেন, স্থির ভাবে কেবল শুনিতেছেন। রসমঞ্জরী বকিয়া বকিয়া শ্রান্ত হইল, তথাপি কোন প্রকার উৎসাহ বা উত্তর পাইল না। সেরূপ প্রকৃতির মেয়ে মানুষ বাঞ্ছারাম জন্মে কখনও দেখেন নাই, সেরূপ নূতন ভাষার ছেঁদো কথাও কখনো শুনেন নাই। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি এবং অচঞ্চল গম্ভীর নির্ম্মল ভাব স্বভাব দর্শনে রসমঞ্জরীর রস ক্রমে মরিয়া আসিতে লাগিল। তার প্রেমরসতত্ত্বের কোন কথার ফল ফলিল না, কাজেই সে অপ্রতিভ হইতে লাগিল। মনের সে ভাব চাপা দিবার জন্য আপনা আপনি হক না হক খানিক হাসিল এবং বক্তৃতা করিল। কিন্তু বাঞ্ছারাম সে দিকে মন দিলেন না। তিনি একে একে দুই, দুয়ে দুয়ে চার; ইহা ব্যতীত অন্য কিছু মানেন না, ভাবান্ধ লোকের প্রেমরসের প্রলাপ বাক্যের অর্থ বুঝেন না, রাধাকৃষ্ণের লীলা তাঁর কাছে ভূতের গল্প বিশেষ; সুতরাং রসমঞ্জরী মাসির হাসিটে মাঠে মারা গেল, লাভের মধ্যে তাহাতে গলা ও ঠোঁট শুকাইয়া উঠিল, গা ঘামিতে লাগিল। এদিকে চপলা তাহার দশা দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে, সন্তোষিণী ভগ্নমনোরথ হইতেছে। যাহারা রসিক বক্তা বলিয়া বিখ্যাত, লোককে হাসাইতে এবং আমোদিত করিতে না পারিলে তাহারা বড়ই বিড়ম্বিত হয়। অন্যের মনে রসোদ্দীপন করিতে গিয়া শেষ আপনি অনেক সময় শুকনা ডাঙ্গায় পড়িয়া হাবু ডুবু খায়। রসমঞ্জরীর সকল অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল, সে তখন পলাইবার পথ পায় না। বাঞ্ছা-

রাম তাহাকে কিছু অপমানও করিলেন না, অগ্রাহ্যও করেন নাই, কেবল আপন স্বভাবে আপনি স্থির রহিলেন। তাঁহার নির্দ্দোষ শান্ত সুগম্ভীর স্বভাব রসমুঞ্জরীর পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর, সুতরাং তজ্জন্য সে এক প্রকার অসুখ অনুভব করিয়া শেষ আস্তে আস্তে সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল।

তাহার পশ্চাতে চপলাও প্রস্থানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার কোলে সেই প্রিয়দর্শন বালশালতরুবৎ সুকুমার সন্তানটী শোভা পাইতেছিল। সহসা সন্তানকোলে সেই জননীরূপ সন্দর্শন করত বাঞ্ছারাম তাঁহার দিকে সচকিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি সামান্য দৃষ্টি নয়। অস্থিমাংসলোলুপ রূপমুগ্ধ মন্দমতি পুরুষদিগের কুদৃষ্টি নয়, কিন্তু নির্ব্বাণগতিপরায়ণ বিজ্ঞানরসজ্ঞ তত্ত্বদর্শীর অন্তর্ভেদী বৌদ্ধদৃষ্টি। বাঞ্ছারাম যেন দৃষ্টিপথের ভিতর দিয়া সেই অপূর্ব্ব মাতৃ মূর্ত্তির অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। উহা দৃষ্টিমাত্র কোম্‌তের নারীপূজার স্বরূপ লক্ষণ বিধি ব্যবস্থা উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধির কথা সমস্তই তাঁহার মনে আসিল। তাহার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া অনিমেষ লোচনে এই দিব্য শোভা দেখিতে লাগিলেন। সন্তানটী মধ্যে মধ্যে জননীর স্তন্যপান করিতেছিল। সন্তোষিণী চপলার কিছু কিছু পরিচয় তাঁহাকে দিলেন, কিন্তু বাঞ্ছারামের কর্ণে সে সকল কথা তখন স্থান পাইল না, তিনি বিমোহিত চিত্তে কেবল ঐ শিশু এবং জননীর মোহন রূপ দেখিতে লাগিলেন। এক জন অপরিচিতা যুবতী স্ত্রীর পানে এ ভাবে চাহিয়া থাকা যে তাঁহার মত যুবা পুরুষের পক্ষে নিন্দার বিষয় তাহা তিনি তখন মনে করিতেও পারেন নাই। তাঁহার ঈদৃশ সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত অবলোকনে সন্তোষিণীও কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিল। তাহার মনে যেন একটু হিংসার ভাব আসিল। কারণ, সে অনেক আরাধনা করিয়াও সে প্রকার একাগ্র দৃষ্টি আপনার দিকে কোন দিন আকর্ষণ করিতে পারে নাই। চপলা যে তাহা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী তাহাও নহে; তথাপি যে কি গুণে সে বাঞ্ছারামের চিত্ত আকর্ষণে সক্ষম হইল সন্তোষিণী তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তজ্জন্য তাহার প্রাণ পুড়িতে লাগিল।

চপলা সুন্দরীর এই রমণীয় মূর্ত্তিতে কি এক অভাবনীয় সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল, তাহা বাঞ্ছারাম ভিন্ন অন্যে জানিবার সাধ্য নাই। চপলা

দীর্ঘাঙ্গী, পরিণতযৌবনা, এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা; বয়স প্রায় দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ। তাহার বিলম্বিত কেশপাশ অর্দ্ধবসনাবৃত হইয়া পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়াছিল। পরিধান এক খানি চওড়া লালপেড়ে নূতন কোরা কাপড়, মস্তকে সিন্দূর বিন্দু, পদদ্বয় অলক্তরঞ্জিত. শরীরটী সুস্থ প্রভাবশালী প্রফুল্ল, চক্ষে বুদ্ধির জ্যোতি বিভাসিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশ; তাহার উপর হৃষ্ট পুষ্ট হাস্যবদন বর্দ্ধনশীল সুকুমার শিশু সন্তানটী বক্ষদেশ আলো করিয়া রহিয়াছে। সে কখন নীরবে মনের উল্লাসে মুদ্রিতনয়নে জননীর স্তন্যপান করিতেছে, কখন বা চক্ষু খুলিয়া আহ্লাদের আবেশে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতেছে, এবং মৃদু মৃদু হাসিতেছে। মাতৃস্নেহ বাৎসল্য এবং শিশুত্ব একত্র সম্মিলিত হইয়া এই মোহিনী মূর্ত্তি সংগঠন করিয়াছিল। দর্শনশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতবর কোমৎ যে এই রূপের ভিতর মনুষ্যত্বের ঘনীভূত আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহার উপাসনা ধ্যান আরাধনার আবশ্যকতা অনুভব করেন ইহাতে তাঁহার নিরীশ্বরবাদ ধর্ম্মের ভিতরেও কিছু কবিত্ব এবং ভক্তিরস প্রকাশ পাইয়াছে। খড় দড়ি বাঁশ কাঠ মাটী পাথরের মৃত দেবতা বা ঘট পট অপেক্ষা সন্তানকোলে জননীর জীবন্ত প্রতিমা যে হৃদয়তৃপ্তিকর, শক্তিপ্রদ এবং ভাবরসউৎপাদক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্নেহে গদ্‌গদ দিব্যাঙ্গী বয়স্থা নারী সন্তানকে কোলে লইয়া স্তন্য পান করাইতেছেন, আর মাসর্ব্বস্ব শিশু তাঁহার বাহুপাশে আলিঙ্গিত হইয়া বক্ষরূপ প্রেমসাগরে সদানন্দ মনে বিহার করিতেছে, ঈদৃশ ঐকান্তিক স্নেহ মমতা এবং ঐকান্তিক আনুগত্যের মিলনকে স্বর্গের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বাস্তবিকই মনে হয়। ফলতঃ অদৃশ্য নির্গুণ সত্তা মনুষ্যত্বকে যদি কোন মূর্ত্তিমান বাহ্য আকার প্রদান করিতে হয়, তবে এই রূপই তাহার অনুরূপ বটে।

পণ্ডিত বাঞ্ছারাম এত দিন গ্রন্থ পড়িয়া যাহা প্রাপ্ত হন নাই, চপলাকে দেখিয়া তাহা নিমেষের মধ্যে লাভ করিলেন। পূর্ব্বেও তিনি অনেক বার সন্তানক্রোড়ে জননী মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, কিন্তু তখন বিজ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয় নাই, কোম্‌তের মানবধর্ম্মতত্ত্ব এবং নারীপূজার বিধি পাঠ করিয়া এক্ষণে উহার মাধুর্য্য কোমলতা প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন। কলির জীব

অধিকাংশই নারীর উপাসক, কিন্তু সন্তানবতী নারীর ভিতর মনুষ্যত্ব কয় জন দেখিতে পায়? এই মাতৃ মূর্ত্তিটী বাঞ্ছারামের শুষ্ক কঠোর হৃদয়ে প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তির ন্যায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। এই রূপের ভজনায় যে দয়া স্নেহ প্রীতি বাৎসল্য প্রভৃতি হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিসকল বিকসিত এবং চরিতার্থ হয় তাহা তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করিলেন। ইহাতে তাঁহার নীরস প্রাণে কথঞ্চিত ভাবরস সঞ্চারিত হইল, এবং তিনি একটু আরাম শান্তি পাইলেন; কে যেন তীব্র জ্ঞানাগ্নি শিখায় প্রেমের শীতল জল ঢালিয়া দিল। এই ঘটনা হইতে বাঞ্ছারামের জীবনগতি ভাবরস কবিত্বের দিকে কতকটা অগ্রসর হয়, একটা নূতন রাজ্যের দ্বার তাঁহার নিকট যেন উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। এক্ষণে ঠিক যেন বিদেশ হইতে তিনি ঘরের দিকে অল্প অল্প করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন।

অনন্তর পুলকিত হৃদয়ে তিনি চপলার সহিত দুই চারিটী কথা কহিলেন, এবং সন্তোষিণীর মুখে তাহার সবিশেষ পরিচয় শুনিলেন। চপলার স্বামী এক জন বিধবাবিবাহকারী সমাজসংস্কারক ব্রাহ্ম ইহা শ্রবণে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য পণ্ডিতের মনে বড়ই কৌতূহল জন্মিল। জন-সমাজে মিশিয়া লোকচরিত্র অধ্যয়নের একটু প্রবৃত্তি হইল। অচেতন জড়-তত্ত্বের আলোচনায় চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে মানবতত্ত্বের ভিতরে প্রবেশের ইচ্ছা জন্মিল। জড়রাজ্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভুলিয়া যে সময় তিনি আপনার স্বভাবের সরল পথ হারাইয়াছিলেন, সেই কালে এই ঘটনাটী সমুপস্থিত হয়। মনোজগতের কি অলঙ্ঘনীয় নিয়মাবলী! যে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তিসকলের সামঞ্জস্য না হয়, একটা আর একটাকে অতিক্রম করিয়া চলে, তাবৎ মনুষ্য কিছুতেই শান্তি পায় না, অবস্থাতরঙ্গে পড়িয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। অনন্তসামঞ্জস্য, সর্ব্বসমন্বয়, চির-প্রেমমিলনের দিকে মানবের নিয়তি দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ আছে; সেই দিকে যাইবার জন্যই এই সকল অস্থিরতা ব্যাকুলতা এবং পুনঃ পুনঃ পন্থা-পরিবর্ত্তন।

সন্তোষিণীর যে জন্য এত চেষ্টা উদ্যোগ তাহার কিছুই হইয়া উঠিল না। বাঞ্ছারাম জড়তত্ত্ব হইতে নির্ব্বাণতত্ত্বে, নির্ব্বাণতত্ত্ব হইতে

সমাজতত্ত্বে, নারীপূজাতত্ত্বে, নানা তত্ত্বে নানা পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সংসারে স্ত্রী পরিবারের সহিত অবস্থিতি করিয়া সুখী হইবার যে কিঞ্চিৎ অভিলাষ যৌবনের প্রারম্ভে ছিল তাহা ইতঃপূর্ব্বে পিতার অন্যায় অত্যাচারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তদ্বিষয়ে সমস্ত আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া তিনি জ্ঞানপথের চিরপরিব্রাজকের ব্রত গ্রহণ করেন। নারীসঙ্গও তাঁহার জ্ঞান শিক্ষার উপায়, সুতরাং সন্তোষিণীর মনোবাঞ্ছা কিরূপে পূর্ণ হইবে? সকল দিকেই প্রতিবন্ধক। একেত সে সধবা কি বিধবা তাহার কোন মীমাংসা হইল না। সধবা হইলেও চিরজীবন বিধবার মত কাটাইতে হইবে। যদি বিধবা হইয়া থাকে, এমন নিশ্চিত প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইলেই বা বাঞ্ছারামের সহিত পুনঃপরিণয় কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? এক গৃহে ভ্রাতা ভগিণীর ন্যায় বাস, যদিও সম্পর্কে বাধে না, কিন্তু দেখিতে যেন কেমন কেমন বোধ হয়। তদ্ভিন্ন নিশানাথ জ্ঞাতি কুটুম্বের মায়া মমতা ছাড়িয়া, স্ত্রীর প্রবল শাসন অতিক্রম করিয়া কার্য্যকালে সে বিষয়ে কত দূর সাহসী হইতে পারিবেন, তাহাতেও গভীর সন্দেহ আছে। সুতরাং পল্লীগ্রামে হিন্দুপরিবারে একটি বিধবাবিবাহ দিয়া সমাজসংস্কার-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিব, কি উভয়কে দাম্পত্য প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া সংসারাশ্রমে সুখে রাখিব তাহার পক্ষে আমরা বড়ই ব্যাঘাত দেখিতেছি। অরণ্যপরিবেষ্টিত প্রস্তরময় বন্ধুর ভূমিবিহারিণী নির্ঝরিণী যেমন বক্রগতিতে গমনপন্থা অন্বেষণ করে, সন্তোষিণীর হৃদয়গুহার অভ্যন্তরে তেমনি উৎসারিত প্রীতিস্রোত প্রতিপদে বাধা পাইয়া পথ অন্বেষণ করিতেছিল। তাহার সামাজিক অবস্থা এরূপ জটিল কেন হইল আমরা তাহা এখনও ভাঙ্গিয়া বলি নাই। শৈশবে যখন তিনি পিতৃভবনে বাস করেন, সেই কালে তাঁহার প্রতিবাসীর এক কন্যার সহিত কোন বহুবিবাহকারী কুলীন মহারথীর বিবাহ উপস্থিত হয়। কন্যার পিতা পণের সমস্ত টাকা দিয়াছিলেন, কেবল দশটী টাকার যোগাড় করিতে পারেন নাই। সেই জন্য গুণধাম পাত্র রাগিয়া ছাদনাতলা হইতে উঠিয়া গেলেন এবং উক্ত কন্যাকর্ত্তার প্রতি রাগপরবশ হইয়া বিনাপণে সন্তোষিণীকে সেই রাত্রেই বিবাহ করিলেন। গরিব বেচারী তখন ঘুমাইতেছিল, কিছুই জানে না।

তখন তার বোধ শোধও কিছু জন্মে নাই। রাগ অভিমান চরিতার্থের জন্য এই বিবাহ, ইহাকে এখন আপনারা যাহা বলিতে চাহেন বলুন, কিন্তু ঠিক বিবাহ বলিয়া আমাদেরত মনে ধরে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সভ্যতার লীলা!

বসন্তপুর গ্রামের প্রান্তভাগে একটী খৃষ্টীয়ানমণ্ডলী আছে, তাহার মধ্যে অনেক তেঁতুলে বাগদী, চাঁড়াল এবং কাওরা সপরিবারে বসতি করে। দুর্ভিক্ষের সময় সে বার দেশে বড় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রমজীবীদিগের কাজ কর্ম্ম জুটিত না, সেই সুযোগে পাদরী ভগান্ সাহেব তাহাদিগের মাথায় জল ছিটাইয়া দলভুক্ত করিয়াছেন। দুই পাঁচ ঘর কায়স্থ নবশাখও তাহার মধ্যে ছিল, কিন্তু সংসর্গ গুণে তাহাদের ব্যবহার প্রকৃতিও হাড়ী বাগদীর মত হইয়া যায়। মণ্ডলীমধ্যে এক জন দেশীয় পাদরী বাস করিতেন। খৃষ্টীয়ানেরা কেহ তাঁহার তামাকু সাজিত. কেহ ঘর ঝাঁট দিত, কেহ ছেলে কোলে করিত, কেহ রাঁধিত, কেহ গরুর ঘাস কাটিত এবং বাজার করিত। তাহার বিনিময়ে পাদরী মহাশয় ইংরাজি সুরে বিলাতি বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ দিতেন।

মণ্ডলীর প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে হাঁস মুর্গি পেরু পায়রা ছাগ মেষাদি ভূচর খেচর উভচর প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতেছে, তাহাদের বিষ্ঠা মূত্র এবং স্খলিত পক্ষপুঞ্জে উঠানের চারি দিক্ পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে কোথাও জাকেটপরা কামিজগায় কোন নারী বসিয়া হলুদ-মাখা শিলের উপর শিঙ্গী মাচ ঘসিতেছেন, কোথাও বা কোন সুন্দরী পেঁয়াজ রশুন ছাড়াইয়া রাশীকৃত করিতেছেন। তৎপার্শ্বে ঘাড়ের চুলছাটা টেরিকাটা হাফআস্তিন জামাপরা কোন যুবা মুর্গি হাঁসের গলায় ছুরি লাগাইতেছে, কেহ বা গরু ও বকরীর ছাল খুলিয়া তাহাদের হাড় এক

জায়গায় মাস এক জায়গায় বাধিতেছে: কেহ বা চুরট টানিতে টানিতে নারীগণের সঙ্গে ঠাট্টা আমোদ করিতেছে। দুই একটা ছোট ছোট ছেলে কুকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাহার সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে বকরির ঠ্যাং চিবাই-তেছে। কেহ বা কাঁচা হাঁসের ডিম ভাঙ্গিয়া চুষিতেছে। চারি পার্শ্বে চিল শকুনি কাক উড়িতেছে। কুকুরগুল সভয়ে কেহ দূরে জানু পাতিয়া বসিয়া আছে, কেহ বা কাক চিলের সঙ্গে বিবাদ করিতেছে। প্রতি দিন তথায় এইরূপ মহাসমারোহের ব্যাপার নয়নগোচর হইত। আবার সন্ধ্যাকালে তবলার চাটি, বেহালার গদ্ এবং সঙ্গীতধ্বনিও শুনিতে পাওয়া যাইত। পূর্ব্বে ইহারা যখন কৃষক শ্রমজীবী ছিল, তখন রাজা জমিদারকে কর দিত, ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া নির্দ্দোষ ভাবে সুখে মনে ঘরকন্না করিত। খৃষ্টান হইয়া অবধি রাজাকে আর খাজানা দেয় না, ভদ্র লোককে মানে না, মহাজন টাকা চাহিলে তাহাকে ঘুঁসি দেখায়, মিথ্যা কথা কয়, দাঙ্গা করে, লোকের ছাগল মুর্গি চুরি করিয়া খায়, কেহ তজ্জন্য নালিস করিলে পাদরী সাহেবকে ডাকিয়া লইয়া হাকিমের সিংহাসনপার্শ্বে বসায়। এই সকল ব্যক্তি-দিগকে গির্জ্জায় বসাইয়া রেভারেণ্ড ভগান উপদেশ দেন, আর বার্ষিক রিপোর্টে সংখ্যা বৃদ্ধির কথা লিখিয়া ধন্যবাদ গ্রহণ করেন।

এক দিকে এই খৃষ্টীয়ান পল্লী অপর দিকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুর বাস, মধ্যস্থলে একখানি ছোট আটচালায় সঙ্কটাচরণ বাবু অবস্থিতি করেন। তিনি যেমন হউক, বিধবাবিবাহ করিয়া ব্রাহ্মদলে মিশিয়া এক প্রকার তরিয়া গিয়াছেন, একটী সহোদর ভাই তাঁহার ছিল, তাহার কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত কোন কিনারা হয় নাই। সে সন্ধ্যাকালে হ্যাটকোট পরিয়া ফিরিঙ্গী বেশে ঐ খৃষ্টীয়ান পল্লীতে গিয়া তবলায় চাটি মারিত, মদিরা পান করিয়া টপ্পা গাইত। কখন বা ব্রাহ্মণবেশে হিন্দুসমাজের ভিতর কাহারো বাড়ীর কোন ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠের নিন্দা করিত এবং ভোজ ফলার খাইয়া আসিত। কেহ চাপাচাপি করিলে বলিত, "আমি স্বতন্ত্র থাকি, দাদার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখি না।" সঙ্কট বাবু গ্রাম্য সবরেজিষ্ট্রারের কার্য্য করেন, এবং তৎপদের প্রভুত্ব প্রভাবে জন

কয়েক লোক লইয়া একটী ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিয়াছেন, তাহাদের যোগে প্রতি বুধবারে উপাসনা হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে নিশানাথ বাবুর সঙ্গে কেবল তাঁহার যাহা কিছু একটু গতিবিধি ছিল। কারণ, তাঁহার নিকট তিনি কোন কোন বিষয়ে গোপনে সহানুভূতি পাইতেন। সঙ্কটের সঙ্গে সেই খানে বাঞ্ছারামের আলাপ পরিচয় হয়। এক দিন তিনি তাহাকে নিজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। ইতঃপূর্ব্বে বাঞ্ছারাম কোন দলেই বড় একটা মিশিতেন না, প্রায় একাই থাকিতেন, এক্ষণে সেই সন্তানকোলে চপলার মূর্ত্তি দেখিয়া অবধি তাঁহার মন কিছু সরস হইয়াছিল এবং বিশেষ বিশেষ লোকের সঙ্গে আলাপ করিবারও একটু ইচ্ছা জন্মিয়াছিল।

এক দিন তিনি সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া সঙ্কট বাবুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সে দিন বুধবার, সমাজের দিন। দুই এক জন ব্রাহ্ম সভ্য ও ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। সঙ্কট বাবুর অনুষ্ঠানের ক্রেটি নাই, বাঞ্ছারামের অভ্যর্থনার জন্য হুঁকা সাজিয়া দিলেন, তাঁহার ভ্রাতা গোটা কতক চুরট, একটা পুরাতন পাইপ আনিয়া হাজির করিলেন। বোতলে একটু উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ছিল তাহাও আনিয়া সম্মুখে ধরিলেন। বাঞ্ছারামের সঙ্গে এ সকলের কোনই সম্বন্ধ নাই, কেবল একটু নস্য লইয়া তিনি নাকে দিলেন।

সঙ্কট বাবুর গৃহে এখনো ভার্ণাকিউলার দুই রকম বন্দোবস্তই আছে। তাঁহার এক তৃতীয়াংশ হিন্দু, এক তৃতীয়াংশ ব্রাহ্ম, বাকী সাহেবানী। তদীয় ভ্রাতা বিকট বদন পূরো ষোলআনা সাহেব। তাঁহার আয় তেমন ছিল না যাহাতে আশা মিটাইয়া সাহেবী চালে চলিতে পারেন, কিন্তু আঠার আনা সখ ছিল। দাদার আফিসে নকলনবিশের কাজে মাসে পাঁচ সাত টাকা যা পাইতেন তাহা দ্বারা কলিকাতার লালবাজার হইতে নীলামে বিক্রী পুরাতন কোট প্যান্টুলান, কাঁচের ভাঙ্গা গ্লাস বাসন, পিতল কিম্বা দস্তার কাঁটা চামচ সস্তা দরে কিনিয়া আনিতেন। মুর্গি মাটনের পয়সা প্রায় কোন দিন জুটিত না, কেবল মধ্যে মধ্যে চুরি চামারি করিয়া চালাইতেন; নিত্য ব্যয়ের জন্য দুই পয়সার শুকনা গরুর মাংস বরাদ্দ ছিল। তাই আগুনে ঝলসাইয়া তাহাতে একটু সরিষা-

বাটা মাখিয়া ভক্ষণ করিতেন। দেবদারু কাঠের একটা ভাঙ্গা টেবল আর পায়াভাঙ্গা একখানি টুল ছিল, তাহার উপর বসিয়া ঐ সকল সাহেবী খানা খাইতেন। মধ্যে মধ্যে আবার বাসি গোমাংস পর দিবসের ব্রেকফাষ্টের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত। একে বুড় গরুর শুষ্ক মাংস, তাহাতে আবার বাসি, অতি অপূর্ব্ব সামগ্রী, সিরকার রসে ডুবাইয়া উহা যখন তিনি ভোজন করিতেন, তখন মনে ভাবিতেন, আমিই বা কে, আর যুবরাজ প্রিন্স অবওয়েল্‌সই বা কে। অল্প ব্যয়ে সাহেবী চাল যত দূর চলে বিকট তাহা প্রাণগত যত্নে অতিশয় নিষ্ঠার সাহিত সম্পন্ন করিত। সাত্ত্বিক ভক্তিমান হিন্দু যেমন শ্রদ্ধার সহিত পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধের বা দুর্গোৎসবের দ্রব্যাদি আহরণ করে, বিকটের এ কার্য্যে তেমনি নিষ্ঠা ছিল। সে একটী বাৎরুম করিয়াছিল, তাহাতে একটা কমোড থাকিত, সে কমোড নিজেই আবার সে রোজ রোজ পরিষ্কার করিয়া রাখিত। একবার নীলামে চারি আনা দিয়া একটা পুরাতন গাউন তিনি ক্রয় করেন। মনে বড় সাধ যে বিবাহ করিয়া সেইটী মেমকে পরাবেন, পরাইয়া দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া পথে পথে বেড়াবেন; সেই জন্যই খৃষ্টীয়ানমণ্ডলীতে ঘন ঘন এত গতায়াত। একটী তেঁতুলে বাগদীর মেয়ের সঙ্গে প্রণয়ও হইয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য দোষে সেটা হাত লাগিল না। প্রণয়ের বাড়াবাড়ি অর্থাৎ অতিরিক্ত কোর্টসিপ দেখিয়া পাদরী ভগান্‌ একদিন তাহাকে চাবুক মারিয়া মণ্ডলীর সীমা হইতে বিদায় করিয়া দেন। পরে বদি্ন অনুতাপ সহকারে সে খৃষ্টীয়ান হইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু লাট পাদরীর ভয়ে তাহা করা হয় নাই।

বিকট বাবু এক্ষণে ব্রাহ্মদলে ভর্ত্তি হইবার জন্য উমেদার আছেন। প্রতি বুধবারে সমাজে গিয়া চক্ষু বুঁজিয়া বসিয়া থাকিতেন। যেখানে উৎসব কি সমারোহ ব্যাপার, বিকট তথায় বিনানিমন্ত্রণে অগ্রে গিয়া উপস্থিত হইত। সে হতভাগার অগম্য স্থান ছিল না। যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে এমনি গিয়া মিশিত যেন কতই আত্মীয়তা। অনায়াসে অপরিচিত ভদ্র লোকের গলা জড়াইয়া ধরিত। কথায় কথায় তাঁহার মুখে ভ্রাতা ভগ্নী। ভদ্র গৃহস্থ-ভবনে পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিবার জন্য আগে ভাগে বাড়ির ভিতরে গিয়া ঢুকিয়া পড়িত। চক্ষুলজ্জায় সহসা কেহ কিছু বলিতে পারিত না।

আহারে বসিয়া আর সকলে যখন ভগবানকে স্মরণ করিবার জন্য চক্ষু বুঁজিতেন, বিকট সেই উপলক্ষে অমনি পাশের পাত হইতে খাদ্য তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিত। উপাসনার সময় সে একবার চক্ষু বুঁজিয়া খুব আড়ম্বর করিয়া বসিত, তাহার পর বেহারাদের সঙ্গে মিশিয়া তামাকু খাইত আর বেডব বেডব করিয়া গল্প করিত। শেষ শান্তি বাচনের সময় খুব উৎসাহের সহিত জোরে জোরে—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (মনে মনে আপদ শান্তি) বলিয়া তখনি আবার তাড়াতাড়ি হুঁকা ধরিত। উপাসনার স্থলে মহিলাদিগকে অনুপস্থিত দেখিলে বিকট বাবুর দুঃখ বিরক্তির আর সীমা থাকিত না। বলিতেন, "যে উপাসনায় ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণের সমাগম নাই আমি তাহাতে যোগ দেওয়া পাপ মনে করি।" এই বলিয়া সমাজের সভ্যদিগকে ভৎর্সনা তিরস্কার করিয়া লম্বা লম্বা উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশের জ্বালায় নিরীহ ব্রাহ্ম ভ্রাতারা বড়ই কাহিল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিকট সমাজে গিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিত, কাহার হাত মুখের ভঙ্গী কিরূপ হয়, এবং কেইবা নাক ডাকাইয়া ঘুমায়। হিন্দুদলে গিয়া আবার এই সব বিষয়ে নানা রঙ্গ রসের সহিত গল্প করিত। উপাসনা কালে কে চক্ষু বুঁজিয়া, মুখ বাঁকাইয়া, দন্তপাতি বাহির করিয়া থাকে, কে আধঘুমন্ত অবস্থায় মুখে ঝোল টানে, কার দুই কস দিয়া লাল গড়াইয়া ধারাণী পড়ে, কে নমস্কারচ্ছলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নিদ্রা যায়, কে চঞ্চল বানরীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, এবং কেইবা বৈবাহিকের ন্যায় পায়ের উপর পা রাখিয়া বাম হস্তে মলা তুলিয়া তুলিয়া তাহা গুটলি পাকাইয়া লোকের গায়ে ফেলিয়া দেয়। কোঁৎ কোঁৎ শব্দে কে ঢোক গেলে, কে নির্জ্জলা চক্ষে কাঁদে, কে হক না হক চেঁচাইয়া মরে, এ সমস্ত খবর বিকটের বিশেষ রূপ জানা ছিল। কোন্ কোন্ ব্রাহ্ম প্রার্থনা করিতে করিতে বক্তৃতা ধরিয়া ফেলে, কে উপদেশ ঝাড়িবার জন্য দীর্ঘ প্রার্থনা ধরিয়া খাই হারাইয়া শেষ মাথা চুলকায় এবং মুখে যা আসে প্রলাপ বকিয়া যায়, লম্বা বক্তৃতায় কেই বা শ্রোতাদিগকে বিরক্ত এবং নিপীড়িত করিয়া তোলে এবং আপনাকে আপনি বড় বক্তা মনে করে, ইহাও সে বিলক্ষণ রূপে জানিত। বিকট এ সকল বিচিত্র

ব্যাপার দেখিত আর মুখ মুচকিয়া ঠোঁট টিপিয়া ক্রমাগত হাসিত। কখন বা সেই সঙ্গে আপনিও নানা রঙ্গ ভঙ্গে ব্যঙ্গ করিত। ব্রাহ্মচরিত্রের বিচিত্রতার এক প্রকাণ্ড তালিকা তাহার নিকট ছিল। যাহারা মদ্যপান করে, স্ত্রীর ভয়ে পুঁতুলের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, আফিসে ঘুস খায়, বিবাদ ঝগড়া বাধায়, কান ভাঙ্গায়, মিথ্যা কথা কয়, ধার লইয়া ঋণ শোধ করে না এবং এই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমাজে মাঝে মাঝে কিছু কিছু চাঁদা দেয় তাহাদের সঙ্গে বিকটের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ব্রাহ্মসমাজের যে দিকটা ভাল সে দিকে সে পদার্পণ করিত না, কেবল দোষ খুঁজিয়া বেড়াইত, কারণ তাহাই তাহার প্রয়োজন।

অতঃপর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সঙ্কট বাবু বন্ধুগণকে লইয়া উপাসনায় বসিলেন এবং বাঞ্ছারামকে যত্ন সহকারে তাহার মধ্যে উপবেশন করাইলেন। উপাচার্য্য অধ্যেতা গায়ক সকলে যথাস্থানে বসিয়া সংস্কৃতমিশ্র আভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা আরম্ভ করিল। বাঞ্ছারামের নিকট এ সমস্তই নূতন, কারণ তিনি কোন কালে ব্রাহ্মসমাজ দেখেন নাই। সঙ্কট বাবুর সে দিন উপাসনায় আর বড় যোগ দেওয়া ঘটিল না, তিনি আগন্তুক নবাগত বন্ধুর সন্তুষ্টি সাধনের জন্যই ব্যস্ত রহিলেন। বাঞ্ছারাম তাঁহার সমাজ দেখিয়া প্রশংসা করেন, প্রীত হন, এইটী মনে বড় ইচ্ছা। সঙ্কট বাবুর ব্রাহ্মসমাজ যদিও সামান্য, কিন্তু সকল প্রকার সামগ্রী তাহার মধ্যে আছে। একটী পুরাতন ভগ্ন জীর্ণ বেলয় হারমনিয়ম, এক যোড় বাঁধা তবলা, একটা তানপুরা গায়কের সাহায্য করে। সম্মুখে গ্যালারি করা খান কতক আঁব কাঠের তক্তা, মধ্যে উপাচার্য্যের জন্য চেয়ার টেবল। সকলে চক্ষু বুঁজিল, উপাচার্য্য দমকে দমকে ঝোঁকে ঝোঁকে বিশেষ স্বর ভঙ্গীর সহিত "আলে বেতে সে" শিক্ষার্থী ছাত্রের ন্যায় দুলিয়া দুলিয়া স্তব বন্দনা পাঠ করিলেন, অধ্যেতা বক্তৃতা পড়িলেন, পরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

তদনন্তর আর আর সকলে চলিয়া গেলে সঙ্কট সেই টেবিলে এক খানি চাদর বিছাইলেন, এবং বিকটকে আহারের যোগাড় করিতে বলিলেন। চাদর খানির মাঝে মাঝে তরকারীর ঝোল হলুদের দাগ, এবং এমনি তাহাতে বিশ্রী দুর্গন্ধ, যে নাকের কাছে ধরিলে গা বোমি বোমি করে। টেবিলের

নীচে হাঁস এবং মুর্গির বিষ্ঠা এবং ছাগলের নাদি। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বাঞ্ছারামের হারভক্তি উড়িয়া গেল। বিকট বাবুর (ও বিষ্ণু, মিষ্টার বিকটের) আজ বিশেষ আনন্দ, বন্ধু ভোজনের উপলক্ষে দাদার ব্যয়ে আজ তিনি কয়েকটী মুর্গি হত্যা করিয়াছেন এক বোতল মদও আনা হইয়াছে, যাঁহার জন্য এ সমস্ত আয়োজন তাঁহার প্রয়োজনে আসুক না আসুক, বিকটের ইহাতে বিশেষ লাভ আছে। ছেঁড়া হাটকোট প্যানটুলান পরিয়া উৎসাহের সহিত তিনি নিজেই খানসামার কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অথবা সুখের বিষয়, বাঞ্ছারাম এ সকল কিছুই খান না, যাহা কিছু তাহাকে দেওয়া হইল সমস্তই তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন, গৃহস্বামীর বিশেষ অনুরোধে কেবল দুই একটী ফল খাইলেন। মৎস্য মাংস মদিরিকা ইত্যাদি পঞ্চমকার ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশস্ত উদর মধ্যে প্রবেশ করিল। মিষ্টার বিকট পুনঃ পুনঃ দুই চারিটা অঙ্গহীন অন্ধ খঞ্জ ইংরাজী কথায় বাঞ্ছারামের সহিত আলাপের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বাঙ্গালা উত্তর পাইয়া আর বেশী ক্ষণ সে পথে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু সে জন্য দাদার নিকট কিছু মিষ্ট ভৎসনাও খাইতে হইল। তথাপি কাহার সাধ্য তাহাকে অপ্রতিভ করে; বাঙ্গালা ইংরাজিতে মিশাইয়া বাঞ্ছারামকে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার জন্য সে ভজাইতে লাগিল। সঙ্কট বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন, ভদ্রলোকের সম্মুখে বেশী কিছু বলিতেও পারেন না, অথচ রাগে অঙ্গ গর গর করিতেছে, অন্য সময় হইলে ভ্রাতাকে পাদুকা দ্বারা শুশ্রূষা করিতেন, কোনরূপে সে দিন মান বজায় রাখিলেন। অতঃপর বাঞ্ছারাম বলিলেন, "আমার কতকগুলি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, চলুন বারাণ্ডায় গিয়া বসা যাক্, এখানে বড় দুর্গন্ধ।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সখের ধর্ম্ম।

আহারান্তে বারান্দায় বসিয়া দুই জনে বিবিধ কথার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন। বাঞ্ছারাম সত্যানুসন্ধায়ী তত্ত্বপিপাসু ছাত্র, ব্রহ্মসমাজ জিনিষটে কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহার মনে ইদানীং কিছু কৌতূহল জন্মিয়াছে। নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সঙ্কটচরণের সঙ্গে তাঁহার কথা হইতে লাগিল।

সঙ্কট। কিরূপ লাগ্‌লো? আপনার মনের সঙ্গে মিললো কি?

বাঞ্ছারাম। কেন বেশত। সমাজ কি আপনাদের প্রতি সপ্তাহেই হয়?

স। না, প্রতি সপ্তাহে হয় না, তবে ভদ্রলোক টোক কোন দিন এলে করা যায়। আর বাৎসরিক উৎসব খুব সমারোহের সহিত হয়ে থাকে।

বা। আপনাদের সভ্য সংখ্যা কিন্তু বড় কম।

স। হাঁ, নিতান্ত কমও নয়, তবে আজ কাল লোকের তত উৎসাহ নাই। কিন্তু আমার স্ত্রী যে দিন উপাচার্য্যিকা হয়ে লেক্‌চার দেন, সে দিন জায়গায় কুলিয়ে উঠ্‌তে পারি না। ভয়ানক ভিড় হয়।

বা। আচ্ছা মশায়, এ প্রকার নূতন তর সুর আপনারা কোথায় পেলেন বলুনত? কখনত এরূপ শুনি নাই?

স। এটা আমাদের ব্রাহ্মসমাজেরই সুর, এই সুরে আমাদের সমাজে বক্তৃতা উপাসনা হইয়া থাকে।

বা। যে বাবুটী প্রার্থনা করিলেন, বেশ কিন্তু তাঁর ভক্তিভাব। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কাঁদিতে পারা সহজ কথা নয়। আমি শুনে বড় পরিতৃপ্ত হলেম। রোদনের শব্দ শুনে চক্ষে যেন জল আস্‌ছিল।

স। আজ্ঞে সেটা বাস্তবিক ক্রন্দন নয়, ঐ রূপ কাঁদুনে সুর। আমাদের উপাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বস্থলেই ঐ প্রকার কাঁদুনে সুরে বক্তৃতা করেন। শুনতে এক প্রকার মন্দ নয়।

বা। যাই হউক, মোদ্দা বেশ ভাবটুকু।

সঙ্কট ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন, "আপনি বোধ হয় তাঁর মুখ পানে চেয়ে দেখেন নাই। মুখভঙ্গী দেখিলে আর সে দিকে আপনার চাহিতে ইচ্ছা হইত না। চক্ষে এক ফোটা জল পড়ে না, অথচ কান্না; বেশ সেধে-ছেন। কিন্তু এ সমস্ত আমারি চেষ্টার ফল। তাঁকে আমি অনুগ্রহ করে একটা কাজ দিয়ে এখানে রেখেছি। নিজে ভাল বাঙ্গালা জানি না তাই, নৈলে নিজেই সব করা হয়ে থাকে। সমস্তই করে কর্ম্মে বুঝিয়ে দিতে হয়।

বা। আপনাদের দলে না কি এক জন লিডারের বড় অভাব হয়েছে?

স। না, লিডারের কিছু অভাব নাই, ফলোয়ার পাওয়া যাচ্ছে না, লিডার আমরা সকলেই। এবং প্রত্যেকেই অভ্রান্ত। ভ্রান্ততা কেহ স্বীকার করে না।

বা। তথাপি এক জন বিশেষ নেতা না হলে কি কাজ চলে?

বিকট বাবু বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, আপনি যা বলিলেন সে কথা সত্য। আমি দাদা বাবুকে সেই জন্য পরামর্শ দিয়াছিলাম যে আপনারা ভাল একটা লিডারের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিন্।

স। আরে মোলো এ ষ্টুপিডের জ্বালায় যে হাড় জ্বালাতন দেখি! তুই কেন উত্তর করিস? এ কি স্কুলমাষ্টার তাই এডুকেশন গেজেটে বিজ্ঞাপন দিব?

বা। আচ্ছা মশায়, যিনি উপাসনা করিলেন তাঁর গলায় পৈতা কেন রয়েছে? আপনারাতো জাতিভেদ মানেন না শুনিছি?

স। আরে দাদা তুমিও যেমন, পৈতে। পৈতেত সামান্য কথা, আমারও গলায় একগাছ আছে, ওটা বড় দরকারী জিনিষ। সে জন্য কিছু দুঃখ নাই, আমাদের উপাচার্য্য ভায়ার বাড়ীতে দুইটী বিধবা আছে, একটী তাঁর খুড়ী, একটী মাসী; বিবাহ দিলে তারা এখনি অনায়াসে বিবাহ করে, দেশের কত উপকার হয়, কিন্তু ভায়া এমনি ভীরু কাপুরুষ, তা কিছুতেই পেরে উঠলেন না।

বিকট। এক জনকেত আমিই অনায়াসে বিয়ে করতে পারি।

স। থাক্ থাক্। তুই চুপ করে বসে থাক, না হয় উঠে চলে যা! আপ-নার পেট চলে না, উনি আবার বিয়ে করবেন!

বা। সকল বিধবারই কি বিবাহ করা উচিত আপনি মনে করেন?

স। তার আর সন্দেহ? বিধবাবিবাহ চলিত না হইলে ভারতকে উদ্ধার করা যাবে না। আমিত সেই জন্যই বিধবাবিবাহ করলেম।

বা। আপনাদের এ ধর্ম্মের সংস্থাপকত রামমোহন রায়?

স। হাঁ, তাঁর নামই চলিত বটে। তবে তিনি বিশেষ কিছু করে যেতে পারেন নাই।

বা। তবে কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ মতের প্রবর্ত্তক বলেন?

স। প্রবর্ত্তক ঠিক বলা যায় না, সহায় কতকটা বলিতে পারেন।

বা। কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারাই সভ্যসমাজে বোধ হয় এ ধর্ম্ম লোকে জানিতে পারিয়াছে। তাঁহাকেইত আপনারা লিডার বলেন?

স। লিডার একপ্রকার হইতে পারেন, কিন্তু ওরিজিনেটার নহেন।

বা। যথার্থ ওরিজিনেটার তবে কে?

বিনয়ের সহিত আত্মগোপন করিয়া সঙ্কট শেষ আপনাকেই প্রকারান্তরে ওরিজিনেটার স্বীকার করিলেন। এবং স্পষ্ট বলিলেন, "আমি বার বৎসর বয়সে ছাত্রাবস্থায় ধর্ম্মবিষয়ক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা পড়িলে আপনি পরিষ্কার দেখিতে পাবেন, নববিধানের নূতন আইডিয়া সমস্ত তাহাতে ছিল। নেমখারাম দেশ, যার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিতে চায় না

বা। আচ্ছা, যিনি বক্তৃতা পড়িলেন, তিনি কি বেশ বিদ্বান্? বোধ হয় অনেক বিজ্ঞান গ্রন্থ তাঁহার দেখা আছে।

স। হাঃ হাঃ হাঃ! ও সব কথা যেতে দিন যেতে দিন। সময় পাই না, নতুবা আরো অনেক ইম্প্রুভ করা যেতে পারে।

বা। কেন, যে কথাগুলি লিখে এনেছিলেন তাতেত বেশ চিন্তা আছে, গভীর ভাবও আছে!

স। থাকবার ভাবনা কি!

বা। আপনি বুঝি তবে সব বলে টলে দেন।

স। হাঁ, বলেও দেওয়া হয়। তা ছাড়া অধিকাংশ কেশব সেন, আর দেবেন্দ্র ঠাকুরের বক্তৃতা উপদেশ থেকে তোলা। আসল কথাটা কি

তা জানেন, আমিই এর সব, নিজমুখে বলাটা ভাল দেখায় না ; কিন্তু যেটি না দেখিয়ে শুনিয়ে দেব তা আর হবার যো নাই। একটু মনোযোগের ত্রুটি হয়েছে, অমনি দেখুন না, পরের বৈ থেকে তুলে মরেছে। ওরিজিনালিটী ত কিছুই নাই! চিন্তা করে করে আমায় ডায়বিটিশের রোগে ধরেছে, আর পেরে উঠি না। এই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। তাতেও কি লোকের নিকট প্রশংসার প্রত্যাশা আছে? এমনি অকৃতজ্ঞ সব লোক, এত করিলাম, তা কেউ মুখে একটী বার স্বীকার করিতে চায় না। এ দেশ অতি পাজি দেশ।

বা। আপনি এত শীঘ্র দেশের লোকের উপর চটিলে কাজ করিবেন কিরূপে?

স। তা কি আর ছাড়িব? শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকৃতে আর তা পারব না।

বা। আপনাদের ভিতর নির্ব্বাণ সাধনের কি কিছু চর্চ্চা হয়ে থাকে?

স। সেত বৌদ্ধদেব ধর্ম্ম। আমাদের হচ্ছে সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করা। উদার সার্ব্বভৌমিক অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহার ভিতর কোন রূপ ভ্রান্তি কুসংস্কার সঙ্কীর্ণতা আসিতে পারে না। সকল মনুষ্যকে একপরিবারে বদ্ধ করিবার জন্যই ইহার অবতরণ।

বা। তবে আপনাদের ভিতর বোধ হয় দলাদলির কোন গোল মাল নাই। বেশ, বেশ, এই তো ঠিক।

স। বেশই ছিল বটে, সম্প্রতি একটু দলাদলির ভাব দাঁড়িয়েছে। মতে কিন্তু সব ঠিক আছে, সকলেরই এক উদার মত।

বা। দলাদলি হইল কেন?

স। কেন, তাহা আগেই তো বলিছি। সকলেই লিডার, ফলোয়ার কেহ নাই। লোকের মত কাগজে লিখে বক্তৃতা করে, বেহায়া হয়ে আপনার কথা আপনি আর ত বলে বেড়াতে পারি না, সুতরাং রেমো সেমো হারু তারু সকলেই এখন লিডার।

বা। কত গুলি দল হয়েছে?

স। তা মাঠের কোণে ষষ্ঠীর মুখে ছাই দিয়ে অনেক গুলি। তিনটে ত

প্রধান, (১) আদি, (২) সাধারণ, (৩) নববিধান। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আবার আছে। জনে জনে দল বলিলেও বলা যায়। স্বাধীনতার জোরে সকলে দশ দিকে সট্‌কে পড়েছে।

বা। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা বিনাশের জন্য পুরাতন ধর্ম্ম ছাড়িলেন, তাঁরা কেন আবার সম্প্রদায় করেন?

স। না করে কর্‌বেন কি? কাবো সঙ্গে কাহারো যে মেলে না। আমি বলিলেত কেহ আমার শুনিবে না। এক জায়গায় গুঁতোগুঁতি করা অপেক্ষা স্বতন্ত্র হওয়া ভাল মনে করিয়া এইরূপ করিতে সকলে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র ঠিক আছে। সকলেই আমবা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, সাম্প্রদায়িকতা মহাপাপ! পূর্ব্বকার লোকেরা বিশেষ বিশেষ মতভেদ বশতঃ আপনাপন বিশ্বাস সংস্কার অনুসারে সত্যরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র দল বাঁধিত, আমাদের মধ্যে মতের একত্ব আছে, মূলতঃ কোন বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না, কেবল আত্মকর্ত্তৃত্ব পদমর্য্যাদা প্রভুত্ব এই সকল লইয়া দলাদলি হইতেছে। সেল্‌ফ আর প্রাউড্‌ ইন্‌ডিভিজুয়েলিটীতেই সর্ব্বনাশটা হইল। এমন আত্মাভিমান অহঙ্কার আর কোন সমাজে আপনি দেখিতে পাইবেন না।

এ কথায় বিকটের মনের আগুন দ্বিগুণ জলিয়া উঠিল। সে বলিল, "মহাশয়, বাস্তবিক দাদা বাবু যা বলিলেন ঠিক কথা। "সেল্‌ফ" থাকিতে, এবং কল্যকার জন্য ভাবনা থাকিতে কিছু হবে না আপনাকে আমি লিখে দিতে পারি। বৈরাগ্য না হইলে কি ধর্ম্ম হয়? হায়! এ অনিত্য সংসারে কেউ কারো নয়। এক জনের যদি স্ত্রী অভাবে বংশ লোপ হয়, কেহ তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না। অহঙ্কারের যেন সব অবতার। সত্য সত্য যদি ধরেন, নববিধানের সামঞ্জস্যের মত প্রথমে "মাই হাম্বল সেল্‌ফ হইতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু কে তা মানবে?

বা। সে কি প্রকার?

বি। আমার কাছেত কোন দলাদলি নাই! এঁরা সব ঘরে ঘরে বিবাদ করেন, কেহ কারো সঙ্গে মিশিতে চাহেন না; আমি হিন্দু খৃীষ্টান মুসলমান বৌদ্ধ জৈন ব্রাহ্ম সকলের বাড়ী যাই, বসি, তাদের সঙ্গে খাই, আমোদ

করি, সকলে যথেষ্ট ভালও বাসে। আহারের বিষয়েও আমি সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছি। হিন্দুর সুখতনি, মুসলমানের গরু ভাজা গরুর ঝোল, খ্রীষ্টানের মুর্গী শূওর মেষ ছাগ ইত্যাদি সবই খেতে পারি। আবার শুধু নিরামিষ? দুধ ঘি একটু বেশী থাকলে তাও বেশ খেতে পারি। কিছুতেই আমার গোঁড়ামি নাই।

স। আন্‌প্রিন্সিপেল্‌ড ভ্যাগাবণ্ড! থাম্‌, আর বিদ্যেয় কাজ নাই।

বি। কেন? থামবই বা কি জন্য? আমার কি আর স্বাধীনতা নাই? মশায়, এঁরা উদার ভাবে খ্রীষ্টিয়ান হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমানদের সঙ্গে মিশিতে যান, তাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, অথচ ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে মুখ দেখাদেখি নাই, এই কি উদারতা? এ দিকে রোজ রোজ উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। কিন্তু চক্ষু খুলেই মার মার কাট কাট শব্দ। আমি মশায় স্পষ্টবক্তা। ওঁরা যখন শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলেন, আমি মনে মনে বলি, "নারদ, নারদ, নারদ।"

বা। যাউক, আর ও সব শুন্‌তে চাই না। নির্ব্বাণ সাধন তা হলে আপনাদের মধ্যে চলন নাই।

অনন্তর বাঞ্ছারাম পুনরায় একবার সন্তানকোলে চপলার সেই রূপটী দর্শন মানসে সঙ্কটকে বলিলেন, "আপনার সহধর্ম্মিণী কি এখানে আসবেন? তাঁহার ক্রোড়স্থ সেই শিশু সন্তানটী বড় সুন্দর।" বাঞ্ছারামের কথা শেষ হইতে না হইতে বিকট বলিল, "আপনি মিসেস গাঙ্গুলীকে দেখিতে চান? আচ্ছা আমি ডাকিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি সে সময়ে বাঞ্ছারামের একেশ্বরবাদের দিকে একটু মতি ফিরিয়াছিল। কিন্তু তাহা এক প্রকার অজ্ঞেয়তাবাদেরই নামান্তর, বিশ্বাস ভক্তির সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব নাই।

সঙ্কটাচরণের নিকট বাঞ্ছারামের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না, লাভের মধ্যে ব্রাহ্মদের প্রতি তাঁহার কিছু অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। সঙ্কট সঙ্কটে পড়িয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন; তিনি জাতিও বজায় রাখিবেন, সাহেবীআনাও করিবেন, আবার ব্রাহ্মসমাজও চালাইবেন, কাজেই তাঁর নিকট নিগূঢ় তত্ত্ব

অবগত হইবার আর প্রত্যাশা কিরূপে করা যায়। মুরব্বি এবং টাকার যোগাড় থাকিলে এত দিন হিন্দুদলে মিশিয়া যাইতেন। বিবাহের অনুরোধে ব্রাহ্ম হওয়া, সাধন ভজনের খবর কে রাখে? পরে সপুত্র মিসেস্ গাঙ্গুলী সভাস্থ হইলে বাঞ্ছারাম তাঁহার আপাদ মস্তক বিজ্ঞানদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাহা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে চলিয়া গেলেন।

যাইবার সময় বিকট তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিবার জন্য সঙ্গে গমন করিতেছিল। সঙ্গে যাওটা তাহার নিতান্ত স্বার্থহীন নয়। সে জানিত, সন্তোষিণী বিধবা এবং নিশানাথ বাবু তাহার বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। তদ্বিষয়ে সে বাঞ্ছারামের নিকট উমেদারি করিতেছিল এবং নিজের কোয়ালিফিকেসেনের বর্ণনা করিয়া পাছে পাছে যাইতেছিল। এমন সময় চারি পাঁচ জন লাঠীহাতে, মুখে ফেটাবাঁধা দস্যুবৎ আকার লোক আসিয়া তাহাকে ধরিল এবং মারিতে মারিতে খৃষ্টিয়ান পল্লীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। প্রহারের ধমকে বিকটের হ্যাট উড়িয়া গেল, ছেঁড়া পচা প্যাণ্টেলুন টুকরা টুকরা হইল, মুখের চুরট খসিয়া পড়িল। পরিশেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর লাঠিয়ালদিগের হস্ত ছাড়াইয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে পোঁ পোঁ শব্দে ছুটিয়া পলাইল। পলাইবার কালে একটা শেয়াকুলের কাঁটার ঝোপে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, এ দিকে পাছে পাছে গুণ্ডার দল ছুটিতেছে; বিকট উপস্থিত বুদ্ধির প্রভাবে অঙ্গের সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন আবরণটী খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া কেবল দেহখানি মাত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। কাঁটা ছাড়াইতে গেলে হাড় কয় খানা আর সে দিন রক্ষা পাইত না। তার পর এক জন বলবান্ ষণ্ডা মহাবেগে দৌড়িয়া আসিয়া তাহার কান টানিয়া ধরিল। কিন্তু বিকট এত বেগে ছুটিতেছিল যে কর্ণধারের হাতের কান হাতেই রহিয়া গেল, সে এক-কর্ণ হইয়া আত্মরক্ষা করিল। সৌভাগ্যক্রমে বাঞ্ছারামের গায়ে কোন আঘাত লাগে নাই, তিনি নিরাপদে গৃহে পৌঁছিলেন। বিকটের ও রূপ দুর্দ্দশার কারণ আর কিছুই নয়, তিনি খৃষ্টিয়ান পল্লীতে সে দিন মুর্গী ক্রয় করিতে যান, গিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই, বিনা পয়সায় চারিটী মুর্গী ক্রয় করিয়া বাড়ী আনিলেন। দাদার নিকট যে মূল্য পাইয়াছিলেন তাহা

আত্মসাৎ করিলেন। এই জন্য কয়েকটী খ্রীষ্টিয়ান যুবক তাঁহার ঐরূপ বিড়ম্বনা করে। এরূপ ঘটনা তাঁহার অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটিত, এটা নূতন নয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাষাণে অঙ্কুর।

যুবা প্রকৃতিবশতঃ এবং পারিবারিক দুর্ঘটনায় বাঞ্ছারামের চিত্তে পর্য্যায়-ক্রমে অনেক প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি বড় ভাগ্যবান্ ছিলেন। যদিও বয়োধর্ম্মপ্রভাবে কখনো অদ্বৈতবাদে, কখনো জড়বাদের অমীমাংসিত আবর্ত্তমধ্যে পড়িয়া একবার এ সীমায় আর একবার তদ্বিপরীত সীমায় চলিয়া যাইতেন, তথাপি তাঁহার মনের সাম্য কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই। সেই জন্য চরিত্রটী বরাবর বেশ নির্ম্মল শুদ্ধ ছিল। কাহারো উপকার করিতে পারুন না পারুন, অনিষ্ট কোন দিন কাহারো করেন নাই। দাম্পত্য প্রেম বা পারিবারিক সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াও কখনো নৈরাশ্যে পড়েন নাই, এবং ক্ষতি পূরণের জন্য পাপ পথেও কখনো যান নাই। তত্ত্বপিপাসু হইয়া একাগ্র চিত্তে যেমন একটী একটী বিশেষ জ্ঞানের পথে বেগে ধাবিত হইতেন, তেমনি তাহা হইতে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নির্ব্বাণের অনন্ত শান্তির ভিতরে প্রবেশ করিতেন। ফলতঃ নির্ব্বাণ সাধনের পক্ষে তাঁহার স্বভাব চির দিন অনুকূল ছিল। নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্পমনা হইয়া অনেক ক্ষণ তিনি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতে পারিতেন। প্রতিকূল অবস্থার ভীষণ তুফানের মধ্যেও এই ভাবটী তাঁর অবিচলিত ছিল। বৈজ্ঞানিক মত বিশ্বাস পরিবর্ত্তন ও গঠন সম্বন্ধে যে সাধারণ নিয়ম মনোজগতে প্রচলিত আছে, তদনুসারে যথা-ক্রমে যথানিয়মে বাঞ্ছারাম তত্ত্বরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরস্পরবিরোধী মতের ভিতরে ভ্রমণ করেন। প্রথমে ব্যক্তিত্ববিহীন নির্গুণ শক্তিবাদ বা

আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ, তাহার পর অনাত্মবাদ বা জড়াদ্বৈতবাদ, তদনন্তর বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্ব্বাণতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরিশেষে অজ্ঞাতসারে তিনি পৌত্তলিকতা ও নরপূজার রাজ্যে উপনীত হন। ইয়োরোপের আধুনিক এগ্‌নষ্টিক্ মত, সংশয়বাদ আলোচনার পর বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্ব্বাণ, কঠোর নীতি, অহিংসা এবং দয়াশীলতার প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আগষ্ট কোমতের নারীপূজা বা মনুষ্যত্বের উপাসনা উপরিউক্ত মতেরই অবশ্যাম্ভাবী শেষ ফল তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহার কিছু পূর্ব্বে কয়েক দিনের জন্য বাঞ্ছারাম পণ্ডিত একবার থিয়সফিষ্ট হন। লম্বা চুল রাখিয়া যাগযজ্ঞ স্বস্ত্যয়ন হোম করিতেন, ভূত প্রেত নামাইতেন, জলপড়া খাইতেন, করকোষ্ঠী গণাইতেন, দৃশ্য বস্তুর পরিবর্ত্তে অদৃশ্য শক্তির অদ্ভুত অলৌকিক মহিমা ভাবিতেন। আর যত রাজ্যের ভূতের ওঝা দৈবজ্ঞ অদৃষ্টবাদজ্ঞ প্রভৃতি বুজরুকদিগকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিতেন। এক্ষণে তিনি কার্য্যতঃ জড়বাদী হইয়া নরপূজার সোপানে আরোহণ করিলেন।

কিন্তু এই পথে আসিয়া বাঞ্ছারাম মনুষ্যকে, বিশেষতঃ নারীজাতিকে সম্মান আদর এবং প্রীতি করিতে শিখিলেন। ইহার প্রভাবে সন্তোষিণীর প্রতি তাঁহার স্নেহ ভালবাসা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নারীপ্রকৃতির মাধুর্য্য রসের অজেয় মোহিনী শক্তি স্বর্গের দেবতাদিগকেও বশীভূত করে। কি ঊর্দ্ধরেতা বিরক্ত বৈরাগী বনচারী সন্ন্যাসী, কি নরশোণিতলোলুপ নির্দ্দয় স্বভাব সৈনিক পুরুষ, কি শৈলকন্দরবাসী অসভ্য নাগা ভিল কুকা গারো, কি মুণ্ডিতমস্তক তিলকধারী অর্দ্ধ উলঙ্গ বৈষ্ণব বাবজী; কানা বোবা হাবা কালা বৃদ্ধ পঙ্গু হেঙ্গলা কাঙ্গাল। পাগলা টিকিমাথায় নামাবলীগায়ে ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত রমণীর রমণীয় কোমল কান্তির এবং মধুর স্বভাবের প্রভাব ইহারা কেহই অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে। মহাজ্ঞানী সংশয়বাদী জন ষ্টুয়াট্‌ মিলের কুতর্কদূষিত মনও নারীসংসর্গে শেষ এমনি ভাবুক প্রেমিক হইয়াছিল যে, তিনি স্ত্রীর সমাধিভূমির পার্শ্বে এক কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক বর্ষকাল তথায় অবস্থান করেন। তবে বাঞ্ছারাম একা কেন সে রসে বঞ্চিত থাকিবেন? তাঁহার বিস্তীর্ণ মরুভূমি তুল্য হৃদয়ের

দূরে দূরে যেন এক একটী ফুল ফুটিতে লাগিল। অগ্রে তিনি সন্তোষিণীর বিষয়ে তত ভাবিতেন না, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতেন না, এক্ষণে তাহার সঙ্গে মিশিয়া স্ত্রীপ্রকৃতির বিশেষ তত্ত্ব অধ্যয়নে তাঁহার স্পৃহা জন্মিল। ক্রমে দয়া মায়া একটু বেশী হইল। কোন রূপে তাহার একটু সেবা করিতে পারিলে যেন তিনি আপনাকে এখন কৃতার্থ বোধ করেন।

কিন্তু সন্তোষিণীর হৃদয়ের শূন্যতা তবু ইহাতে পূর্ণ হয় না, কেমন যেন ফাঁক ফাঁক লাগে, প্রাণ হু হু করে। কেমন এক প্রকার অনির্দ্দিষ্ট অসুখের তীব্র তাপ অন্তরে দিবা নিশি জ্বলিতে থাকে। যে প্রেমাস্পদের চরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সে চক্ষের সম্মুখে, পুনঃ পুনঃ তদীয় বিমল কান্তি প্রসন্নানন সন্দর্শনে নয়ন তৃপ্ত হইতেছে, তাঁহার সুমধুর সুধাসিক্ত বচনাবলী কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তথাপি হৃদয়ের জ্বালা দূর হয় না।

অজানিত মহাসমুদ্রপথে নাবিক কলম্বস্ যেমন বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া জাহাজ চালাইয়াছিলেন, সন্তোষিণী আন্তরিক দুর্জ্জয় প্রেমের উত্তেজনায় উৎসাহী হইয়া আশাকে অবলম্বনপূর্ব্বক তেমনি এই অপরিচিত প্রেম-পথে ক্রমে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথহারা হইয়াও কখনো পশ্চাদ্গমন করেন নাই। এত দিন যেরূপ সাধারণ ভাবে বাঞ্ছা-রামের সেবা করিয়া প্রেমপিপাসা চরিতার্থ করিতেছিলেন, তাহাতে আর আশা মিটিল না। কাল সহকারে ভালবাসা যত প্রগাঢ় হইতে লাগিল, সেবার ভাব তত প্রবল হইয়া উঠিল। কোন দিন কোন সুরসাল উপা-দেয় মিষ্টান্ন পক্কান্ন প্রস্তুত করিয়া দিতেন, কোন দিন টেবিলের উপর ভাল ভাল সুন্দর পুষ্পের স্তবক প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, কখন বা সদ্যোজাত কুসুমের সুচিক্কণ মালা গাঁথিয়া তাঁহার করে অর্পণ করিতেন। এক দিন গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বাঞ্ছারাম ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পুস্তক পড়িতে পড়িতে নিদ্রাগত হন, সেই সময় সন্তোষিণী পরিহাসচ্ছলে একটু ঠাণ্ডা জল তাঁহার গায়ে ছিটাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে পণ্ডিতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল বটে, কিন্তু প্রেমানভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানের ঘোর ভাঙ্গিল না, তিনি মনে করিলেন বুঝি দৈবাৎ কিরূপে সন্তোষিণীর হাত হইতে জল আসিয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতকে নিতান্ত সত্যযুগের লোক মনে

করিয়া পরে আর তিনি তামাসা করিতে বড় সাহসী হইতেন না। নতুবা এরূপ হাঁদাগোচের লোকের সঙ্গে অনেক প্রকার আমোদ পরিহাস চলিতে পারিত। দিবাভাগে কখন তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন হইলে সন্তোষিণী আস্তে আস্তে মুখের উপর পাখার বাতাস করিতেন এবং মাছি তাড়াইয়া দিতেন। রাত্রি-কালে ঘুমাইয়া পড়িলে মশারি খাটাইয়া দিতেন। যাহাতে তিনি সুখে পান ভোজন করেন, আরামে নিদ্রা যান; তাঁহার গৃহটী যাহাতে সুপরিষ্কৃত, এবং পরিচ্ছদাদি শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে তজ্জন্য সন্তোষিণীর ঐকান্তিক যত্ন পূর্ব্বেও ছিল, এক্ষণে আরো অধিকতর রূপে তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। কি যে তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য, বাঞ্ছারাম হইতে যে তাঁহার কি উপকার সাধিত হইবে, তাহা পরিষ্কার রূপে কিছুই বুঝিতেন না; ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা, অথচ সেই অন্ধকার বড় লোভের সামগ্রী; অপ্রস্ফুটিত আশার অনিশ্চয়তার মধ্যে যেন কত কি সুখরত্ন তিনি পাইবেন, ইহাই মনে হইত। মূল কথা সন্তোষিণীর প্রাণের ভিতর একটা কি বন্য পেমাশক্তি প্রবেশ করিয়াছিল। সেটা কি, তার বাড়ী কোথা, নাম কি, তার আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ, কি সে চায়, এ সকল বিষয়ের পরিচয় দিয়াত সে আসে নাই, সময়ে যখন নিজ-মূর্ত্তি ধরিবে তখন বুঝা যাইবে; এখন কেবল যেন গোলোক ধাঁধার আঁধা-রের মধ্যে ফেলিয়া অনাথা কুলবালাকে ঘুরাইতেছে, যেন তাহার স্কন্ধে অপদেবতা চাপিয়া বসিয়াছে। তাই সে ইচ্ছা করে যে এক বার বাঞ্ছা-রামের কাছে বসি এবং গল্প করি, তাঁহাকে আদর করিয়া নানা সামগ্রী খাইতে দিই, তাঁর গায়ে একটু পাখার বাতাস করি, নির্জ্জনে দুই জনে বেড়াই, হৃদয় খুলিয়া মনের সুখ দুঃখের কথা কই, এবং কান ভরিয়া তাহা শুনি। হৃদয়ে যত ভালবাসা আছে,—ইচ্ছা রুচি উদ্যম অনুরাগ হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতিকে তাহার দাস করিয়া দিবা নিশি তাহাদিকে প্রিয়তমের সেবায় নিযুক্ত রাখি এই কেবল তাহার কামনা। রসগ্রাহী ভাবুক প্রেমিক কবিগণ অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, জননী যেমন সন্তানকে স্তন্যপান করাইবার জন্য ব্যাকুল হয়,সন্তোষিণী বাঞ্ছারামের হৃদয়ে নিজহৃদয়ের উদ্বেলিত প্রেমা-বেগ ঢালিয়া দিবার জন্য তেমনি অস্থির হইয়াছে। অথবা দেবপ্রতিমা-ভক্তগণ যেরূপ আপনাদের বিগ্রহ ঠাকুরের স্নান পূজা ভোগ বৈকালি

আরতি মহোৎসব অনুরাগ ইত্যাদির জন্য সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত, কিরূপে নিত্য নব নব ভাবে স্বীয় ইষ্টদেবের তুষ্টিসাধন করিবে এই যেমন তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, সন্তোষিণী ঠিক সেই ভাবে বাঞ্ছারামের নিত্য সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

তাঁহার ঈদৃশ সেবা সৌজন্য প্রীতিকর ব্যবহারে বাঞ্ছারামও মনে মনে অবশ্য তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইতেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয় স্নেহরসে গলিয়া যাইত, সে ভাব বাহিরে সমস্ত প্রকাশিত না হউক, কিন্তু আকার ইঙ্গিতে, কথার সুরে অনেকটা বাহির হইয়াও পড়িত। ইহা কি এক আশ্চর্য্য গভীর রহস্য! এক জনের অকৃত্রিম ভালবাসা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অপ-রের হৃদয়ে অলক্ষিত ভাবে কেমন অল্পে অল্পে স্বীয় অধিকার বিস্তার করে। দুইটী প্রকাণ্ড স্রোতস্বতী মহাবেগে স্বতন্ত্র গতিতে চলিতেছে, তাহার মধ্যে এক খণ্ড ভূমি ব্যবধান। একটী নদীর গতি,—সমগ্র গতি সেই ভূমি ভেদ করিয়া অপরটীর সঙ্গে মিশিবার জন্য যাইতেছে। ক্রমে ব্যবধান ভূমির প্রস্তর কঙ্কর কঠিন মৃত্তিকার ভিতর স্রোত প্রবেশ করিল, বাঁধ ভাঙ্গিবার আর বড় অধিক বিলম্ব নাই। অল্প ক্ষণের মধ্যে দুয়ে একা-কার হইবে। এক দিকের প্রবল স্রোতের টানে অন্য দিকের গতি এখন যেন কতকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, ক্রমে ফিরিয়া এই দিকেই আসিবে। মানবমনের কার্য্যের গতি কি সূক্ষ্ম! কি আশ্চর্য্য অদ্ভুত!

নবম পরিচ্ছেদ।

বিপদে বন্ধুতা।

বৈজ্ঞানিক জীবনে নির্ব্বাণজনিত শান্তিরসের ভিতরে অজ্ঞাতসারে যখন প্রেমরস সংক্রামিত হইল, তখন বাঞ্ছারামকে তদ্দ্বারা কিছু ভাবান্তরিত এবং রূপান্তরিত করিয়া তুলিল। দুইটী রসের সংযোগে মানবমনে এক অনির্ব্ব-চনীয় সুখরস সমুৎপন্ন হয়। যেন অম্লমধু মিশ্রিত সুধারস। ভবিষ্যৎ

সর্ব্বাঙ্গীন জীবন গঠনের পক্ষে এই দুইটী প্রধান উপাদান। ইহার সমবায়ে জ্ঞানে ভাব, শান্তিতে মত্ততা ও উদ্যম, এবং গদ্যে কবিত্ব রস সঞ্চারিত হয়। যেন স্থির ধীর গভীর অতল জলধির প্রশান্ত হৃদয়ে ক্ষুদ্র বিচিমালা মৃদুমন্দ মারুত হিল্লোলে ক্রীড়া করিতে থাকে। নীরস দুর্ভেদ্য শৈলবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যেন সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল বারিধারা বহিয়া যায়। নারীস্বভাবের মধুরতায় বাঞ্ছারামের জীবন যখন কিছু মিষ্ট হইয়া উঠিল, তখন তিনি পৃথিবীর সেবায় উৎসাহী হইলেন। জনসমাজের হিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিলেন। ভাল-বাসা এবং সেবা এ দুইটী এক সূত্রে সম্বদ্ধ। নির্গুণ শক্তিবাদে যত দিন বিশ্বাস থাকে ততদিন মানুষের সংসর্গ ভাল লাগে না, কাহারো উপকার বা সেবায় প্রবৃত্তি জন্মে না, কেবল চুপ করিয়া একা নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেই ইচ্ছা হয়। পরে যখন সগুণ পুরুষের লীলারস কিঞ্চিৎ হৃদয়ে প্রবেশ করে, পৃথিবীতে অন্ততঃ একটী ব্যক্তির সঙ্গেও আন্তরিক প্রেমমিলন হয়, তখন প্রাণের টানে মনের অনুরাগে লোকে কতই না খাটে! এই অবস্থায় সাধারণ সেবার ভাবও হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে।

এই সময় নিশানাথের পত্নী গয়া কাশী প্রয়াগ শ্রীবৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনের জন্য অতিশয় ব্যাকুলিত হন। সন্তানহীনা বন্ধ্যা নারীর পক্ষে শেষ বয়সে তীর্থদর্শন ভিন্ন আর অন্য সুখকর কার্য্য কি আছে? তাঁহার অনু-রোধে নিশানাথকেও কিছু দিনের নিমিত্ত বিদেশগামী হইতে হইল। ভাগিনেয় বাঞ্ছারাম উপযুক্ত বিদ্বান্ এবং বিশ্বাসী যুবা, তাঁহার হস্তে বাড়ীর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তিনি সস্ত্রীক ভ্রমণে বাহির হইলেন। বাড়ীতে একটী বৃদ্ধা কুটুম্বিনী ছিল, সন্তোষিণীর ভার তাহার হস্তে দিয়া গেলেন।

বাঞ্ছারামের এখন কাজ কর্ম্মে রুচি জন্মিয়াছে, সুতরাং মাতুলপ্রদত্ত এই ভার তিনি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলেন। এই সব বিষয় কার্য্য দেখি-তেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের হিতকর বিবিধ সৎকার্য্য করিতেন। সেবাপ্রবৃত্তি বিকসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা চরিতার্থেরও বেশ সুযোগ ঘটিয়া গেল। এখন আর বাঞ্ছারাম পুস্তকের কীট নহেন, জড়ভরতের মত একা একটী ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবেন না, কিন্তু বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। কখনো দরিদ্রদিগের জন্য দাতব্য ভাণ্ডারের সৃষ্টি,

কখনো স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যত্ন। যেখানে যে কেহ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, বাঞ্ছারাম তাহার পৃষ্ঠপূরক হন। গ্রামের রাস্তা ঘাট জলাশয় পরিষ্কার, স্বাস্থ্য বিধান, নৈশবিদ্যালয় চিকিৎসালয় স্থাপন, পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ, সুরাপান দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন ইত্যাদি যাবতীয় সদনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতে লাগিলেন। নিশানাথের এ সকল কার্য্যে বিশেষ অনুরাগ, উৎসাহ ছিল; ইহাতে তিনি বাক্যব্যয় করিতেন না, কিন্তু অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম করিতেন। তদ্দৃষ্টান্তে বাঞ্ছারাম নির্ভয়ে মাতুলের অর্থব্যয়ে এবং নিজের পরিশ্রম ও বিদ্যা ক্ষমতার প্রভাবে এই সব কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে হিন্দু খৃষ্টীয়ান ব্রাহ্ম সকল দলেরই তিনি প্রিয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন।

একদা বর্ষা কালের প্রারম্ভে আষাঢ় মাসে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে, আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নাই, দুঃসহ রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপে নদী পুষ্করিণী খাল বিল সব যেন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল, চাসারা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে, মহা ভাবনায় নীলকুঠীয়ালের মাথা ঘুরিতেছে, ক্ষেত্রের শস্যতৃণ জলাভাবে মৃত প্রায়, এমন সময় আবার গ্রামের মধ্যে ওলাউঠা দেখা দিল। বিপদ একাকী কোথাও যাইতে ভাল বাসে না। অনাবৃষ্টি ওলাউঠাকে ডাকিয়া আনিল। জমিদার বাবুদের নিয়োজিত এক জন নেটিভ ডাক্তার তথায় ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে বাঞ্ছারাম চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। নিজেও হোমিওপাথির বাক্স লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। পানীয় জলে কর্পূর, পরিধেয় বসনে বিছানায় যেখানে সেখানে কর্পূর ছড়াইলেন। কিন্তু এমনি সে বিষম ওলাউঠা যে কিছুতেই তাহার বেগ থামিল না, প্রতি দিন পাঁচ সাত দশ জন করিয়া লোক মরিতে লাগিল। প্রাণের ভয়ে হরিসভার হিন্দুরা সঙ্কীর্ত্তন বাহির করিল, খৃষ্টীয়ানেরা গির্জ্জায় গিয়া বাইবেল পড়িল, ব্রাহ্মেরা লম্বা প্রার্থনা ধরিয়া দিল, কিন্তু ওলাউঠা তাহা মানিল না। ঘরে ঘরে হাহাকার রব; কে কোথায় মরে, কে কাহাকে সৎকার করে, কে কার সংবাদ লয়, সব একবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ভিন্ন গ্রামে যাহাদের কুটুম্ব ছিল তাহারা চাটী বাটী ফেলিয়া পলাইল। তাহাতেই কি নিস্তার

পাইল? পলাইতে পলাইতে পথের মধ্যে কোনটাকে ওলাউঠায় ধরিয়া ফেলিল। কেহ চিকিৎসা পথ্যের অভাবে ঘরে মরিয়া রহিল। যুবা বৃদ্ধ নর নারী বালক বালিকা হুতাশে প্রাণ হারাইল। কোন গৃহে মৃতা জননীর বক্ষে ক্ষুদ্র শিশু গতাগু প্রায়, কোথাও বৃদ্ধা নারী ছিন্নকন্থাবৃত হইয়া মরিয়া আছে। প্রাণের ভয়ে লোক সব হতবুদ্ধি হইল। পেট ভরিয়া ডাল ভাত ইলিস মাচ খাইলে ওলাউঠায় ধরে, আবার আধপেটা খাইলে বা খালিপেটে থাকিলেও তাই। কেবল কাঁচকলা ভাজা, মোচা পোড় ডুমুরঘণ্ট প্রভৃতি যে সকল বস্তু খাইলে পেট আঁটিয়া যায় তাই লোকে খাইতে লাগিল। কিন্তু ওলাউঠার রোগ যেন বানের জল, কোন্ দিক দিয়া কার উদরে কখন প্রবেশ করে কেহ তাহা বুঝিতে পারে না; জল বাতাসের মধ্য দিয়া তাহার গতিবিধি। কেহ ঊর্দ্ধমুখী হইয়া, গালে হাত দিয়া, প্রাণপণে সুর চড়াইয়া কীর্ত্তনে হরিনাম গাইতেছিল, সেই সময় তাহার পেট কোঁ কোঁ কল কল করিয়া ডাকিয়া উঠিল। বাহিরে যাইবারও আর তার সময় রহিল না। কেহ ঘাটে শব ফেলিয়া বাড়ী আসিয়া নিমপাতা খাইয়া মাত্র বসিয়াছে, অমনি তাহার এক দাস্ত ভেদ হইল। জীবিতেরা হরিবোল বলিয়া মৃতের সৎকার করিয়া আসে, আবার তাহারাই মৃত হয়। দিবসে ঘরে ঢুকিয়া শেয়াল কুকুরে মড়া লইয়া ছেঁড়া ছিঁড়ি করিতে লাগিল। তাহাদের রোগও নাই, শোকও নাই, ওলাউঠার রোগী খাইয়া তাহারা হৃষ্ট পুষ্ট হয়। মাংসাশী জীব জন্তু পশু পক্ষীগণ নরমাংস ভোজনে এত দূর লালায়িত হইয়া পড়িয়াছে যে অর্দ্ধজীবিত রোগীকে ধরিয়া টানাটানি করে, ঘুমন্ত মানুষকে মৃত মনে করিয়া খাইতে যায়। এমনি হইল যে দিনের বেলায় ঘরের বাহির হওয়া যায় না, কালের ভীষণ অন্ধকারে যেন চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিল। মরিবার লোকই প্রায় সব, চিকিৎসা বা সেবা করিবার কেহ নাই; কাঁদিবারও কেহ নাই। যাহারা ছিল ভয়ে তাদের চক্ষের জল ক্রমে শুকাইয়া গেল, ভাবনায় জীবন্ত মনুষ্য ভূতের মত কঙ্কালসার হইল। মৃতদেহের পূতিগন্ধে, হরিনামের ভীষণ রোলে, শোকার্ত্তের ক্রন্দনে, শৃগাল কুকুরের বিকট স্বরে, কাক শকুনির চীৎকার কোলাহলে গ্রামটী যেন ঘোর শ্মশান ভূমির ন্যায় হইয়া উঠিল। কতক লোক পলাইল, অধিকাংশ মরিয়া গেল, অবশিষ্টেরা নীরবে এক একটী করিয়া

কৃতান্তের করালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বা পাঁচ সাত দিন শয্যাগত হইয়া জ্বরাতিসারে ভুগিল; তাহারা মরিতে চায়, তথাপি মরণ হয় না।

বাঞ্ছারাম যত দূর পারিলেন বিপন্ন লোকদিগের সেবা করিলেন, শেষে আর কুলাইয়া উঠিল না; ওলাউঠার মহা প্লাবনে গ্রাম ভাসিয়া এবং ডুবিয়া গেল। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া সন্তোষিণী মনে মনে বড় ভীতা হইলেন। বাড়ীর চাকর চাকরাণী আমলা দরোয়ান কতক পূর্ব্বেই মরিয়া পড়িয়াছিল যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা বাঞ্ছারামকে বাড়ী বন্ধ করিয়া স্থানান্তর চলিয়া যাই-বার পরামর্শ দিল। তখনও যে সকল লোক গ্রামে আছে, তাহারা বাঞ্ছা-রামের মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছে; তিনি যদি প্রস্থান করেন, তাহা হইলে ভয়ে নিরাশায় তাহারা মরিয়া যাইবে। ইহা বুঝিয়াই তিনি তাদৃশ মহা-মারীর মধ্যেও পড়িয়া রহিয়াছেন। যদি মৃত্যুও হয় তথাপি তিনি গ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা। দুই এক জন ঝি চাকর রহিল আর সব না বলিয়া চলিয়া গেল।

প্রকৃতিদেবী যেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কুম্ভক সাধনে বসিয়াছেন। ক্রমে গ্রীষ্ম ঘনীভূত হইয়া বায়ু চলাচলের পথ একবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। জলে ব্যাঙাচি, ডাঙ্গায় বিছে সাপ; দিবসে মাছির ভ্যান ভ্যানানি, চড়ুই পাখীর তীব্র চীৎকার রব, রাত্রে মশা ছারপোকার দৌরাত্ম্য, আলো দেখিলে গাঁদি পোকা আরশুলা উড়িয়া গায়ে পড়ে। ঘামাচিতে সর্ব্বাঙ্গ খচিত। বাহিরে বসিলে মশায় খায়, মশারির ভিতর শয়ন করিলে সর্ব্বশরীর ঘামে ভিজিয়া উঠে। ক্ষুধা নিদ্রা বন্ধ। কেহ ছাদে, কেহ পথে, কেহ মাঠে ছুটা ছুটি আরম্ভ করিল। যিনি চড়কের ঢাকে কাটি পড়িতে না পড়িতে চাদর-খানি গুটলি পাকাইয়া বগলে রাখেন, কটির বসন নামাইয়া হাঁটুর কাপড় তুলিয়া হাতে পাখা ধরিয়া সং সাজেন, তিনি প্রিমিটিভ্ অর্থাৎ আদিমাব-স্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গ্রীষ্মের জ্বালায় প্রাণ আর বাঁচে না, দিন রাত্রি সমান, তাপমান যন্ত্রে এক শত দশ ডিগ্রীর উপর উত্তাপ উঠিয়াছে। বাতাস যেন অগ্নির সমুদ্রবিশেষ। কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল শীঘ্র শীঘ্র যমের বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করে। দুঃসহ গ্রীষ্মতাপে পাগলের মত হইয়া

লোকেরা গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিতে লাগিল। স্থূল শরীরধারী ব্যক্তিরা ভঁহিষের মত পেটে বুকে কাদা মাখিয়া জলে ডুবিয়া বসিয়া থাকে, কেহ সরবৎ খায়, কেহ ভিজা কাপড় গায়ে জড়ায়, কেহ বরফ খুঁজিয়া বেড়ায়, বহুমূত্রের রোগীদের আরো কষ্ট; গায়ের জ্বালায় তাহারা ঠাণ্ডা মেঝের উপর কুষ্মাণ্ডের ন্যায় গড়াগড়ি দেয়। জলপানে তৃষ্ণা ভাঙ্গে না, ভোজনে পেট ভরে না, নিদ্রায় দেহের আবল্য যায় না; বাপ রে, মা রে, প্রাণ গেল রে, সকলের মুখে কেবল এই শব্দ। মহা উত্তাপে মাথার খুলির যোড়ের মুখ দিয়া যেন মস্তিষ্ক গলিয়া গলিয়া বাহির হইতে লাগিল। লিখিতে কিম্বা পড়িতে বসিলে দরদরিত ধারে গায়ে ঘাম ছুটে, বিছানায় শুইলে প্রতি লোমকূপে পয়ঃপ্রণালী বহিতে থাকে।

এইরূপে লোক সকল অস্থির হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় এক দিন মধ্যাহ্ন কালে আকাশে ধূষর বর্ণ ধূম্রাকার মেঘ সঞ্চিত হইল, ক্রমে তাহা অনন্ত গগন ছাইয়া ফেলিল, বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশটা খানিক দূর নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু গাছের পাতাটী নড়িতেছে না, নিস্তব্ধ আকাশ রাগভরে গম্ হইয়া আছে, ভাব গতি দেখিলে ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়।

এত দিন বাঞ্ছারামের বাড়ীতে ওলাউঠা প্রবেশ করে নাই, কেবল বৃদ্ধা কুটুম্বিনীকে দয়া করিয়া সে শমনভবনে লইয়া গিয়াছিল। আজ আহারের পর সন্তোষিণী এক বার বোমি করিলেন, দুই বার দাস্ত হইল। দুই দাস্তেই তাঁহার নাড়ী বসিয়া গেল, হাতে পায়ে খাল ধরিল, জলপিপাসায় গাত্রদাহে প্রাণ ফাটিতে লাগিল। বাঞ্ছারামের প্রকৃতির এমনি গঠন, সহজে তাঁহার চিত্তে বড় একটা উদ্বেগ উত্তেজনা হয় না, কোন প্রকার ভাবাতিশয্যে যে তাঁহাকে চঞ্চল ব্যাকুল করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। শান্ত গম্ভীর ভাবে তিনি সন্তোষিণীর চিকিৎসা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পীড়া ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল।

এ দিকে বেলা যত শেষ হইয়া আসিল, মেঘ তত ঘনতর হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, এবং তৎসঙ্গে ঝড় উঠিল। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধারে মেঘের আঁধার মিশিয়া ভূতল নভমণ্ডল অন্তরীক্ষ সব

একাকার হইয়া গেল। অনন্তর প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একে গ্রামে লোক কমিয়া গিয়াছে, বাড়ীর লোক জনও প্রায় সকলে পলায়ন করিয়াছে, রাত্রি হইয়া আসিল, বাঞ্ছারাম একাকী রোগশয্যায় বসিয়া রোগীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রাত্রির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বোঁ বোঁ গোঁ গোঁ শব্দে ঝড়, আর তাহার সঙ্গে ঝমাঝম্ বৃষ্টি; পুকুরে ভেকগণ, বাগানে পতঙ্গকুল মহাগীত আরম্ভ করিয়াছে, চতুর্দ্দিক হইতে শোঁ শোঁ গোঁ গোঁ শব্দ উঠিতেছে। মহাবীর প্রভঞ্জন রণমদে মত্ত হইয়া পৃথিবীকে যেন রসাতলে দিতে বসিয়াছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন মহীরুহ সকলকে কেশে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিতেছেন, আবার পদদলিত ক্ষুদ্র তৃণপত্র সকলকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া উচ্চ আকাশে তুলিয়া দিতেছেন। যেখানে বৃষ্টি প্রবেশের পথ ছিল না, সেখানে তিনি অগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। ঝড় বৃষ্টি উভয়ে মিলিয়া শেষ ভূপ্রাঙ্গণে গলা ধবাধরি করিয়া নাচিতে লাগিল, তাহাদের পদাঘাতে প্রাণিগণ আকুল হইল। পবন, তোমার যে কত লীলা তাহা কে বুঝিবে? যাহাকে কোলে নাচাও, ঘুম পাড়াও, কত আদর যত্ন কর, তাহারই আবার তুমি ঘাড় মুচড়াইয়া রক্ত চুষিয়া খাও। তোমাকে চেনা ভার। যেমন তুমি শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোক, তেমনি আবার রাক্ষস দানবের ন্যায় নিষ্ঠুর নির্দ্দয় অত্যাচারী, তোমাকে বিশ্বাস নাই।

বাড়ীতে একটী বুড় ঝি ছিল, বাঞ্ছারাম তাহাকে রোগীর কাছে বসিতে বলিলেন, সে বলিল, "বাবা, আমার গায়ে একটা লেপ চাপা দেও, আমি শীতে মরি। একটা হিন্দুস্থানী বেহারা ছিল, সে ডাক্তারের বাড়ী ঔষধ আনিতে গেল আর ফিরিল না। বাঞ্ছারাম মুমূর্ষুপ্রায় রোগীকে লইয়া সেই জনশূন্য বৃহৎ পুরীর মধ্যে একাকী জাগিতেছেন, নিকটে একটী হারিকেন্ লাণ্ঠন জলিতেছে। অন্ধকারের আর পারাপার নাই; গভীর অন্ধকারের উপর ঘন অন্ধকার, স্তরে স্তরে থরে থরে অন্ধকার, গাঢ় নিবিড় অনন্ত অন্ধকারে দশ দিক্ পরিপূর্ণ। ঝড়ের বেগের উপর ঝড়ের বেগ, প্রবল বৃষ্টিধারার উপর অজস্র বৃষ্টিধারা দলে দলে পালে পালে ছুটিতেছে। জনমানব নিকটে নাই, সন্তোষিণীর বাক্য বন্ধ, সর্ব্বশরীর হিমাঙ্গ, মধ্যে মধ্যে কেবল কাতর নয়নে এক এক বার তিনি বাঞ্ছারামের চিন্তাভারাক্রান্ত মুখের পানে

চাহিতেছেন। যাঁহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন, অন্তিম কালে মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সেই জীবনসখা উপবিষ্ট এই কেবল মনের সান্ত্বনা। তখন তাঁহার কেবল প্রেমানুরাগ টুকুই আছে, আর কিছু নাই। সেই প্রেম জ্যোতি-হীন ক্ষীণদৃষ্টির ভিতর দিয়া মেঘাবৃত অস্তমিত রবিকিরণের ন্যায় বাহির হইতেছিল। বাঞ্ছারাম কখনো তাহার ললাটে, কখনো বামহস্তে, কখনো বক্ষে করতল ন্যস্ত করিয়া ধাতু পরীক্ষা করিতেছেন। কখনো তাপমান যন্ত্র দ্বারা উত্তাপ দেখিতেছেন, কখন বা চক্ষের ক্লেদ মুছাইয়া মস্তকের বিক্ষিপ্ত কেশগুচ্ছ ললাট হইতে সরাইয়া দিতেছেন। সন্তোষিণীর কথা কহিবার শক্তি নাই, মর্ম্মের কথা মর্ম্মে মিলাইয়া যাইতেছে, কিন্তু হৃদয়ের অব্যক্ত ভালবাসা হৃদয়াধারে উথলিয়া উঠিতেছে। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন,—"পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকলের সেবাই মিষ্ট, কিন্তু প্রেমাস্পদের সেবা আরো মিষ্ট। আহা আমার তাপিত অঙ্গে প্রিয়তমের প্রেম-মাখা শীতল হস্তের সংস্পর্শ কি সন্তাপনাশক! এ অবস্থায় আমার মৃত্যু-তেও সুখ। এমন সুখের মরণ কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে?" এইরূপ ভাবিয়া সন্তোষিণী যেন আদরে গলিয়া শান্তির সাগরে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিলেন। বাহ্য লক্ষণ দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি মহা-নিদ্রায় মগ্ন হইতেছেন। বাঞ্ছারাম দেখিলেন, মানুষ মরে, কিন্তু প্রেম মরে না। মৃত্যুর অন্ধকারমধ্যে যেন প্রেমের বাতি তখনও জ্বলিতেছিল। তিনি যতটুকু স্নেহ ভালবাসা দিতে পারিতেন তৎসমুদায় এই অনাথিনী শরণা-গতার সেবায় অর্পণ করিয়াছেন।

রজনী ক্রমে গভীরা এবং ভয়ঙ্করী হইল, বাঞ্ছারাম ঘোর শ্মশানমধ্যে প্রতিক্ষণে প্রাণহরণ মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। ঘন অন্ধকারের ভীষণ গাম্ভীর্য্যমধ্যে অনন্তের আভাস অনুধ্যান করিতে করিতে জাগ্রত সুষুপ্তির অবস্থায় অবসন্নপ্রায় হইয়া কখনো দেখিতেছেন, শবদেহ সকল হাত পা ছড়াইয়া মুখ ব্যাদান করিয়া স্তূপাকারে পড়িয়া আছে, তাহার উপর চিল শকুন হাড়গিলা শেয়াল কুকুরের দল খেউ খেউ শব্দ করিতেছে। কখনো দেখিতেছেন, কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় কঙ্কালময় দীর্ঘ একটী মনুষ্যদেহ দাঁত বাহির করিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া নিকটে আসিতেছে আর সরু দুই

খানি হাত বাড়াইয়া আহার্য্য চাহিতেছে। কখনো দেখিতেছেন, চতুর্দ্দিকে ঘোরান্ধকার তাহার মধ্যে কেবল একখানি হাড়ের খাঁচা মুখ হাড়ের জিহ্বা বাহির করিয়া হাসিতেছে। মৃতদেহের বিকট ছায়া সকল বিবিধ বিভৎসাকার ধরিয়া তাঁহার কল্পনা ও নিদ্রাভারে শ্রান্ত ক্লান্ত চক্ষের সম্মুখে দেখা দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বাতাসের ঝাপটে অর্গলবিহীন দরজা জানালার কপাট গুলা গৃহভিত্তির অঙ্গে মাথা খুঁড়িতেছে। আলিসা ও কার্ণিস হইতে দুড়ুম দাড়ুম শব্দে ইট টালি উড়িয়া পড়িতেছে। মহা ধুন্ধুমারী ব্যাপার। মেঘ বাতাস বৃষ্টি তিনে এক একে তিন। এটাকে বলে সাইক্লোন্। ইহা পূর্ব্বে এ দেশে ছিল না, ইংরাজি সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়াছে।

এই ভয় এবং বিপদের পেষণে দুইটী আত্মাকে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া যেন এক করিয়া ফেলিল। সে অনন্ত দুঃখসমুদ্রে আপনার বলিবার আর কেহ নাই, অনন্যগতি দুইটী জীব ভয়ে দুঃখে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। বাঞ্ছারামের সেবাব্রত উদ্‌যাপনের ইহা যেন একটি মহা যজ্ঞস্বরূপ। অনন্যসহায় হইয়া ঘোর অন্ধকার ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রাত্রি জাগিয়া তিনি রোগীর পরিচর্য্যা করিলেন। এই উপলক্ষে সন্তোষিণীর প্রতি বাঞ্ছারামের আনুগত্য মমতা স্নেহ প্রীতিকে রাতারাতি সবলে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিল। সন্তোষিণী তাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে প্রচুর সেবাগুণে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, বাঞ্ছারাম তাহার প্রতিশোধ দিতে পারিতেন না, তজ্জন্য মনে একটা বড়ই ক্ষোভ ছিল। ভালবাসার পাত্রকে সেবা করিতে না পারিলে হৃদয়ে অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, কৃতজ্ঞতাভারে প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠে, এই সুযোগে বাঞ্ছারাম পূর্ব্বের সমস্ত ক্ষোভ নিবৃত্ত করিয়া লইলেন। সমস্ত জীবন ঢালিয়া দিয়া সেবা পরিচর্য্যা করিলেন। এতদ্দ্বারা যত দূর ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা হইবার তাহার আর অবশিষ্ট রহিল না। অনন্তর তাঁহার সেই অকাতর পরিশ্রম যত্নে সন্তোষিণী সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তিনি বাঁচিয়া উঠিলেন কেবল তাহা নহে, প্রেমাস্পদকে আত্মস্থ করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কলির হিন্দুধর্ম্ম।

আধুনিক সভ্যতার ফলস্বরূপ যে সকল সদনুষ্ঠান পুণ্যকীর্ত্তি নগর উপনগরকে অলঙ্কৃত করিয়াছে তাহার সমস্তগুলিরই কিছু কিছু নমুনা বসন্তপুর গ্রামে দেখা যাইত। গ্রামটী নিতান্ত সামান্য স্থান নয়, একটী উপনগর বিশেষ। সেই মহা ঝড় বৃষ্টির দিনে স্থানীয় হরিসভার সাম্বৎসরিক উৎসব ছিল। অপরাহ্ন সময়ে সভা বসিয়াছে, চারিদিকে পতাকা পত্র পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে। নিমন্ত্রিত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য এবং গ্রামস্থ ভদ্রবিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসিয়া শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। পাঠ সমাপনান্তে পণ্ডিত গজরাজ গোস্বামী দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অভদ্র ভাষায় নিন্দা উপহাস বিদ্রূপ করিয়া বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে জাগাইয়া তুলিলেন। যে সকল নবীন হিন্দু যুবা ভাগবত ব্যাখ্যার সময় ইতস্ততঃ চঞ্চল ভাবে চাহিতেছিল, এবং যে সকল বিজ্ঞ প্রাচীনগণ সংসারচিন্তার আবেশে নিদ্রার ভারে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছিলেন তাঁহারা সকলে এখন উৎফুল্ল নেত্রে সহাস্য আননে বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। করতালি এবং হাস্যধ্বনিতে সভা মহা গরম হইয়া উঠিয়াছে, বক্তা নানা রঙ্গ ভঙ্গীতে বিরোধীদিগকে গালি দিতেছেন, ব্যঙ্গ করিতেছেন, এমন সময় প্রবল বেগে মহা ঝড় উঠিল, পথের ধূলায় আকাশ ছাইল, বাতাসের প্রচণ্ড তেজে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের আর্কফলা উড্ডীয়মান হইল। আহা তৎকালে টিকীগণের কি শোভাই হইয়াছিল। হে টিকীদেব, এ ঘোর কলিযুগে তোমার যে কি মাহাত্ম্য তাহা আর বলিতে পারি না। ম্লেচ্ছভক্ষ্য হিন্দুর অখাদ্য গো শূকর কুক্কুট মাংস তুমিই কেবল জীর্ণ করিতে সক্ষম। তুমি যাহার শিরে স্থান পাইয়াছ কার সাধ্য তাহার হিন্দুত্ব বিনষ্ট করে? এই গুণেইতো ইংরাজিপড়া বাবুরা তোমাকে এত ভাল বাসেন। যজ্ঞসূত্র,

তুমিই কি কম? আজ কাল জাতি কুলকে তুমিইত গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ! তোমরা জীবন জাগ্রত দুইটী সহোদর ভাই, তোমাদিগকে নমস্কার। অতঃপর সেই বায়ুবেগে পুঁথির পাতাগুলি ঘুড়ি হইয়া উড়িতে লাগিল, নিশান পত্র পুষ্পের সহিত পাল ছিঁড়িয়া পড়িল, বক্তার মুখে চক্ষু, শ্রোতার কানের মধ্যে ধুলা ঢুকিল, অবশেষে প্রাণের ভয়ে সকলে গৃহে পলায়ন করিলেন। এই ঝড়ে সভার ঘর খানি একবারে ভূতলশায়ী হয়।

সভার প্রধান উদ্যোগী পাণ্ডা কুড়ারাম ভট্টাচার্য্য এবং ঘনশ্যাম বাবু বাঞ্ছারামকে সভার অভিভাবক করিবার জন্য এক দিন তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। তিনি এক জন দেশহিতৈষী দয়ালু এবং সুপণ্ডিত সাধু যুবা, নানা বিধ সৎকার্য্য দ্বারা ইতঃপূর্ব্বেই গ্রামের মধ্যে সে কথা প্রচারিত হয়। নিশানাথের বহির্ব্বাটীতে এক খানি আটচালা ছিল, তাহাতে এক্ষণে সভা বসিবে, আর বাঞ্ছারাম নিজে সভাপতি হইবেন এই তাঁহাদের প্রস্তাব। হরিসভার উদ্দেশ্য কি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে পাণ্ডাদ্বয় বলিলেন," হিন্দুধর্ম্মকে আমরা পুনর্জ্জীবিত এবং রক্ষা করিতে চাই। একদিকে খৃষ্টীয়ান পাদরী সাহেবেরা, অপরদিকে ঘরের ঢেঁকি ব্রাহ্মেরা আমাদের জাতি কুল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, বিধবাদিগকে ধরিয়া বিবাহ দিতেছে, হিন্দুর ছেলেরা আর হিন্দুয়ানী মানে না, আর্য্যধর্ম্ম লোপ হইল, পিতা পিতামহের নাম ডুবিল, শাস্ত্র বিধি পূজা পার্ব্বণ ব্রতাদি কেহ পালন করে না, ঘরে ঘরে ম্লেচ্ছাচার, বিলাত হইতে প্রত্যাগত জাতিভ্রষ্ট পতিত ব্যক্তিরা অনায়াসে গৃহে স্থান পাইতেছে; এ সকল দেখিয়া আর আমাদের কি চুপ করিয়া থাকা উচিত? আপনি আমাদের সমাজের মধ্যে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান সাধুচরিত্র ব্যক্তি, আপনাকে সভাপতি হইতেই হইবে।" অতঃপর বাঞ্ছারামের সঙ্গে পাণ্ডাদ্বয়ের ঐ সকল বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

বাঞ্ছারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি উপায়ে আপনারা হিন্দুসন্তানদিগকে হিন্দুধর্ম্মে স্থির রাখিতে পারিবেন?

কুড়ারাম বলিলেন, এই হরিসভাই তার এক প্রধান উপায়।

বাঞ্ছা। কি প্রকারের লোক সভায় আসে?

কুড়া। প্রাচীন প্রাচীনারাত আসেই, তাহা ছাড়া অর্দ্ধ বয়সী ইংরাজি-শিক্ষিত নবীন হিন্দু অনেকে আসেন। মধ্যে মধ্যে উৎসবাদি উপলক্ষে যুবকদিগকেও আনা যায়। তরুণ বয়স্ক ছাত্রদেরত কথাই নাই, তাহারাই আমাদের ভবিষ্যতের বিশেষ আশা।

বাঙ্গা। তাহারা কি ধর্ম্মশিক্ষা করিতে আসে ?

কুড়া। প্রথম প্রথম অবশ্য সে আশা করা যায় না, আহার পান গান বাজনা বক্তৃতার আমোদের অনুরোধে এখন আস্‌ছে; আস্‌তে আস্‌তেই ভাল হয়ে যাবে।

বাঙ্গা। যদি আহার পান আমোদের লোভে আসে, তবে তাহারা সেই লোভের জন্য হোটেলেওতো যাইতে পারে ?

কুড়া। তাত পারেই এবং গিয়াও থাকে, তবু আমাদের যথা লাভ।

বাঙ্গা। নিয়মিত যাহাঁরা সভ্য তাঁহারা কি যথার্থ হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে চলেন ?

কুড়া। সব কি আর পেরে ওঠেন, বিশেষতঃ অনেক ব্যক্তিকে আফিসের চাকরী করিতে হয়, তবে অবশ্য চেষ্টা করেন।

বাঙ্গা। তাঁহারা কি ম্লেচ্ছের খাদ্য খান না ? মদ্যপান করেন না ?

কুড়া। তা তা অবিশ্য অবিশ্য বল্‌তে পারেন। তবে কথাটা কি তা জানেন, কথাটা হচ্ছে যে,—যে কথা বল্‌ছিলাম, অর্থাৎ দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করে চলিতে হয় কি না। সোমরস পান, আর বন্যবরাহ কুক্কুট মাংস ভোজন এ বিষয়ে ঋষিরাওত ব্যবস্থা দিয়ে গেচেন।

বাঙ্গা। আমি মশায় অত ফের ঘোর বুঝিতে পারি না। যিনি যে ধর্ম্মমত বিশ্বাস এবং প্রচার করিতে চান তদনুসারে তাঁহাকে চলিতে হইবে, নতুবা তাঁহার কথায় কোন ফল হইবে না। ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

কুড়া। সেত ঠিক কথাই বটে। তবে কি জানেন, আপাততঃ দেশের ছেলেগুল স্বধর্ম্ম ছেড়ে না যায়, কোন রকমে তাদিগকে আটকে বেঁধে রাখা। এই আর কি। আপনি তো সকলই বোঝেন। কালমাহাত্ম্যটা মান্‌তেই হয়।

বাঙ্গা। আটকে রাখবেন কি দিয়ে ?

কুড়া। কেন, হরিসভায় প্রতি সপ্তাহে ভাগবত পাঠ হয়, বড় বড় বিজ্ঞ

জনেরা বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, যে আমাদের প্রাচীন আচার বিধির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য আছে। তদাচরণে দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইলে স্বাস্থ্য ভাল হয়, তাহার সঙ্গে রেচক পূরক কুম্ভক প্রাণায়াম যোগ সমাধি আপনা আপনি মনের মধ্যে প্রবেশ করে।

ঘনশ্যাম বাবু ইংরাজিশিক্ষিত নবীন হিন্দু, তিনি বলিলেন, "আমরা হিন্দু-শাস্ত্র শিখাইবার জন্যএকটী বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছি। সেখানে বালক কাল হইতে হিন্দুসন্তানেরা ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিবে এবং ইংরাজি বিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া সুপাত্র হইবে।

বাঞ্ছা। ইংরাজির সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা মিলিবে কিরূপে ?

ঘন। তা মিলিয়ে নেওয়া যাবে। আজ কাল শিক্ষিত ভদ্র সুসভ্য অনেকে হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিতেছেন। অবশ্য একটু পরিবর্ত্তিত সংশোধিত আকারে এ সব হবে।

বাঞ্ছা। তা হইলেইত আপনার শাস্ত্র উল্‌টে গেল। সে কথা যাক্, বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবেন কিরূপে ?

কুড়া। বিশ্বাস নাই বা রইল, কাজতো হবে ? ক্রিয়া কলাপ গুলতো বজায় থাকবে ? বিশ্বাস ফিশ্বাস এ যুগে কারই বা আছে, বাইরের ঠাট মাত্র সকলে বজায় রাখে।

বাঞ্ছা। কাজই বা কৈ কে করে ? লুকিয়ে সব রকম চলিবে, অথচ শাস্ত্র এবং কর্ম্মকাণ্ড লইয়া বাহিরে আড়ম্বর, ইহাত বহু দিন থাকিতে পারে না, এ যে বিজ্ঞানবিরোধী, স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য।

ঘন। সে কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু উপায় কি ? সেই জন্যইত আপ-নাকে বলিতেছি, আপনি এসে সব ঠিক করে দিন।

বাঞ্ছা। আমাকে ঠিক করিতে গেলে হবিসভাটী সর্ব্বাগ্রে উঠাইয়া দিতে হইবে। ইহার পরিবর্ত্তে দাতব্যালয় বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করুন অনেক উপকার হবে।

কুড়া। ও! বটে বুঝিছি, বুঝিছি। তুমি সঙ্কটাচরণের ফাঁদে পড়েছ। মুসলমানের কাছে হিন্দুর কথা বলা বৃথা। ভায়া হে! আর দেখছ কি,

একেই বলে ঘরের ঢেঁকি কুমীর। তোমার একটু কি চক্ষুলজ্জা নাই? আমরা তোমার বাড়ীতে এলাম, আর তুমি আমাদিগকে অপমান করলে?

বাঞ্ছা। আপনারা কুপিত হইতেছেন কেন? বিশ্বাসবিহীন ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্ফল এবং অস্থায়ী সেটা কি মানেন না?

ঘনশ্যাম বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাধিধারী কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তিনি নবীন হিন্দু হইয়া এক্ষণে মাথায় টিকি রাখিয়াছেন, হাতে মাদুলী ও তাগা পরিয়াছেন, রোষকষায়িত লোচনে বাঞ্ছারামের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "তুমি ইংরাজের উচ্ছিষ্টভোজী পল্লবগ্রাহী বিদ্বান্। আমাদের শাস্ত্রে যে কি আছে তাহাত জানলে না, পড়লে না, দেখলে না, অথচ পৈতে পুড়িয়ে ভগবান্ হয়ে বসে আছ।

কুড়া। ওহে ভায়া, কেন আর বৃথা বাক্যব্যয়? বিবাহে পণ লওয়া যখন ওঁর মতে পাপ, তখনত উনি একবারে অধঃপাতে গেছেন। তুমি নিশানাথ খুড়র ভিটেয় বাস্তুঘুঘু হয়ে বসে আছ। তিনি আসুন, তার পর এ সব কথা হবে।

বাঞ্ছা। মহাশয়, অনর্থক কেন ক্রোধ করেন, আমি আপনাদিগকে অপমান ত কিছু করি নাই। যাহা ঠিক তাই বলিতেছি, ক্রোধ সংবরণ করুন।

ঘন। কেন ক্রোধ সংবরণ করিবে? তোমা হতে আমাদের কি উপ-কারটা হল বল দেখি? তুমি হিন্দুর ঘরের পাষণ্ড, ষাঁড়ের গোবর।

বা। মশাই যাই বলুন, পেসাদারি কি দোকানদারি ধর্ম্ম আমার ভাল লাগে না। এ আর ত বারইয়ারি পূজা নয়?

কুড়া। কি দুরাত্মন্! এত বড় আস্ফদ্ধার কথা? তুই তো গরুখেগো খ্রীষ্টান, তোর মামাও নাস্তিক পাষণ্ড। কোনো দিন দেখলাম না যে বাড়ীর মেয়েরা একটা ব্রত করলে, কি দশ জন ব্রাহ্মণকে খাওয়ালে। তোদের হতেই তো আমাদের সোণার আর্য্যধর্ম্ম উচ্ছন্ন গেল। তোদের মুখ দেখলেও পাপ হয়। যদি হিন্দুর ধর্ম্মশাসন সামাজিক আচার না মানিস্, তবে গলায় পৈতা কেন? আমাদের সঙ্গে গোলে হরিবোল দিয়ে মিশেই বা

থাকা কেন?" পরে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কপট পাষণ্ড ব্যাটারা বুকে বসে দাড়ি উপড়াবেন!" পরে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া "হায়! হায়! এমন উচ্চ বংশে জন্মে তোরা চণ্ডালের অধম হলি! আহা! আর্য্যসন্তানদিগের গতি কি হবে! এই জন্যই কি তাঁরা দেহ পাত করে সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়ে শাস্ত্র বিধি রচনা করেছিলেন!"

অনন্তর কুড়ারাম এবং ঘনশ্যাম উভয়ে পৈতৃক ধর্ম্মের বিলোপ, দেশীয় সদাচারের উচ্ছেদের কথা কহিয়া বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে নিরীহ বাঞ্ছারামকে গালি পাড়িতে লাগিলেন।

বাঞ্ছারাম না রাম, না গঙ্গা, কোন কথারই উত্তর করিলেন না। পরে অতি বিনম্র ভাবে মৃদু স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনাদের এই যে ক্রোধ অভিমান বিলাপ ক্রন্দন এবং পরুষ বচন ইহা আমার নিকট শূন্যগর্ভ ধাতব পাত্রের শব্দের মত বোধ হইল, কিছুই ইহার সারত্ব বা ভারত্ব অনুভব করিতে পারিলাম না। ঠিক যেন আপনারা দুই জনে নাট্যাভিনয় করিলেন!"

পাণ্ডাদ্বয় তখন হাসিয়া ফেলিলেন এবং বাঞ্ছারাম যে এক জন সুচতুর সারবান্ লোক তাহা বুঝিতে পারিলেন। তখন ঘনশ্যামের মনে দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি বলিলেন, "ভাই, এ সংসাররঙ্গালয়ে সকলইত অভিনয়। আশ্চর্য্য এই যে, অভিনয় জানিয়াও তাহাকে সত্য মনে করি। কেহ অতি গম্ভীর ভাবে মহা তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত উপদেশ দিতেছে, কেহ অন্যের দোষ দেখিয়া নিন্দা করিতেছে, কেহ বা দেশের দুর্গতির কথা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবে গদ্ গদ্ হইয়া কাঁদিতেছে, কেহ বা স্বজাতির দুঃখের কাহিনী বলিয়া বক্তৃতার তেজে গগন কাঁপাইতেছে, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে তাহার ভিতর পনর আনা উনিশ গণ্ডা অসত্য কপটতা অবাস্তবিকতা মকারি হাম্বাগিজম্। কথায় যে যা বলে কাজে তার বিপরীত আচরণ করে। তা না হইলে সংসার চলে কি? এ সব কালের দোষ, মানুষের কোন দোষ নাই।" শেষ বাঞ্ছারামকে ভজাইতে না পারিয়া বলিলেন, "ব্রাদার, তুমি পাঁচটা টাকা আমাদিগকে ভিক্ষা দাও, সে দিনের ঝড়ে জলে মেজাজটা বড় ড্যাম্প হয়ে গেছে, আমরা সকল সভ্য

মিলিয়া আজ লুচি পাঁটা খাব। আমাদের হরি বড় পাঁটা ভালবাসেন। পরিশেষে দশটা টাকা লইয়া তাঁহারা হরিসভায় গমন করিলেন।

বাঞ্ছারাম ঘনশ্যামের শেষ কয়টী কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে হাতেই পাইলেন। পৃথিবীর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাড়ম্বরের মধ্যে অধিকাংশই যে হাম্বাগ্ আর মকারি আন্‌রিয়েল্ তাহা স্পষ্টই বুঝিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রূপে গুণে মাখামাখি।

সস্ত্রীক নিশানাথের তীর্থগমন, সন্তোষিণীর সাংঘাতিক পীড়া এবং বাঞ্ছারাম কর্ত্তৃক তাহার সেবা, মহামারী ও ঝড় তুফানে পড়িয়া উভয়ের বিপদগ্রস্ত হওয়া, ইত্যাদি ঘটনা সকল এই দুই হৃদয়কে ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠ প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। প্রেম বড় চতুর। এখন আর সন্তোষিণী কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারেন না, যে বাঞ্ছারাম তাঁহার ভাবের ভাবুক নহেন। বস্তুতঃ যেরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া ইহাঁরা চলিয়া আসিলেন তাহা ভালবাসা ও আনুগত্য বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। যতই দিন যাইতে লাগিল, সন্তোষিণীর চক্ষে বাঞ্ছারাম ততই প্রিয়দর্শন চিত্তবিনোদন হইতে লাগিলেন। তাঁহার পদনখ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তিনি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন আর বিমোহিত হইতেন। আর মনে ভাবিতেন, "আহা। যে ভাল, তার কি সকলি ভাল। হাত দুই খানি কেমন সুন্দর, সুকোমল, যেন পদ্মের মৃণাল তুল্য। বক্ষস্থলটী কেমন প্রশস্ত। নয়ন দ্বয় কেমন শান্তিরসার্দ্র, গ্রীবা এবং স্কন্ধদেশ কেমন সমুন্নত।" যুবকের দাড়িগোঁফহীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত পরিষ্কার মুখ খানি, এবং উজ্জ্বল নির্ম্মল সুস্থ শরীরটী বহু পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল. এক্ষণে গুণের সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে একবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। যেমন গুণ তেমনি রূপ। সন্তোষিণী এ সকল যতই

ভাবিত, ততই প্রলুব্ধ হইত। সমস্ত জগৎ সংসার তাহার নিকট বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রেম অন্ধ না হইলে তাহার মিষ্টতা থাকে না, কিন্তু উহা অত্যাসক্তিতে পরিণত হইলে এই দেখ আবার কত বিপদ। কেন, এত ভালবাসিবার প্রয়োজনটা কি বাছা? আচ্ছা না হয় ভালই বাসিলে, এত মোহ কেন? মানুষ দৈব নয়, জরা মৃত্যু আছে, অবস্থার স্রোতে পড়িয়া বিচ্ছেদও ঘটিতে পারে। হইলই বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গুণবান্ যুবা পুরুষ, কোন বিষয়ে বাড়া বাড়ীটে ভাল নয়। প্রথমে যে যত ভালবাসা দেখায় শেষে তাহাদের প্রেম তত তিক্ত হইয়া উঠে। প্রেমবিকারের লীলা খেলা অনেক আছে। রূপ যৌবনমদে মত্ত নর নারীর হৃদয় বড় তরল চঞ্চল। তাহারা সচরাচর বড় আত্মপ্রবঞ্চিত হয়। "অতএব বলি শুন, ত্যাজ দম্ভ তমোগুণ, সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।"

মনুষ্যকে ভালবাসিয়া যদি প্রেমের আকর ভগবানের প্রীতি না পাওয়া যায়, তবে যে সকলই ব্যর্থ হইল। অনন্ত বিনা শান্তি কোথায়? অনন্ত প্রেমধামের যাত্রী ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মানবীয় প্রেমকূপে কি আবদ্ধ থাকিলে তাহার আশা নিবৃত্ত হয়? কিন্তু অবলা কুলবালা প্রেমমুগ্ধা যুবতীরা তাহা বুঝিতে পারে না। যে উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় তাহা অবশ্য আদর এবং ভালবাসার সামগ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু যে উপায় উদ্দেশ্যকে ভুলাইয়া দিয়া আপনি সমস্ত অধিকার করিয়া বসে সে মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তৎপ্রতি অধিক আসক্তি জন্মিলে পরিণামে পরিতাপ উপস্থিত হয়। সন্তোষিণী বাঞ্ছারামের সাধুগুণে মোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে গুণগ্রাম রূপকে আরো লোভউদ্দীপক করিয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতঃ গুণ অপেক্ষা রূপের দিকেই প্রথমতঃ লোকের টান্‌টা বেশী হয়; কারণ, জড় জড়কে অন্ধভাবে সহজেই আপনার দিকে টানিয়া লয়; তৎসঙ্গে মন আপনাপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, এই জন্য সর্ব্বত্যাগী তত্ত্বজ্ঞানী যোগীরাও জড়ের আকর্ষণ সহজে অতিক্রম করিতে পারেন না। ভক্তেরা মহাপুরুষদিগের প ধরিয়া টানাটানি, প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি করে কেন? বাহ্য অবলম্বন উদ্দীপনের সহায়তা সকলকেই লইতে হয়। আগে জড় তার পরে চেতন। জড়রাজ্য পার হইয়া লোকে চৈতন্যের জ্ঞান লাভ করে।

দৈহিক বিকার না ঘুচিলে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের মিষ্টতা কেহ অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য গুণের পক্ষপাতী আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীরা বহির্ম্মুখে যাইতে চাহেন না। কারণ, আধ্যাত্মিক সারবত্তা সম্ভোগই তাঁহাদের লক্ষ্য। রূপ চাই কি প্রেম চাই? ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, না আধ্যাত্মিক সম্ভোগ প্রার্থনীয়? এ প্রকার বিচার করিতে যাহারা অক্ষম তাহারা সহজে বিপাকে পড়ে। রূপের সাহায্যে প্রেমাসক্তি ঘন এবং মিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আন্তরিক প্রেমপিপাসা পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় না; অধিকন্তু মনুষ্য রূপের মোহে বাহিরে গিয়া পড়ে, ভিতরে যাইতে পারে না। অথচ গুণের সঙ্গে রূপের এমনি নিকট সম্বন্ধ যে একটিতে মুগ্ধ হইলে অপরটিতে মুগ্ধ হইতেই হইবে। সুতরাং সন্তোষিণী বাঞ্ছারামের রূপসাগরে দিন রাত্রি সন্তরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের উপর শেষে আর কোন কর্ত্তৃত্ব রহিল না, চুম্বক যেন লৌহকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এক জন লোক আর এক জনকে যদি ভালবাসিবার জন্য পাগলের মত হয়, প্রাণ মন সর্ব্বস্ব তাহাকে সমর্পণ করিতে চায়, তাহা হইলে সে কি আর বেশী দিন তাহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে?

সন্তোষিণীর প্রগাঢ় ভালবাসা প্রেমানুরাগ দেখিয়া বাঞ্ছারামও তাহার দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো একটু অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। দয়া এবং স্নেহমূলক আকর্ষণ হইলেও, তাঁহার অগোচরে কাহাকে কোন সংবাদ না দিয়া স্বভাব আপনার কার্য্য আপনি আরম্ভ করিল। পুরুষস্বভাবের মূলে স্ত্রী-অন্বেষণকারিণী এক নৈসর্গিক দুর্জ্জয় শক্তি আছে, যে শক্তির প্রভাবে নরনারী মিলিত হইয়া পৃথিবীতে পরিবার গঠন করিয়াছে, সেই শক্তি বাঞ্ছা-রামের অন্তরে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে নানা কার্য্যের উপ-লক্ষে অলক্ষিত ভাবে ইহা দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে কিছু স্পষ্টীকৃত হইল। সন্তোষিণী মূর্ত্তিমতী স্ত্রী, হইলেনই বা বাঞ্ছারাম বিচারনিপুণ জ্ঞানী সুপণ্ডিত? নারীপ্রকৃতির ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর যে মোহিনী মায়াশক্তি আছে তাহা কি তিনি একবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন? এই কারণে নারীপুরাপদ্ধতি তাঁহার ভাল লাগিত, তাহাতে একটু আনন্দও অনুভব করিতেন। চিন্তাভারে

আক্রান্ত অধ্যয়নশীল নীরস জীবনে প্রীতিরস সঞ্চারিত হইলে মানুষ বড় সুখী হয়, এবং সেই সুখবোধ তাহাকে অধিকতর সুখ শান্তি অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু বাঞ্ছারামের ইহাতে জ্ঞানতঃ কোন মোহ বিকার উপস্থিত হয় নাই; কেন না, তিনি সন্তোষিণীর রূপ অপেক্ষা গুণের প্রতি বাৎসল্য ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সংযতমনা চিন্তাশীল ধীর প্রকৃতির লোকের মনের গতি অন্তর্ম্মুখে যাইতেই ভালবাসে। বিশেষতঃ তিনি নারী স্বভাবকে পবিত্র ভাবে সম্ভ্রম করিতে জানিতেন।

এক দিন বাঞ্ছারাম স্নেহপরবশ হইয়া সন্তোষিণীর অশান্তি নিবারণের জন্য শাক্যমুনির নির্ব্বাণপ্রাপ্তি বিষয়ে কথা আরম্ভ করিলেন। জগদ্বাসী নরনারীগণকে প্রজ্বলিত বাসনানলে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে যে মহাবৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং সেই বৈরাগ্যবলে পরে তিনি যেরূপে নির্ব্বাণজনিত পরম শান্তি লাভ করেন, আনুপূর্ব্বিক সেই বিষয় তিনি বলিতে লাগিলেন। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার মুখমণ্ডলে এবং নয়নযুগলে যেন শান্তির জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। শাক্যের সেই মহানির্ব্বাণের কথা বাঞ্ছারাম ভিন্ন তেমন করিয়া আর কে বর্ণন করিতে পারে? তিনি নির্ব্বাণের আস্বাদন পাইয়া শাক্যচরিত্রকে যেন নিজ চরিত্রের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রেমবিকারগ্রস্ত চঞ্চলমতি দগ্ধহৃদয় মানবের কর্ণে বাঞ্ছারামের বর্ণিত কাহিনী বাস্তবিক শান্তির প্রস্রবণ স্বরূপ। তিনি শান্তিরস সম্ভোগ করিতে করিতে মৃদু গম্ভীর নিনাদে ধীরে ধীরে সেই সকল মহাবাক্য সন্তোষিণীকে শুনাইতে লাগিলেন।

যাহাকে ভালবাসা যায়, সে যাহা কিছু করে তাই মিষ্ট লাগে, কেন না, তখন ভালবাসায় সমস্ত জীবন মজিয়া অতিশয় সুমিষ্ট হয়। বাঞ্ছারামের কণ্ঠরব, তাঁহার কথা কহিবার প্রণালী এবং তৎকালীন তাঁহার মুখের ও চক্ষের ভাব ভঙ্গী এমনই মনোহর বোধ হইতে লাগিল, যে তাহা শুনিতে শুনিতে যেন এক স্বপ্নসুখময় শান্তির রাজ্যে গিয়া সন্তোষিণী উপনীত হইলেন। বাঞ্ছারামের মুখারবিন্দবিগলিত গভীর অর্থযুক্ত নির্ব্বাণতত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবশ্য তিনি বুঝিতে পারিলেন না, সে দিকে মনও গেল না, কেবল নয়ন ভরিয়া তাঁর শান্তিপূর্ণ মুখ খানি তিনি দেখিতে লাগিলেন, আর কান ভরিয়া

সেই বীণাবিনিন্দিত বাণী পান করিতে লাগিলেন। বাঞ্ছারামের মুখখানি তখন বসন্ত পূর্ণিমার অমিয়া মাখা চাঁদ খানির মত শোভা পাইতেছিল। সে শোভা ছাড়িয়া সন্তোষিণীর সুধালোভী হৃদয়চকোর কি নির্ব্বাণের গভীরতার মধ্যে তখন যাইতে চাহিবে? না চাহিলেই যাইতে পারিবে? সম্ভব নহে। স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মে, জড় ছাড়িয়া চৈতন্যে কয় জন লোক যাইতে চায়? যে যায় সে যাউক, রূপমুগ্ধ নয়ন, প্রেমপিপাসু হৃদয় সহজে সে দিকে যাইতে চাহে না, পারেও না। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে তাহার গতিরোধ করিয়া ফেলে। শাক্যের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া বিচার করিতে না পারিলে কার সাধ্য সে রাজ্যের দিকে এক পদ অগ্রসর হয়?

অতঃপর কথা শ্রবণ করিতে করিতে সন্তোষিণীর সর্ব্বশরীর অবসন্ন প্রায় হইয়া আসিল, চক্ষু নিদ্রাভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, মুক্তামালার ন্যায় ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ ঝরিতে লাগিল। রূপের মোহে, কথার সুরে চক্ষু কর্ণ যেন মদিরাঘোরে বিভোর হইয়া উঠিল। সহসা যেন স্বর্গের সুরবালাগণ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া অলৌকিক স্নেহ সান্ত্বনা দ্বারা জাগ্রদাবস্থাতেই তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া গেলেন। তাহাতে সন্তোষিণীর প্রাণের গ্রন্থিসকল এলাইয়া পড়িল। ক্রমে শান্তির সুকোমল সুখশয্যায় প্রেমাবেশে অবশাদগ্রস্ত হইয়া তিনি শয়ন করিলেন। নিদ্রাও নহে, চেতনাও নহে, নিদ্রাচৈতন্যে মিলিত এক রমণীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া স্বপ্নের ন্যায় কি এক অলৌকিক শোভাময় দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন কোন দেবভোগ্য আনন্দময় অমৃতের রাজ্যে তিনি বাঞ্ছারামের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহার স্নেহ আদরে একবারে গলিয়া জলবৎ তরল হইয়া গিয়াছেন। সেই জল ক্রমে প্রসারিত হইয়া অসীম সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে একটীও তরঙ্গ নাই, স্থির প্রশান্ত। অতি সুন্দর সুগম্ভীর সে দৃশ্য। কোথাও আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল ঊর্দ্ধে দিগন্তব্যাপী অনন্ত সুনীল গগন, নিম্নে প্রশান্তবক্ষ স্থির নীরনিধি; নীলাম্বুরাশি নীলাম্বরের সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বাঞ্ছারামের শান্তিরসরঞ্জিত মুখমণ্ডল রজতরঞ্জনে বিভূষিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রবৎ দীপ্তি পাইতেছে, এবং তাহার প্রতিবিম্ব সেই

জগময়ীর হৃদয়সিন্ধুতে দ্বিতীয় চন্দ্রমণ্ডল রচনা করিয়াছে। ঊর্দ্ধে চন্দ্র, অধোতে চন্দ্র, উপরে সুনীল গগন, নিম্নে ঘননীল মহাসমুদ্র, মধ্যে সুবিমল শান্তিসমীরণ মৃদু মন্দগতিতে বহিয়া যাইতেছে, আর তাহার সঙ্গে মনমুগ্ধকর মধুর স্বরে শান্তিরূপিণী দিগাঙ্গনাগণ শান্তিগীত গান করিতেছেন। কোন উত্তেজনা নাই, বিকার নাই, বিক্ষেপ নাই আশা অপেক্ষা নাই, অভাব নাই। সেই শান্তিসমুদ্রশায়ী সুখস্পর্শ সমীরণে শান্তির স্নিগ্ধ পরিমলরাশি নিরন্তর ভাসিয়া যাইতেছিল। এবং তাহার শান্তিপদ্ম মধুর আঘ্রাণে চিত্ত মোহিত হইয়া প্রতিক্ষণে অনন্তর গভীরতার ভিতরে অবতরণ করিতেছিল। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় সুখে নিদ্রিত থাকিয়া এই অপূর্ব্ব স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান নির্ব্বাণানন্দ সম্ভোগিনী সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। নিদ্রার ঘোরে দূর হইতে সমাগত সঙ্গীতের স্বর যেমন মধুর বোধ হয়, স্বপ্নের প্রেমালাপ যেমন প্রগাঢ় সুমিষ্ট, বাঞ্ছারামের উক্তি সকল তাঁহার কর্ণে তেমনি বোধ হইতে লাগিল। তখন প্রেমবিকারনিপীড়িত পিপাসাকাতরা সম্ভোগিনীর শান্তিহীন হৃদয় এইরূপে আরাম পাইয়া মনে করিতেছিল, "আর আমার আমোদ মত্ততায় কাজ নাই। আমি আর লীলালহরীময় প্রেমসমুদ্রে আন্দোলিত হইয়া ক্রীড়া করিতে চাহি না। এই অবস্থায় অনন্ত যোগনিদ্রার ঘোরে, চিরনির্ব্বাণের শীতল বক্ষে আমি যেন ঘুমাইয়া থাকি। আমি যেন এই শান্তিদেবীর শীতল ছায়াতলে চিরকাল এই ভাবে বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিতে পাই।" ইহা ভাবিতে ভাবিতে সেই মহা নির্ব্বাণসাগরে সহসা আবার ভয়ঙ্কর তুফান উঠিল, মোহমেঘে চারি দিক্ ঘেরিয়া ফেলিল, মহাবেগে বাসনাবায়ুর প্রবাহ ছুটিল, তরঙ্গাভিঘাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, মনোবৃত্তি সকল উন্মাদের ন্যায় হুঙ্কার করিতে লাগিল, সুখের স্বপ্ন, শান্তিনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় ভয়বিভ্রান্তচিত্তে সেই অবলা দশ দিক্ শূন্য দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন দৈবানুগ্রহে কি এক স্বর্গের সামগ্রী পাইয়াছিল তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে; যেন অপহৃত বস্তু পাইবার জন্য আবার এ দিক্ ও দিক্ চাহিতেছে, কি যেন চায়, অথচ পায় না; মনের ভিতর কত কথা আছে, অথচ কিছুই বলিতে পারিতেছে না; যেন

সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী এক জনকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; কথা কয় তাহার সম্বন্ধ বুঝা যায় না; চাহিয়া আছে, অথচ যেন কিছু দেখিতেছে না, ঈদৃশ প্রেমোন্মাদিনীর বেশে সন্তোষিণীকে যখন বাঞ্ছারাম দেখিলেন তখন তাঁহারও হৃদয়ে প্রীতির প্রস্রবণ উৎসারিত হইল। তখন তাঁহার সেই অবাতকম্পিত স্থির হ্রদতুল্য চিরপ্রশান্ত চিত্তেও কিছু কিছু ভাবের তরঙ্গ উঠিল। যাহা কখন হয় নাই তাহা হইল। একটু যেন প্রেম-মাদকতা তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, বুকের ভিতরটা যেন কেমন কেমন করিতে লাগিল। সন্তোষিণীর চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে গিয়া শেষ নিজের মনকে তিনি কথঞ্চিত বিচঞ্চল করিয়া ফেলিলেন। নির্ব্বাণ নির্ব্বাণ হইল, উভয়ের অন্তরে প্রেমের অনল জ্বলিয়া উঠিল। বাঞ্ছারামের মন এত দিন আর্দ্র কাষ্ঠের মত ছিল, সন্তোষিণীর প্রেমাগ্নি তন্মধ্যে ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া এত দিন পরে তাহাকে দাহ্যমান করিয়া তুলিল। মানুষ যে বিষয়ে প্রাণ মন ঢালিয়া দেয়, তাহাতে সে কৃতকার্য্য হয় এটা খুব সত্য কথা।

বাঞ্ছারামের হৃদয়রাজ্যের সীমামধ্যে সন্তোষিণীর প্রেমবন্যার জল এক্ষণে কিছু কিছু প্রবেশ করিল। অজ্ঞানতার প্রাচীর শিথিল এবং জীর্ণ হইয়া গেল। পরিশেষে বাঞ্ছারাম দেখিলেন, তিনি এত ক্ষণ যে সকল সার তত্ত্বকথা কহিতেছিলেন তাহা শ্রোতার মনে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। সমস্ত সময়টা সন্তোষিণী একান্ত ভাবে তাঁহারই মুখপানে চাহিয়াছিল, এক-বারও অন্য দিকে নয়ন ফিরায় নাই, সে দৃষ্টিতে উন্মাদের লক্ষণ কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, সুন্দরীর নয়নযুগল প্রেমরাগে রঞ্জিত হইয়া তাহার লোহিত বর্ণে নাসা ও গণ্ডস্থলকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছে। ভিতরে যেন অগ্নি লাগিয়াছে, তাই সেই অগ্নির আভা নয়নের স্বচ্ছ কাচ এবং গণ্ডস্থলের শ্বেত চর্ম্মাবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতেছে। সর্ব্বভুক হুতাশন দেব যেন নির্ব্বাণের কথা শুনিয়া মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন, আর দুইটী প্রেমবিহ্বল ভাবরসোন্মত্ত পতঙ্গ তন্মধ্যে পড়িয়া দগ্ধ হইবার জন্য চারি দিকে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যুগলমিলন।

প্রেমরাজ্যের ভূমি অতি মসৃণ, একবার তাহাতে পদার্পণ করিলে কোথায় গিয়া মানুষ যে পড়িবে তাহা সে জানে না। সন্তোষিণী লজ্জা ভয় সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে এই পত্র খানি বাঞ্ছারামকে লিখিলেন।

"প্রিয় দাদা,

আমি তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে ভালবাসি। কিন্তু এই মধুর সম্বোধনে সচরাচর যে ভাব প্রকাশিত হয়, তদপেক্ষা অনেক প্রকারের অব্যক্ত মধুর ভাব আমার ইহার ভিতরে আছে। এক কথায় সে সমস্ত ব্যক্ত হয় এমন ভাষা খুঁজিয়া পাই না। তুমি আমার প্রাণের ভাই, জীবনের বল্লভ, হৃদয়ের সখা, আত্মার আত্মীয়। আমি ভূমিবিলুণ্ঠিত নিরাশ্রয় লতা, তুমি আমার আশ্রয়পাদপ। তুমি আমার কে তাহা জানি না, এবং কে যে নও তাহাও বলিতে পারি না। আমার সকল অবস্থার সকল তুমি, আমি তোমার দাসী। হৃদয়ের মধ্যে সমুদ্র সমান ভাবরাশি উথলিয়া উঠিয়াছে, আর তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। দিবা নিশি তাহার তরঙ্গে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছি। আমি অবলা অনাথা জ্ঞানহীনা, যাহাতে আমার কল্যাণ হয়, যাহাতে আমি মনে শান্তি পাই তাহা কর। আমি তোমার পদে দেহ মন প্রাণ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিলাম।"

পত্র পাঠ করিয়া বাঞ্ছারাম ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সন্তোষিণীর হৃদয়সিন্ধুর একটী প্রবল তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়ের উপর যেন সবলে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ঈদৃশ প্রেম তাঁহার চির অপরিচিত; কারণ ইহা মুখের ভালবাসা নয়, প্রাণ দিয়া প্রাণকে টানিয়া লওয়া, সুতরাং মনের ভিতর ভারি একটা গোল বাঁধিয়া গেল, চিত্ত মহাবেগে আন্দোলিত হইল। সুখ এবং অসুখ, ভয় প্রলোভন, লজ্জা এবং দয়া, দুর্ভাবনা এবং আকর্ষণে মিশ্রিত

সে ভাব, না বুঝা যায়, না কাহাকে বুঝান যায়। এই অপরিচিত ভাবোদ্গমই সন্তোষিণীর পত্রের যথার্থ উত্তর। যে অবস্থায় ইহাঁরা এখন আসিয়া পৌঁছিলেন ইহা অব্যক্ত প্রেমরাজ্য, এখানে কোন রূপ ভাষা প্রচলিত নাই। এখানে চক্ষু চক্ষের সঙ্গে কথা কয়, মুখের মৃদু হাসি হাসির কথার উত্তর দেয়, আত্মা আত্মার সঙ্গে নীরবে আলাপ করে, হৃদয়ে হৃদয়ে মাখা মাখি হয়। যদি সে প্রেম এক গুণ কথায় প্রকাশ পায়, সহস্র গুণ বাহিরে বাধা পাইয়া মূল প্রস্রবণের দিকে পুনরায় ফিরিয়া আইসে। অবসর সময়ে তাহা আপনার নিকট আপনি বিস্তীর্ণ পুরাণ কাহিনী রচনা করিবে। বিধাতার আশ্চর্য্য লীলা খেলা, দুইটী বিভিন্ন জাতীয় স্বতন্ত্র প্রকৃতির মনুষ্যকে তিনি প্রেমমহাদ্রাবকে গলাইয়া যেন এক করিয়া ফেলেন।

পর দিন দিবাবসানে সন্তোষিণী একাকিনী নিভৃতে বসিয়া আশাভগ্ন মনে আপনার অসহায় অবস্থা চিন্তা করত বিষণ্ণ মুখে ভাবিতেছেন, "বুঝি আমার মনের আশা মনেতেই মিলাইয়া গেল। হায়! এমন দয়ালু বিজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষ হইয়াও তিনি আমার দুঃখ কেন বুঝিলেন না। তবে কি আমি উপেক্ষিত হইলাম? বিজ্ঞানের তত্ত্বরস কি এতই মিষ্ট যে জীবন্ত প্রেমরস ত্যাগ করিয়া তাহাতে মানুষের মন ভুলিয়া থাকে? বুঝিলাম, ইহা আমার অদৃষ্টেরই ফল। হায় আমার জীবন কি ভারবহ হইয়া উঠিল। শুনিয়াছি পাষাণেও বীজ অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু বাঞ্ছারামের হৃদয় কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন?"

সন্তোষিণীর অভিমান করিবার অধিকার ইহার মধ্যে জন্মিয়াছে কি না তাহা বিচার সাপেক্ষ। তথাপি দুঃখ বিষাদের সহিত অভিমানকে মিলাইয়া তিনি বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। এই ভাবে নির্জ্জীব প্রায় হইয়া শোক করিতেছেন, এমন সময় সহসা বাঞ্ছারাম তথায় আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সন্তোষিণীর নয়নে বারিধারা বহিল, তিনি চিত্র পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। বাঞ্ছারাম সে মুখের পানে যেন আর চক্ষু চাহিতে পারেন না, ভগ্নান্তঃকরণে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। কিন্তু তাঁহার পরদুঃখকাতর হৃদয় দয়া স্নেহে গলিয়া গেল। অলক্ষিত অবশ ভাবে ভিতরে ভিতরে প্রেমের অনলও জ্বলিয়া উঠিল। যখন এইরূপ

দশা ঘটিল, তখন হঠাৎ নিমেষের মধ্যে উভয়ের দেহ মনের অভ্যন্তরে যেন তড়িতের প্রবাহ ছুটিল। তাহাতে বাঞ্ছারামের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল, অন্তঃকরণ আলোড়িত হইল, শিরা ও স্নায়ুমণ্ডলে মহাবেগে শোণিত ধারা বহিল, হৃৎপিণ্ডে ঘন ঘন শব্দ হইতে লাগিল, জলপিপাসায় কণ্ঠ শুকাইল, লজ্জা ভয় দুঃখ দয়া মায়া ভালবাসায় মিশিয়া মনের মধ্যে কি একটা মহা কাণ্ড কারখানা হইতে লাগিল। আসল কথাটা এই যে এত দিন পরে ইহাঁরা পরস্পরের নিকট নিঃশংসয় রূপে পরিচিত হইলেন। পরিচয়ের সময় উভয়ের হৃদয়নদীর মিলনস্থলে যে ভয়ানক তুফান উঠিয়াছিল তাহা এক অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার। মনের মানুষকে পাইলে জীব বড় কৃতার্থ এবং আনন্দিত হয়, তাই এই সমারোহ। মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ কালে যেমন বিজলী চমকে, ভীমনাদে অশনি গর্জ্জন করে, এবং সেই মহা আন্দোলনে আকাশ মেদিনী কাঁপিতে থাকে এই মহা প্রেমমিলনে তেমনি একটা ঘোরতর বিপ্লব ঘটিয়া গেল, জীবনতরীর রসা রসি ছিঁড়িয়া একাকার হইল, বানের জলে যেন দুই জনকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। নাবিকদ্বয় তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং প্রতিকূল স্রোতমুখে দৃঢ়মুষ্টিতে হাল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। এই ত্রিভুবনবিজয়ী পরাক্রমশালী প্রেম মহাবীরের সঙ্গে কয় জন যোদ্ধা সংগ্রাম করিতে পারে? তাহার দুর্জ্জয় শক্তি এক হৃদয় হইতে যখন অন্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় তখন এইরূপই ঘটে। ইহা শক্তির সমতা এবং সমন্বয় সাধন। বাঞ্ছারাম সন্তোষিণী অনেক কষ্টে প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তদনন্তর বেগ কথঞ্চিত মন্দীভূত হইলে দ্রুতগামিনী সেই প্রেমতরঙ্গিণীর উদ্বেলিত মধুর হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে উভয়ে উভয়ের মাধুর্য্য রস পান করিতে করিতে প্রেমসিন্ধুর অভিমুখে ধাবিত হন।

মহারসপ্রসূত প্রগল্‌ভা প্রীতির বড় প্রভূত পরাক্রম; যেমন তাহার খরতর তেজ, তেমনি মিষ্টতা কোমলতা; যেমন বিস্তৃতি, তেমনি গভীরতা; এমনি ভয়ঙ্কর তেজ, যে সেই তেজে পুরুষ স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী পুরুষেতে মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া এক অভিনব সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করে। পরস্পরের আদান প্রদানে পরস্পর বিপুল সম্পদশালী হইয়া উঠে। উভয়ের আত্মার

নিদ্রিত বৃত্তি সকল তখন জাগ্রত এবং প্রস্ফুটিত হয়। ইহা একটী নূতন বিধ বিদ্যালয়, এখানকার শিক্ষাপ্রণালীর গুণে পুরুষ-প্রকৃতি মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই জন্য ভক্তিরসবিশারদ বৈষ্ণব সাধুগণ প্রকৃতি পুরুষের আধ্যাত্মিক মিলনের স্বর্গীয় মহত্ত্ব, অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রস বিবিধ ছন্দোবন্ধে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অল্পমতি স্থূলদর্শী বৈষ্ণবদল এবং তান্ত্রীক এই সাধনের পক্ষপাতী, কিন্তু সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত। উচ্চ নীতির অভাবে পবিত্র প্রণালীকে তাহারা ঘৃণার বিষয় করিয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষারম্ভে ইহাতে অনেক কষ্ট। কোন্ শিক্ষাই বা প্রথমে সুখপ্রদ হয়? শিক্ষা, পরীক্ষা, তাহার পর সুখ শান্তি।

সন্তোষিণী ও বাঞ্ছারাম প্রেমতত্ত্ব শিক্ষার জন্য এত দিন পরে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। এক জনের বহু বৎসরের চেষ্টা যত্নে বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন কত দিন ধরিয়া শিক্ষা করিতে হইবে তাহা কে জানে? সম্মুখে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে তাহা কে বলিতে পারে? ভালবাসা স্বর্গীয় অমৃত, তাহা পান করিলে জীব অমর হয় এবং চরমে পরমানন্দ লাভ করে। কিন্তু হায়! এ পৃথিবীতে সে অমিশ্র নির্ম্মল প্রেম কোথায়? প্রেম, তুমি কোথায়? বিবাহের সাত পাকের ভিতরে কি? না বহুমূল্য বসন ভূষণের মধ্যে? অথবা মোহান্ধ ইন্দ্রিয়াসক্ত নরনারীর হৃদয়ে? কোথায় তোমার সন্ধান পাইব? অবশ্য তুমি অসার লৌকিক স্নেহ মমতা, এবং মোহগরলের অভ্যন্তরেই লুক্কায়িত আছ। সেই স্থান হইতেই আমরা তোমাকে টানিয়া বাহির করিতে চাই। স্বভাবের ভিতর তোমার জন্ম, কিন্তু স্বর্গের দিকে তোমার গতি। স্বভাবজাত লৌকিক প্রেম স্বর্গীয় প্রেমের আভাস, সাধনবলে ও ভগবৎপ্রসাদে স্বভাবের অতীত দেববাঞ্ছনীয় পবিত্র প্রেম পরিণামে জীব প্রাপ্ত হয়।

এই অজ্ঞাতসম্ভূত শুভযোগসমুৎপন্ন সহজ প্রেমের বাহ্য লক্ষণের সঙ্গে স্বর্গীয় প্রেমলক্ষণের ব্যবহার ও ভাবগত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা কোন শাসন বিধি বা স্বার্থসম্ভূত পদার্থ নহে; যখন দুইটী অপরিচিত বহিরঙ্গ হৃদয় পরিচিত অন্তরঙ্গ হইয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায় তখনই কেবল সে লক্ষণ লোকে দেখিতে পায়। সামাজিক নিয়ম বন্ধনে যাহাদিগকে বলপূর্ব্বক

স্বামী স্ত্রীরূপে গ্রথিত করে, তাহারা নাচার হইয়া অন্য উপায় না দেখিয়া ভাল বাসিতে বাধ্য, নতুবা তাহাদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডিত, সামাজিক বিচারে অপমানিত হইতে হয়। উনি আমার স্বামী, ইনি আমার স্ত্রী, অতএব আমাদের ভালবাসা উচিত; এই উচিতবোধ প্রথমে পরস্পরকে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ করে। এক দিকে উত্তম বসন ভূষণ, ধন সম্পদ সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রদান, অপরদিকে মিষ্ট বচন, সেবা শুশ্রূষা, স্নেহানুগত্য, প্রেমব্যবহার প্রতিদান; ইহা দ্বারা এবং অন্য পাঁচ প্রকার পীড়াপীড়িতে এক সঙ্গে বসবাস করিতে করিতে, কালক্রমে অল্পে অল্পে নরনারী স্বামী স্ত্রীরূপে পরিণত হয়। ইহাকে বৈধ প্রেম বলে। বিবাহের প্রথম সংস্কারটা একরূপ হাতে খড়ী দেওয়া, তার পর কার কত বিদ্যা হইবে মা সরস্বতী জানেন। বাল্য-বিবাহ আর যৌবনবিবাহ, এ দুইটী কেবল আঁটির গাছ আর কলমের গাছ আমাদের মনে হয়। কোন্‌টা টক কোন্‌টা মিষ্টি, তা ফলেন পরিচীয়তে। পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ আর সামাজিক আহার পান বাজনা বাদ্য, এই হইলেই বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু ইহার অনুরোধে প্রেম সর্ব্বত্র জন্মে না। তথাপি এ সকলকে প্রেম সাধনের বাহ্য উপকরণ বলা যাইতে পারে।

আগে প্রেম, তাহার পর বিবাহ, সুসভ্য এবং অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত। অর্দ্ধসভ্য হিন্দুরা আগে বিবাহ করিয়া তাহার পর প্রেম তৈয়ার করিয়া লয়। জিনিষটা প্রস্তুত হইতে না কি অনেক সময় লাগে, তাই ইহারা বহুদর্শী বিজ্ঞের ন্যায় আট দশ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রেমের চাস আরম্ভ করে। যাঁহারা বেশী বিজ্ঞ তাঁহারা গর্ভস্থ সন্তানের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখেন। সূতিকাগৃহে দুইটিকে যোড়কলম বাঁধিয়া দিলে বোধ হয় আরো ভাল হইতে পারিত। যা হউক, বাল্যবিবাহ প্রথাটা মন্দ নয়, কারণ, যাহাকে আমি বিবাহ করিব, মড়াই মরুক আর চ্যাঙ্গড়াই ছিঁড়ুক, কাঁদিয়া হউক, হাসিয়া হউক, তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে। ইহারা দুই জন যেন সংসাররূপ ব্যবসায়ের জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানী বিশেষ, এক সঙ্গে না থাকিলে ব্যবসায় চলে না। এ প্রেম অবশ্যম্ভাবী, না হইলে আর উপায় নাই। "ধরে বেঁধে প্রেম" ইহাকে বলিতে পার। কিন্তু প্রেমমূলক বিবাহ অপেক্ষা বিবাহমূলক

প্রেম যে একটা নিতান্ত লোকসানের কারবার, ফল দেখিয়া তাহা বড় বোধ হয় না। গড়পড়তায় লাভ শেষ প্রায় সমানই দাঁড়াইয়া যায়। ফলতঃ স্বাধীন প্রেম বড় দুষ্প্রাপ্য, ধরে বেঁধে প্রেমই পৃথিবীতে প্রচলিত। মুক্তপ্রেম অনেক সময় বাঁধ ভাঙ্গিয়া দশ দিকে ছুটিয়া পলায়। বাল্য-বিবাহসিদ্ধ অধীন প্রেম নিরাপদের সামগ্রী, যেন খালকাটা নদী; জল আছে, তাহাতে নৌকা চলে, কিন্তু ডুবিবার আশঙ্কা নাই। ইহাতে প্রেমের বেশী বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু শান্তি আছে। অধিক আমোদ উল্লাস রস বিলাস না থাকিলেও নির্ব্বিঘ্নে জীবন কাটাইবার বেশ সুবিধা আছে।

এ মন্তব্যটা শুনিয়া কোন মহাশয় যেন রাগ না করেন। পৃথিবীর পনর আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া দুই ক্রান্তি নরনারী যখন এইরূপ প্রেম-বন্ধনে চির কাল সুখী হইয়া আসিয়াছে তখন মনে হইতে পারে, "তবে কি আমরা ভূতের বেগার খাটিতেছি? আমাদের স্বামী স্ত্রীরা তবে কি কাষ্ঠ পাষাণে নির্ম্মিত?" না, না, সে কথা নয়; আপনারা দুঃখিত হবেন না। সেই জন্যই আগে থাকিতে আমরা বলিয়া রাখিয়াছি, আপনাদের অবস্থা বেশ নিরাপদ। আপনারা বেশ সুখে আছেন। ছাপোষা গৃহস্থের পক্ষে ইহাই বিধাতার সাধারণ ব্যবস্থা এবং মঙ্গলের বিধান। যাহা প্রয়োজন তাহা আপনাদের আছে। বরং সন্তোষিণী বাঞ্ছারাম এ বিষয়ে নিতান্ত দুর্ভাগ্য। আহা, যখন দম্পতিযুগল একত্রিত হইয়া সন্তানাদিসহ পানাহার, আমোদ প্রমোদ ধর্ম্ম কর্ম্ম গৃহকার্য্য সমাধা করেন, যখন গিন্নী পানটী সাজিয়া কর্ত্তাকে দেন, এবং কর্ত্তাটী প্রেমিক কপোতের মত আহ্লাদে বক্ বক্ বকম্ শব্দ করিতে করিতে তাহা চর্ব্বণ করেন, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর মত দুটীতে যখন মুখোমুখী করিয়া বসিয়া থাকেন, তখনকার শোভা দেখিয়া কোন্ বিবাহপ্রার্থী নরনারীর মন না প্রলোভিত হয়? এক আধটু বিবাদ কোঁদল থাক্, ত'তে কিছু যায় আসে না। স্ত্রী যদি কর্কশভাষিণী মসিবরণী পেত্নীর মতনও হন, কিম্বা স্বামী মহাশয় যদি ভগ্নদন্ত পক্বকেশ কুব্জপৃষ্ঠ খঞ্জপদও হন, অথচ উভয়ের মধ্যে যদি বাজার চলন প্রেমবন্ধন থাকে, তাহা দেখিয়া কে না হিংসায় মরিবে? আমাদের বিকট বাবুর কপালে

তেমন একটা জুটিলে তিনি কৃতার্থ হইতেন। কিন্তু আমরা না কি মহারস কাব্যের পত্তন ফেলিয়াছি, সুতরাং এখানে ঘনীভূত মূর্ত্তিমান আদর্শ প্রেম প্রয়োজন। এই জন্য প্রচলিত বিধির বহির্ভূত প্রগল্ভ প্রেমের সঙ্গে সাধারণ প্রেমের তারতম্য এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

সে কথা এখন থাক, যাহা বলিতেছিলাম সেটা আমরা শেষ করিয়া লই। হিন্দু স্ত্রীরা বেশ লোক, যেন জাহাজের ল্যাংবোট, সঙ্গ ছাড়ে না। তুমি খ্রীষ্টান হও, সেও খ্রীষ্টানী হইবে। জাতি কুলে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রাহ্ম হও, সেও গঙ্গাস্নান শিবপূজা ব্রত উপবাস ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মিকা হইয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বুঁজিবে। আবার যদি তুমি পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অর্দ্ধহিন্দু কি পূরো হিন্দু, অথবা না হিন্দু না মুসলমান হও, সেও ঠিক তাই হইবে। অর্থাৎ তুমি যে দিকে যাবে, সেও পাছে পাছে সেই দিকে যাবে। ভোগেতে সুখেতে জীবনে মরণে পাপে ধর্ম্মে বিধর্ম্মে অধর্ম্মে স্বর্গে নরকে কোন অবস্থাতেই তাহাকে তুমি অতিক্রম করিতে পারিবে না। বিলাতে গিয়া হ্যাট কোট পরিয়া যদি তুমি সাহেব সাজিয়া দেশে ফিরিয়া আস, রাতারাতির মধ্যে তোমার স্ত্রীও গাউন পরিয়া মেম সাজিয়া তোমার সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া যাবে, টেবিলে খানা খাবে, ঘোড়ায় চড়িবে। (পড়ে হাত পাটা না ভাঙ্গে এখন এই প্রার্থনা।) যোদ্ধা তুমি বিলাতে গিয়া যাহা না পারিয়াছ, সে দেশে থাকিয়া তাহা অপেক্ষা এক কাটি বাড়াইবে। বিলাতী বিবির ফাদারেরও সাধ্য নাই যে তেমন করিয়া চলিতে পারে। বলিহারী বাঙ্গালীর মেয়েকে! কিছুতে পিছ পা নয়। হিন্দুস্থানের এ প্রেম বড় মজার জিনিষ। যদি মরিতে যাও, স্ত্রী তোমার সঙ্গে মরিতেও রাজী আছে। তুমি মৃত্যুর পর পুড়িবে, সে জীয়ন্তে পুড়িয়া মরিবে। তার নাম এই জন্য সহধর্ম্মিণী। কাঁটালের আটা, শেয়াকুলের কাঁটার মত তার প্রেম। তুমি ইহাতে জ্বালাতন হও, আর দন্ত কিটিমিটি কর, আর আঙ্গুল কামড়াও, সে তোমায় ছাড়িবে না। বিলাতফেরত সাহেব বাবু, তুমি কে মনে ভাবিতেছ, কোন রকমে পৈতৃক ওল্ড অশিক্ষিত নেটিভ স্ত্রীটাকে গেট্ রিড্ করিয়া আর একটা মেম বিবাহ করিবে তা বড় হচ্চে না! যদি

আর পাঁচটা সতীন আসিয়া তাহার প্রেমে ভাগ বসায়, তবু সে তোমার একটা পা লইয়া টানাটানি করিবে। কিন্তু হায়! সে সুখের দিন ক্রমে চলিয়া গেল, আর রয় না! বস্তুতঃ হিন্দু স্ত্রী যেন ছিনে জোঁকের মত নাছোড়বান্দা। চাকরীর স্থান হইতে দুই চারি বৎসরান্তর একবার আসিয়া যদি দেখা দাও, তাতেই সন্তুষ্ট। মিষ্টই লাগুক আর তেতই লাগুক, তাহার হাত এড়াইতে পারিবে না। যদি উদাসীন হইয়া নির্ব্বাক থাক, সে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়িবে, নাকে কাঁদিবে, অবিশ্রান্ত বকিবে। যদি ক্রোধ অভিমান করিয়া উপবাস কর, সে তোমার মুখে ভাল ভাল খাদ্য গুঁজিয়া দিবে। "না দেখলে বইতে নারি, দেখলে করে চুলোচুলি।" সংক্ষেপে এই সে প্রেমের লক্ষণ। ভাল কি মন্দ তাহা তোমরা এখন বিচার সিদ্ধান্ত কর, কিন্তু পত্নী পেত্নীর মত চির কাল তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। যদি সে আগে মরে, তবে তোমার বাড়ীর চারি ধারে প্রেতাত্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে আর বলিবে, "আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি যেখানে যাবে আমি তোমার কাঁচা ধ'রে ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।" ইহাকে এক প্রকার জবরদস্তির প্রেম বলা যায়।

কিন্তু শুভ সংযোগে যখন পুরুষের হৃদয় নারীহৃদয়ের সহিত সম্মিলিত হয় তখনই উপর উল্লিখিত মহারসের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোপীগণের সঙ্গে না কি শুনিতে পাই কৃষ্ণের প্রেম এইরূপ ছিল। সত্য মিথ্যা গোবিন্দ জানেন। ফলতঃ এইরূপ মহাপ্রেমের ভিতর বিধাতার বেশ লীলা খেলা আছে।

এক্ষণে যে প্রেমের কাহিনী আমরা লিখিতেছি তাহা গরলমিশ্র। যখন এই গরল মন্থনে অমৃত উঠিবে, তখন পূর্ণ প্রীতি ভয়কে পরিহার করিয়া সেই অনন্ত প্রেমসিন্ধুতে গিয়া মিশিবে। যে মহাবীর প্রেমিক আত্মা এই হলাহল জীর্ণ করিয়া তাহাকে অমৃতে পরিণত করিতে পারেন, তিনি মহাযোগী শঙ্করের ন্যায় নির্ব্বিকার চিত্তে মহাসতী গৌরীকে উরুদেশে বসাইয়া নিত্যকাল নিত্যানন্দ রস পানে কৃতকৃতার্থ হন। আমাদের প্রেমিক পণ্ডিত বাঞ্ছারাম এখন গরল হইতে অমৃত উদ্ধারের জন্য সাধন আরম্ভ করিলেন। এ সাধন মহা মহা যোগী তপস্বীদিগেরও অসাধ্য।

অনেকে এ পথে পদার্পণ করে না,. কারণ বারুদের সঙ্গে আগুনের বন্ধুতা স্থাপন ইহার উদ্দেশ্য। সচরাচর লোকে বৈধপ্রেমের আবরণে ভদ্রতা বাঁচাইয়া ইচ্ছামত জীবন যাপন করে। আইনে তাহাদের সাত খুন মাপ। কিন্তু হরগৌরী, কি রাধা কৃষ্ণের প্রেমের উপমা দিয়া, আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা মুখে বলেও আবার অনেকে; কাজের বেলায় কার কত দূর উচ্চ পবিত্রতা রক্ষা পায় তাহা কেবল অন্তর্যামী পুরুষ জানেন। যাহাই হউক, যখন নীতির নির্ম্মল ভূমিতে নির্ব্বাণের বিশুদ্ধ সমীরণমধ্যে এই প্রেম আপনাপনি অঙ্কুরিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন আমরা ইহা হইতে পরিণামে অবশ্যই মোক্ষ ফলের আশা করিতে পারি। সাধু ভক্ত পাঠকগণ ধৈর্য্যসহকারে আরো কিছু কাল অপেক্ষা করুন, সবুরে মেওয়া ফলিবে। পৃথিবীতে যাহা সচরাচর দেখা যায় না, পবিত্র চরিত্র জ্ঞানী বাঞ্ছারামের জীবনে তাহা আমরা দেখিতে পাইব।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহোল্লাস।

যে দুরতিক্রমণীয় শক্তির প্রভাবে বাঞ্ছারামের মত কঠোর নির্ম্মম নিস্নেহ ধীর গম্ভীর চিত্ত বিচঞ্চল এবং প্রেমোন্মত্ত হয় তাহা সামান্য শক্তি নহে। ইহাকে মায়াশক্তি অবিদ্যা বল, ছায়া অপদার্থ বল, আর কালকূট গরলই বল, যে কোন ঘৃণার্হ নিন্দনীয় শব্দে অভিহিত করিতে চাও কর, কিন্তু পৃথিবী ইহার দুর্জ্জয় প্রতাপে সর্ব্বদা সশঙ্কিত এবং ব্যতিব্যস্ত। ইহা অসৎ হইয়াও কার্য্যতঃ সৎরূপে প্রকাশিত হয়। এমন কি, মায়াবাদী সংন্যাসী বা ষ্টোয়িকদিগের ন্যায় বিকট বদনে কর্কশ স্বরে তীব্র ভাষায় যাহারা ইহার দোষ ঘোষণা করে, ভিতরে ভিতরে এপিকিউরিয়াণের মত তাহারাও ইহার সেবায় আমোদিত হয়। এমন লোকও আছে, যাহারা নিন্দা কুৎসার ছলে অন্তরের নিকৃষ্ট কামনা চরিতার্থ করিয়া লয়। বাঞ্ছারাম ত বাঞ্ছারাম, কত কত মুনি ঋষি যোগী তপস্বীর বহু বৎসরের কঠোর সাধন, দুশ্চর তপস্যার ফল এই মায়াশক্তি প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার অনিষ্টকারিতা পণ্ডিত নিতান্ত অনবগত ছিলেন না। সাময়িক মোহ-বিকার প্রেম নামে সচরাচর গৃহীত হয় ইহাও তিনি বুঝিতেন। এই জন্য তিনি এখন সন্তোষিণীর প্রেমের গভীরতা এবং সারবত্তা নিরূপণ করিতে বসিলেন।

কোন কার্য্যই বাঞ্ছারামের জ্ঞান বিজ্ঞান ছাড়া নয়। বুদ্ধি যুক্তির তীক্ষ্ণ দন্তে তাবৎ বিষয় খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা চির অভ্যাস। প্রেমিক ভাবুক হইয়াও তত্ত্বানুসন্ধানস্পৃহা কমিল না, বরং তাহা আরো সরস এবং উজ্জ্বল

হইল। প্রেমসম্ভোগ অপেক্ষা প্রেমের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অধ্যয়নের প্রতি তাঁহার আগ্রহ অধিক জন্মিল। এক্ষণে তিনি এক নবীন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আর এক নূতন পথে চলিলেন, নূতন আলোকে নূতন চক্ষে জগৎসংসার দেখিতে লাগিলেন। মধুর প্রেমানুরাগে নয়ন অনুরঞ্জিত হইল। সে মানুষও আর নাই, সে পৃথিবীও আর নাই, সমস্তই একবারে যেন রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। বাঞ্ছারাম যাহা শুনেন, যাহা দেখেন সব যেন কেমন এক-প্রকার নবতর সুমিষ্ট এবং অতীব রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। জগতের প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক জীবকে ভালবাসিবার জন্য তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। এক ব্যক্তির প্রেমলাভ করিয়া তিনি মানবজাতিকে ভালবাসিতে লাগিলেন। এই জন্যই বোধ হয় সম্বন্ধীকে লোকে এত ভালবাসে। সমস্ত ভূমণ্ডল একটী সুরম্য প্রমোদ কাননের ন্যায় তাঁহার চক্ষে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সকলি মধুময়।

অনন্তর তিনি সেই নবজাত প্রেমসুধাপানে বিভোর হইয়া নিশানাথের গৃহসংলগ্ন উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের সোপানের উপর বসিলেন। বসন্তসমাগমে প্রকৃতি নবীন বেশ পরিধান করিয়াছে। নানা দেশ দেশান্তর হইতে বিচিত্র বিহঙ্গ সকল আসিয়া জুটিয়াছে। তাহাদের মধুর কূজনধ্বনিতে উপবন কুঞ্জকানন ধ্বনিত হইতেছে। যেন যাত্রাদলের ছেলেরা চারিদিকে ছড়াইয়া গীত গাইতেছে। সরসীর নির্ম্মল সলিলের উপর দিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ বায়ু বহিয়া অঙ্গে লাগিতেছে। কামিনী ও গোলাপকুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী ও মক্ষীকাগণের মহামহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে। চ্যুতমুকুলের মধুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। বাঞ্ছারামের হৃদয়ে মধুর প্রস্রবণ উৎসারিত, বাহিরে বসন্ত ঋতুর শোভায় প্রকৃতি সুসজ্জিত সঞ্জীবিত। সরস বৃক্ষপত্রাবলী, কুসুমিত তরুকুঞ্জ, মুকুলিত চ্যুতশাখা সকল শ্যামল সৌন্দর্য্য এবং বিপুল ঐশ্বর্য্যভরে মলয় মারুতের মৃদু হিল্লোলের সঙ্গে খেলা করিতেছে, সরসীর স্বচ্ছনীরে তাহার প্রতিবিম্বিত ছায়া আন্দোলিত হইতেছে। বাঞ্ছারাম সেই নববসন্তের প্রেমালিঙ্গনে আলিঙ্গিত হইয়া কুসুমপরিমলবাহী সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করিতে করিতে একাকী যেন মাধুর্য্য রসসাগরে ডুবিয়া যাইতেছিলেন। জীবনের এই অংশটী

তাঁহার পক্ষে বড়ই সুখকর হইয়াছিল। এইভাবে কিছু কাল আনন্দ সম্ভোগ করেন মনে বড় ইচ্ছা। এত দিন পরে এই বিস্তীর্ণ ধরাধামে একজন সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী তিনি পাইয়াছেন, কিছু কাল সুখভোগ করুন এটা আমাদেরও ইচ্ছা। আহা! ভদ্রসন্তান বড় মনঃপীড়া পাইয়াছে। তাহার বিজ্ঞানদগ্ধ, শোকসন্তপ্ত নীরস হৃদয়ে একটু প্রেমামৃত বর্ষিত হউক! কেবল কি "অলরাইট্ ত্যাঙ্কিউ" বলিয়া বেড়াইলে প্রাণ বাঁচে? অন্ততঃ একজনও ভাবের ভাবুক চাই। আজ কালের দিনে দুইটী লোককে অকৃত্রিম প্রেমে মিলিতে দেখিলে মনে আশা হয়। প্রাণের দোসর জীবনসহচর অভাবে মনুষ্য বড় কষ্ট পায, পৃথিবী যেন তাহার পক্ষে অরণ্যভূমি।

কিন্তু মানবের অদৃষ্ট চক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে; অদ্য পূর্ণচন্দ্রের কমনীয় জ্যোৎস্নায় হৃদয়সিন্ধু উদ্বেলিত, কল্য অমানিশার ঘোর অন্ধকার আবরণে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমাচ্ছন্ন। সে ভগবানের হাতের খেলার সামগ্রী। ভগবতী মহাবিদ্যার ক্রোড়স্থ শিশু সন্তান। অনন্তরূপিণী লীলাময়ী মা তাহাকে লইয়া প্রতিক্ষণে নব নব রঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। কখনো হাসাইতেছেন, কখনো কাঁদাইতেছেন। ঘোর বিপদান্ধকারে ফেলিয়া কখনো ভয় দেখাইতেছেন, কখন কৃপালোক দেখাইয়া আশা আনন্দে পুলকিত করিতেছেন। তাহাকে উচ্চ আকাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার কোল পাতিয়া লুফিয়া লইতেছেন। এইরূপে তিনি গাদা পিটাইয়া ঘোড়া, ঘোড়া হইতে মানুষ, মানুষ হইতে দেবতা প্রস্তুত করেন। ছেলের সঙ্গে ছেলেমি করা তাঁহার চিরকালের রোগ। মা আমাদের পাগলিনী উন্মাদিনী। বাঞ্ছারামকে তিনি সংসারচক্রে ক্রমাগত ঘুরাইতেছেন। তাহার এই সুখের আরম্ভ এবং শেষ। অথবা উচ্চতর মহাভাব সাধনের জন্য যাহার জীবন, পার্থিব সুখে সুখী হইলে তাহার চলিবে কেন? ইহজীবন তাহার সংগ্রামের জন্য। মা আনন্দময়ী যথা সময়ে তাহাকে শান্তি দান করিবেন।

বাঞ্ছারাম উদ্যানস্থ সরসী তটে বসিয়া আছেন, সন্তোষিণী বাড়ীর এ ঘর ও ঘর ছাদ বারাণ্ডা নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া কোথাও না পাইয়া শেষ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রেমযজ্ঞের যাবতীয় উপকরণ সংগৃহীত হইল। বাঞ্ছারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বল দেখি সন্তোষিণী, কেন তুমি

আমায় এত ভাল বাসিলে? আমিত হতভাগ্য গৃহবহিষ্কৃত পুস্তকের কীট, নীরস পাষাণ সদৃশ, না আছে রূপ গুণ, না আছে ক্ষমতা শক্তি; আমার নিমিত্ত তোমায় এত ব্যাকুলতা কেন জন্মিল? আমি নিষ্ঠুর কঠোর অপ্রেমিক, নারীর মর্য্যাদা আমিত কিছু জানি না। নিজের দুঃখ বহন করিতে আমি ভীত নহি, কিন্তু আমার অন্য এক জন দুঃখ পাইবে এটা বড় অসহ্য। বিজ্ঞানোন্মাদের হাতে পড়িয়া শেষ কি কষ্ট পাইবে? আমার মন সংশয় আঁধারে আবৃত, কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহাকেও আমি কোন বিষয়ে সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু তোমার ভালবাসায় আমি বড় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তোমার দুঃখে আমার প্রাণ নিরন্তর কাঁদিতেছে, কিছুতেই বারণ মানিতেছে না। আমার এ জীবন যদি তোমার কোন কাজে আসে তাহা আমি উৎসর্গ করিয়া রাখিলাম। তুমি সুখী হও, সদা হাস্য বদনে নির্ব্বিকার মনে প্রীতি প্রদান দিয়ে কাল যাপন কর ইহাই কেবল আমি দেখিতে চাই।"

যে বাঞ্ছারামের সাত চড়ে কথা বাহির হইত না তাহার কণ্ঠে যেন দেবী সরস্বতী আবির্ভূত হইলেন। একটু বিলক্ষণ মত্ততার সহিত তিনি হৃদয় খুলিয়া কথা কহিতে লাগিলেন, প্রাণটা যেন সমস্ত তাঁহাকে ঢালিয়া দিলেন। মাতৃবিয়োগ অবধি ভালবাসা কি সামগ্রী তাহা এত দিন জানিতেন না, পৃথিবীতে সচরাচর যে ভালবাসা দেখিতে পাইতেন তাহাতেও লোভ জন্মিত না, এক্ষণে সন্তোষিণীর সরল মধুর প্রেমপীযূষ পান করিয়া মত্ত হইয়া উঠিলেন। ভাবোন্মাদের বিরাম নাই, কথারও শেষ নাই, নবীন প্রেমিকের প্রেমকাহিনী কিছুতেই আর ফুরায় না। সে দিন ভাবের আবেশে বাঞ্ছারাম কত কথাই যে বলিয়া ফেলিলেন, তাহা আর লিখিয়া শেষ করা যায় না। তোমার আমার পক্ষে সে সব কথা ভালও লাগিবে না, বরং বিরক্তিকর বোধ হইবে। প্রণয়ীদিগের পরস্পর গূঢ় প্রণয়ের অফুরন্ত কথা কেবল তাহাদেরই ভাল লাগে। তাই আলাপ করিতে বসিলে আর তাদের জ্ঞান থাকে না। আমরা গৃহী জীব, খাটিয়া খাই, ইহাদের প্রেমকাহিনী শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া বালামের দর কত, তাই এস এখন আলোচনা করি।

অনন্তর বাঞ্ছারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে ভালবাসা, অর্থাৎ আত্ম-

সমর্পণের ভালবাসা ইহা কি তোমার একটী সাময়িক উত্তেজনা? ইহা যে উষ্ণদুগ্ধোৎপন্ন ফেনপুঞ্জের ন্যায় নারীস্বভাবসুলভ তরলতার পরিচয় নয় তাহা আমি কিরূপে বুঝিব?' হটাৎ দেখছি বিপদ। অকৃত্রিম প্রেমে কাপট্যের বিন্দুমাত্র অভিযোগ অসহ্য, অথচ অত্যন্ত প্রেমের ভিতর অত্যন্ত কপটতা লুকাইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত হইলেও, সন্তোষিণীর বক্ষে যেন শেল সম বাজিল। তিনি ব্যথিত অন্তঃকরণে ভগ্নস্বরে বলিলেন, "সাময়িক কি স্থায়ী তাহা জানি না, কিন্তু বহুবৎসরের পোষিত, আত্মকর্তৃত্বের অতীত, অবস্থ এবং ফলাফল নিরপেক্ষ এই মাত্র জানি। বিচার তর্কের দ্বারা কি আমি আমার আন্তরিক ভাব তোমাকে বুঝাইতে পারি? স্বভাবের কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

উত্তরটী হৃদয়ের তারে তারে বাজিল, তাহাতে ঝঙ্কার উঠিল, সে মধুর ধ্বনি প্রাণে প্রাণে মিলিয়া গেল।—যেমন বীণার ঝঙ্কার আকাশে মিলাইয়া যায়। তখন বাঞ্ছারাম আহ্লাদিত চিত্তে বলিলেন, "আচ্ছা, আমার দেহ যদি কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট হইয়া রোগশয্যায় মৃতবৎ পতিত থাকে বাক্য বন্ধ হইয়া যায়, আন্তরিক ভাব প্রকাশের সমস্ত উপায় বিনষ্ট হয়, সে অবস্থাতেও কি তোমার এ ভালবাসা রক্ষা পাইবে?"

উত্তর। আমার প্রেম অস্থি মাংসের উপর নয়, কিন্তু তাহা দ্বারা তোমার সমস্ত অঙ্গ অত্যঙ্গ ব্যবহার আচরণ সুমিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চিন্তাশীল বিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা সচরাচর কিছু তালজ্ঞানহীন নির্ব্বোধ হয়, সেই জন্য আমরা বাঞ্ছারামকে এ যাত্রা ক্ষমা করিলাম। এরূপ অবিশ্বাসবিজৃম্ভিত কথা পুনরায় যদি তাঁর মুখে বাহির হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতকে আমরা সমুচিত দণ্ডবিধান করিব।

সন্তোষিণীর আড়ম্বরবিহীন সরল সহজ উত্তর শ্রবণ করিয়া বাঞ্ছারাম একটু অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হইলেন এবং হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বলিলেন, "সে যাহা হউক, আমার প্রাণ কিন্তু ইহাতে বড় মিষ্ট বোধ হইতেছে। তোমার মধুর ভাব আমাতে সংক্রামিত হইয়া আমাকে বড় সুখী করিয়াছে। এখন ইচ্ছা হইতেছে একবার খুব হাসি। তোমার চিত্তবিনোদন উন্মাদকর হাসির সহিত হাসি মিলাইয়া প্রাণ খুলিয়া হাসি।

হাসিটে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইহার ভিতর কত গভীর বিজ্ঞানই আমি পাঠ করিতেছি! বড় বড় বিজ্ঞান দর্শনে এত রস পাই নাই। মনুষ্যের হাসি যেন সেই অনন্তের প্রেমউদ্যানের একটী মাধুরীময় প্রস্ফুটিত কুসুম। দন্তোষ্ঠ ব্যতীত আরো কিছু নিগূঢ় বিজ্ঞানরহস্য ইহার ভিতর লুক্কায়িত আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাময়িক মত্ততার তরলপ্রেমের হাসি, আর স্থায়ী বিশ্বাসের হাসি এ উভয়ের মধ্যে বোধ হয় অনেক প্রভেদ।"

বৈজ্ঞানিক প্রেমের সন্দেহমিশ্র বাক্যালাপ শ্রবণে সন্তোষিণীর কোমল হৃদয় বারম্বার বড ব্যথা পাইতে লাগিল। তিনি একটু অভিমান এবং বিরক্তির ভাষায় তখন বলিয়া উঠিলেন, "তোমার বিজ্ঞানবিচারের জ্বালায় আমার হাড় জ্বালাতন হইয়াছে। কি কষ্ট যে তুমি আমাকে দিয়াছ, তাহা জান না, যদি জানিতে তাহা হইলে কখন দিতে পারিতে না। আমার ভালবাসা উষ্ণ দুগ্ধের ফেনার মত, কি ঠাণ্ডা পাথরের মত তাহা আমি জানি না, কেবল জানি যে তুমি আমার সর্ব্বস্ব।"

বাঞ্ছারামের হৃদয় হইতে বিজ্ঞানের ভাঁটা সম্পূর্ণরূপে এখনো সরিয়া যায় নাই, ভাটার টান থাকিতে থাকিতে তাহাতে প্রেমের জোয়ার দেখা দিয়াছে, মাথার উপর দিয়া এক দিন একটা কোটালে বানও ডাকিয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে দুই একটা সন্দেহের কথা শুনিয়া সন্তোষিণীর কিন্তু বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। সংশয়বাদী বিচারপ্রিয় লোকদের এই রূপই দশা। বাঞ্ছারাম বিজ্ঞানের ঝোঁকেই এখনো কথা কহিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "তোমার কথায় আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাই। তবে মানুষ কি না সচরাচর বড় ভাবপ্রবণ, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি, সেই জন্য একটু আলোচনা করিয়া দেখিতেছি। আর যতটা বেশী মনে করিতেছি, পরিমাণে তোমার তত প্রেম আছে কি না সেটাও জানা আবশ্যক। কেহই আমরা আত্মপ্রতারিত না হই এই ইচ্ছা। রূপজনিত মায়া আর প্রেম এ দুইয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে।"

সন্তোষিণী এ সকল কথা শুনিয়া একবারে যেন বিশ হাত জলের নীচে পড়িয়া গেলেন। ভাবিলেন, "এত কালের চেষ্টায় যাহা হইল, তাহা

বুঝি শেষ বিজ্ঞানের কঠোর বিচারে নামঞ্জুর হইয়া যায়।” কিন্তু আমরা বলিতেছি, সে ভয় করিবার আর দরকার নাই, ঠিক জায়গায় গিয়া লাগিয়াছে, পুরুষের স্বভাবে প্রকৃতি মিশিয়াছে। বাঞ্ছারাম যাহা বলিতেছেন, তাহা শুনিয়া যাও। পাঠক মহাশয়রাও অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিলে চরমে পরম পদ প্রাপ্তি হইবে।

বাঞ্ছারাম বলিতে লাগিলেন, “আমি ভাবুক প্রেমোন্মত্ত কল্পনাপ্রিয় অবৈজ্ঞানিক লঘুচিত্ত লোকদিগকে বড় অপদার্থ জ্ঞান করি। সেই কারণে কবি কাব্যকার কাব্যপাঠক, কিম্বা যাহারা নাট্যাভিনয় করে, বা দেখে, যাহারা গান গায়, নাচে, বেশী হাসে, ফুলের মালা গলায় দেয়, পানতোয়া রসগোল্লা খায়, তাহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা হয় না। সেলী, বাইরণ, গেটে, জর্জ্জ ইলিয়ট, কালিদাস সেক্সপিয়ার ইহাদিগকে আমি প্রশংসা করি না। যাহাদের রচিত গ্রন্থের আগা গোড়া সমস্ত মিথ্যা, তাহাদের হৃদয় এবং মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই কল্পনাবিকারগ্রস্ত; এ সকল লোকের সারবত্তা কিছুই নাই। ইহারা ভাবে গলিয়া সত্যের প্রতি অন্ধ হয়। কবিকল্পনা অপেক্ষা কি বৈজ্ঞানিক সত্য অধিক আশ্চর্য্যজনক নহে? সুরাপায়ী আর ভাবুক এ দুই তুমি সমান জানিবে। যেটা স্পষ্ট জানিতেছি সত্য নয়, তাহা পাঠে লোকের আমোদই বা কেমন করিয়া জন্মে আমি বুঝিতে পারি না।”

“কতকগুলি মিথ্যা কথা সাজাইয়া কেহ হইলেন কবি, কেহ হইলেন কাব্যকার! একটা কথাও সত্য নয়, অথচ এমনি রচনা যেন লেখক সব নিজচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন। আচ্ছা বাপু, তুমি কি অন্তর্যামী, না সর্ব্বদর্শী? স্ত্রী পুরুষ কে কোথায় গোপনে কি কথা কহিয়াছে, কি ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছে, তুমি তা জানিলে কিরূপে? তাহারা কি তোমাকে মনের মধ্যে বসাইয়া প্রণয়ালাপ করিয়াছিল? না তুমি গ্রন্থ লিখিবে বলিয়া তোমাকে কাছে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল? পড়িলে মনে হয় গ্রন্থকার যেন বহুরূপী। খুব চতুরালী বটে, বেশ ক্ষমতা। কিন্তু সব মিথ্যা। আপনিই তিনি এক সময় প্রণয়ী, আবার অপর সময় আপনিই প্রণয়িণী। কখন ভণ্ড, কখন সাধু, কখন অপরাধী, কখন বিচারপতি। আপনিই

হাস্‌ছেন, আবার আপনিই কাঁদছেন। কি এ সব ছেলেমানুষী! ছি! ভাল লাগে না।

সন্তোষিণী। তা ভাই আমি কি করিব বল। আমি ত কাব্য লিখিতে কাহাকেও বলি নাই, নিজেও লিখি নাই। কল্পনাকে সত্য বলিয়াও কখনো বুঝি নাই।

বাঞ্ছারাম হাসিয়া বলিলেন, "আরে মাই ডিয়ার লেডি, তাই বল্‌ছি। মিথ্যা লইয়া এত বাড়াবাড়ি কেন?"

সন্তো। তুমি যে দেখছি ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাইতে বসিলে। তাদের সঙ্গে আমার সংশ্রব কি? আমি কি তোমার কাছে কবি, না কাব্য-লেখক পণ্ডিত? আমার ভালবাসা কি তুমি কবিত্ব কল্পনা মনে কর? অত যাচাই করিলেত আর বাঁচা যায় না।

বাঞ্ছা। না, না, তা কেন কব্‌ব। এর মানে এই যে ভাবান্ধ প্রণয়ী আর কবি এরা এক জাতীয় লোক। ইহাদের মধ্যে ফিলোজফিকেল্‌ সিকোয়েন্স আছে।

সন্তো। এরূপ জ্ঞান না হইলে আর তুমি আমাকে এত কষ্ট দাও। কত দিন যে তুমি আমায় কাঁদাইয়াছ, তা আর কি বলিব। দুই একটা সুখ দুঃখের কথা বলিব মনে করিয়া কাছে দাঁড়াইলাম, আর তুমি কেতাবে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিলে। যেন বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়া গিয়াছে। এক এক বার এমনি রাগ হইত যে বই গুল সব টেনে ছুড়ে দূর করে পুকুরজলে ফেলে দিই।

পুনরায় বাঞ্ছারাম বলিলেন, "তুমি যে আমাকে এত ভালবাসিতে তাহা আমি কিছুই জানিতাম না।"

এ কথা শুনিয়া এবার সন্তোষিণীর হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি চমৎকৃত হইলেন, এবং বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে বলিলেন, "আমি যে তোমাকে আজ বার চৌদ্দ বৎসর হইতে ভালবাসিয়া আসিতেছি, ররং বেশী হবে তবু কম নয়, তাহা কি তুমি জানিতে না? কেন আমি তো অনেক সময় আমার ভাবের সুস্পষ্ট উত্তর তোমার নিকট পাইয়াছি; তবে জানিতে না তাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?"

ইহা শুনিয়া বাঞ্ছারাম একটু দুঃখিত এবং কুণ্ঠিত হইলেন এবং মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যদি পারিতাম, তাহা হইলে এত দিন আমি আরো সুখী হইতাম। আমার মন এত দিন এ পৃথিবীতে ছিল না, বিজ্ঞানচিন্তায় আমি ডুবিয়াছিলাম।"

সন্তোষিণী। সে কি! আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি যে পরিষ্কার বুঝিয়া আসিয়াছি, আমি যেমন ভালবাসি তুমিও তেমনি আমায় ভালবাস। তুমি হয়তো আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছ।

বাঞ্ছা। না সন্তোষিণী, তামাসা কাহাকে বলে আমি কিছুই জানি না।

সন্তো। তাইত. কিছুতেই যে আমি ইহা মনে করিতে পারিতেছি না! দুই এক দিনের কথাত নয়, পুনঃ পুনঃ যে আমি ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি জ্ঞান সকলেই কি তবে আমাকে উপহাস করিয়াছে?

বাঞ্ছা। তা সম্ভব। আমি এক জন সে বিষয়ে ভুক্তভোগী। কত বিধ মত বিশ্বাস জ্ঞান সংস্কার এই জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ বদল করিতে হইয়াছে। বাস্তবিক সময়ে সময়ে বুদ্ধিবৃত্তি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ মানুষকে প্রবঞ্চনা করে। তা না হইলে আমি কি সহজে সংশয়বাদী হইয়া রহিয়াছি?

সন্তো। যা হউক, বড় কৌতুকের বিষয়। আমার মাথার ভিতরটা যেন কেমন গোলমাল বোধ হইতেছে। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা ঠিক করিতে পারিতেছি না। তোমার ভুল হয় নাইত?

বাঞ্ছা। তাই বা কি জানি, আমিত এই রোগে চিরকাল ভুগিতেছি। এখন যাহা বলিতেছি বা বুঝিতেছি তাহার ভিতর কত ভুল আছে না আছে কে ঠিক করিয়া দিবে? সত্য নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন কাজ। কিন্তু এ কথা বলিলে লোকে এখনি পাগল মনে করিবে। সাধে কি মানুষ পাগল হয়? কে বুঝে, কেই বা বুঝায়? যে বুঝায় সেই বুঝে; সুতরাং সে যদি ভ্রান্ত বিকৃত হয়, তাহা হইলে সমস্ত জগৎটা কেবল ভ্রান্তিরই বিলাস। থাক, আর ও সব ভাবিতে পারি না, এখন প্রেমের মিষ্টতা একটু উপভোগ করি।

সন্তোষিণীর এই সকল পরিতাপের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তার পর বাঞ্ছারাম নিতান্ত ভীত ও সঙ্কুচিত মনে বলিলেন, "তাইত, তবে কি তুমি ভুলক্রমে অপাত্রে প্রাণ সমর্পণ করিয়া এখন কষ্ট পাইতেছ? বাস্তবিকত এটা ভুলই বটে। ভালবাসা কি তবে এখন আবার ফিরাইয়া লইবে? আহা এক্ষণে তবে উপায়। অন্যের প্রাপ্য আমি কেন লইলাম?" নির্দ্দোষচরিত্র সরল হৃদয় বাঞ্ছারামের নিস্বার্থ ভাবের কথা শুনিয়া সন্তোষিণী মহা আহ্লাদে গভীর হাসি হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিতে হাসিতে চক্ষে জল বাহির হইয়া পড়িল। পূর্ব্বের সমস্ত দুঃখকাহিনী স্মরণপথে জাগিয়া উঠিল। ক্রন্দনের অশ্রু শুকাইতে না শুকাইতে সেই মুখে আবার হাসির জ্যোৎস্না দেখা দিল। বাঞ্ছারামের ঘটে যদি একটু কাব্যরস থাকিত, তাহা হইলে তিনি হাসি কান্না এক সঙ্গে দেখিয়া বলিয়া ফেলিতেন, "রোদ হচ্চে জল হচ্ছে শেয়াল কুকুরের বিয়ে হচ্ছে।"

পরে সন্তোষিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না, না, ফিরাইয়া আর লইতে হইবে না, সে জন্য তুমি কুণ্ঠিত হইও না। আমি ঠিক পাত্রেই প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, আসল কাজে কোন ভুল হয় নাই, কেবল মনে বড একটা গ্লানি অনুভব করিতেছি যে এত ভুল আমি কেন বুঝিলাম? দুই একটা ঘটনাত নয়, শত শত ঘটনা কথা ব্যবহার, সে সমস্তই কি তবে কল্পনা?"

বাঞ্ছারাম মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিতে লাগিলেন, "তা কি জানি, কিছুইত বুঝিতে পারিতেছি না। হয়তো তুমি ভালবাসার প্রমাণরূপে যাহা যাহা দেখিয়াছ তাহার মধ্যে কতক কতক সত্যও থাকিতে পারে। কিন্তু আমার কিছু মনে পড়িতেছে না। যা হইবার হইয়াছে, এজন্য তুমি আর আমার কোন অপরাধ লইও না।

সন্তোষিণী পুনর্ব্বার অট্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে পুলিসে দিব, যাবে কি? না জেলখানায় পাঠাব? অপরাধের কথা হইতেছে না, আমি যে কি নির্ব্বোধ মূর্খ তাই কেবল ভাবিতেছি।" পূর্ব্বের কথা মনে করিয়া একটু দুঃখ হইতেছে, আবার হাসিও পাইতেছে। পরে বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য এত ভুল। আমি মনে মনে জানিতাম, আমি খুব বুঝি, আমার মত চতুর কেহ নাই, আজ সে অহঙ্কারটা চূর্ণ হইয়া গেল।

সে কথা যাক্ এখন তোমায় সব খুলিয়া বলিতে হইবে। আচ্ছা তবে সে সকল কথার মানে কি?

বাঞ্ছা। তুমি বল আমি শুনি।

সন্তো। না, তুমি আগে বল।

বাঞ্ছারাম আর কি বলিবেন, মুখ হা করিয়া বোবার আনন্দের হাসি হাসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কিছু টের পাইতাম না, আর উনি ভিতরে ভিতরে এত কাল এই কাণ্ড কারখানা করিয়া আসিয়াছেন! আচ্ছা আমি আর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি।—"বাস্তবিক এটাত বড় মিষ্ট প্রেম। কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, একটা প্রত্যুত্তরও দিতে পারি নাই, অথচ ইনি আমাকে এত ভালবাসিয়াছেন! গুপ্ত প্রেম। লুক্কায়িত প্রেম! স্বভাবজাত অকৃত্রিম প্রেম। আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য প্রেম। আহা বড় উপাদেয়। সন্তোষিণী যখন সংগোপনে আমাকে ভাল বাসিতেন, তখন আমি গোপনে লুকাইয়া যদি তাহা দেখিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় ভাবি আমোদ হইত। অব্যক্ত প্রেম বড় গভীর এবং মধুর, কিন্তু অব্যক্তকে বুঝিবার জন্য এক বার তাহা বাহির হওয়া আবশ্যক। এখন আমি গুপ্ত এবং প্রকাশ্য দুই প্রকার প্রেমেরই আস্বাদন পাইতেছি।"

এইরূপে তিনি ভাবে গলিয়া প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা ও সম্ভোগ করিতেছেন, আর সন্তোষিণী স্থির ভাবে তাঁহার প্রেমচিন্তা-বিকসিত মুখ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময় বাঞ্ছারামের হৃদয়ে এই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ হইল,—"আমার প্রেম এইরূপ মিষ্ট জানিবে। তুমি আমাকে ছাড়িয়া কখন পাণ্ডিত্যের অভিমানে অন্ধ থাকিতে, কখন বা আমাকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিতে, কখন নিন্দা করিয়া বেড়াইতে; কিন্তু আমি তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে অতি যত্নে ধরিয়া রাখিতাম, তোমার পাছে পাছে ফিরিতাম; কবে তোমার মন ফিরিবে, কবে তুমি আমাকে ভক্তি করিবে ভাল বাসিবে, তাই ভাবিতাম।"

এই প্রত্যাদেশে বাঞ্ছারামের হৃদয়ে একবারে দিব্যজ্ঞান, মহাভাব, এবং জ্বলন্ত বিশ্বাসের বীজ এক সঙ্গে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, জীবনের গূঢ় রহস্য খুলিয়া গেল, মানবীয় ও স্বর্গীয় প্রেমে প্রাণ প্রমত্ত হইল।

তদনন্তর সন্তোষিণীর মনে যখন যে ঘটনা উপলক্ষে যে ভাব উদয় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে স্থান কাল অবস্থা সমস্ত বর্ণন করিলেন, বিশেষ বিশেষ কথা পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন, কথায় মিলিল, কাজে মিলিল, স্থান কাল অবস্থা অনেক মনে পড়িল, কিন্তু ভাবে মিলিল না। সন্তোষিণীর এ বিষয়ে ভয়ানক ভ্রম হইয়াছিল, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তথাপি স্ত্রীজাতিসুলভ অভিমান ও লজ্জা বশতঃ তিনি সে ভ্রম স্বীকার করিতে যেন তত প্রস্তুত নহেন।

আমাদের বোধ হয় এ সম্বন্ধে উভয়েরই জ্ঞানের এবং অজ্ঞানের কিছু কিছু ভুল ছিল। নতুবা কি এক হাতে কখন তালি বাজে? হঠাৎ না বুঝিয়া বাতাবাতি কি এত ভালবাসা কখনো জন্মে? বাঞ্ছারামের তখন প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণার সময়, তত্ত্বানুসন্ধানের দিকে বেশী ঝোঁক থাকাতে ও ভাবটা তত বাড়িতে পায় নাই। যাহা হউক, এ জন্য সন্তোষিণীর আর দুঃখিত হওয়া উচিত নহে; মনের ভিতর যেমন সজ্ঞানে, তেমনি অজ্ঞানেও অনেক কার্য্য হয়। বাঞ্ছারামের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে এত দিন কি ভাবে প্রেমের কার্য্য চলিয়াছিল তাহা কে বলিবে? আমরাও আর সে অব্যক্ত অস্ফুট প্রেমের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহি না, সে সকল মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের অধিকৃত রাজ্য।

সন্তোষিণীর প্রীতিবৃত্তি অগ্রেই বিকসিত হয়, এক্ষণে তাহার সহানুভূতি পাইয়া তিনি শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিলেন। কিন্তু বাঞ্ছারাম হঠাৎ যেন প্রকাণ্ড সাহারা মরুভূমি হইতে একবারে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে পড়িলেন। অবশ্য সে জল লবণাক্ত, পান করা যায় না, করিলেও পিপাসা মিটে না, কিন্তু শীতলতাতে তাঁহার প্রাণ আপাততঃ ঠাণ্ডা হইল; তাই এত ভাবের উচ্ছ্বাস, তাই এত প্রেমের মত্ততা। পণ্ডিত এখন নূতন চক্ষে সন্তোষিণীকে দেখিবেন, নবানুরাগের সহিত পূর্ব্বের কথা শুনিবেন, নব ভাবে তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবেন, কি নিজহৃদয়ে প্রেমবিজ্ঞানের নব নব তত্ত্ব অধ্যয়ন আলোচনা করিবেন তাহা আর বুঝিতে পারিলেন না। দুই দিক হইতে দুইটী প্রবল প্রলোভন তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বাহিরে দর্শনশাস্ত্র ভিতরে বিজ্ঞানতত্ত্ব। তাই তাঁর হৃদয়সমুদ্রে

আজ এত তুফান উঠিয়াছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উথলিত হইয়া সার গাঁথিয়া চলিতেছে। যেন এক অতলস্পর্শ গভীর প্রস্রবণ হইতে ভাবরস উৎসারিত হইতেছে। ভারি আনন্দ। বড়ই উল্লাস। এক্ষণে জ্ঞানী ভাবুক হইলেন, বৈদান্তিক মায়াবাদী পৌরাণিক প্রেমিক হইলেন; সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী পারিবারিক সুখের আস্বাদ পাইলেন।

আর সন্তোষিণী? তাঁর মনের ভাব এখন কিরূপ? কেবল মৃদু মৃদু হাসি, আশাবিকসিত প্রাণভরা হাসি। মুখে বেশী কথা নাই, বাহ্যচাঞ্চল্যের কোন চিহ্ন নাই, আপনাকে জীবনবল্লভের হাতে সমর্পণ করিয়া একবারে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আর প্রেমের বিবিধ রঙ্গ দেখিতেছেন। তিনি যে বনবিহঙ্গের বিচিত্র শোভা দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য এত দিন বনে বনে ফিরিযাছিলেন, তাহাকে এখন তিনি পিঞ্জরে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। আর সে উড়িয়া যাইতে চাহে না; নদীর জলে বনের ফলে, প্রমুক্ত আকাশের মুক্ত বায়ুতে আব তাহার বাসনা নাই। একা নির্জ্জন গৃহে বসিয়া আর সে পুস্তক পড়িতেও ইচ্ছা করে না।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য প্রেমের উৎপাদন এবং নায়ক নায়িকার মিলন; কিন্তু আমাদের এ উপন্যাস সেরূপ নহে। এত ক্ষণ পরে মোহগরল উৎপত্তি হইল, ইহাকে মন্থন করিয়া অমৃতে পরিণত করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান সামঞ্জস্য।

সর্ব্বসংশয়ী চিত্ত বাঞ্ছারাম এত দিন যে ভ্রান্ত প্রণালীতে জ্ঞানানুশীলন করিতেন তাহা দ্বারা কখন এক দিক কখন অন্য দিকের উন্নতি হইত; এক্ষণে প্রেমপ্রভাবে তাঁহার জীবনের সমস্ত অংশের বিকাশ এবং সামঞ্জস্য হইল তাই এত আনন্দ। বাদ্যযন্ত্র যতক্ষণ তান লয় বিশুদ্ধ না হয় তত ক্ষণ তাহার স্বর কানে ভাল লাগে না, যাই সমস্ত তারগুলি সুরে সুরে মিলিয়া যায় অমনি প্রাণ আহ্লাদিত হয়; মনোরাজ্যের বৃত্তি সমুদায় তদ্রূপ। বাঞ্ছারামের জীবনবীণা এখন মধুর স্বরে বাজিতে লাগিল।

যত দিন মনুষ্যমনে জ্ঞানের উষ্ণতা অধিক থাকে তত দিন একটার সঙ্গে আর একটার জমাট বাঁধে না। কেন না উত্তাপের ধর্ম্ম বিযোগ, ইহাতে ঘনীভূত পদার্থ তরল হয়, অখণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় সগুণ নির্গুণে পরিণত হয়, সে সময় ধরিবার ছুঁইবার আর কিছু থাকে না; সমস্তই আকাশ সকলই নিরাকার, অবিশেষ। তদনন্তর প্রেম ভক্তির রস সঞ্চারিত হইলে উষ্ণতা ও শৈত্যের সামঞ্জস্য হয়। তখন প্রেম নির্গুণকে সগুণ, সাধারণকে বিশেষ, সূক্ষ্মকে স্থূল স্পর্শনীয় এবং তরলকে ঘনীভূত করে। বাঞ্ছারাম এখন শক্তির বিস্তীর্ণ অসীম রাজ্য হইতে ব্যক্তির নিকট পৌঁছিলেন, নির্গুণ নিরাকার তত্ত্ব ছাড়িয়া সগুণ পুরুষের চরণ ধারণ করিলেন। বিজ্ঞানজগতে একতা দেখিবার জন্যই তাঁহার আত্মা এত দিন ভিন্ন ভিন্ন পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু ভাবরসের অভাব হেতু একটার সঙ্গে আর একটার যোগ সম্পাদন করিতে পারে নাই, সুতরাং সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পূর্ণ সত্য আংশিক বিজ্ঞানালোকের সম্মুখে কিরূপে প্রকাশিত হইবে? ভাবময়ী রসদায়িনী সন্তোষিণী হইতে সে অভাব এখন পূর্ণ হইল। পূর্ব্বের মতামত সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইচ্ছা প্রীতি জ্ঞান পরস্পর পরস্পরের সমতা সাধন করিল।

বসন্তপুর গ্রামে বক্কেশ্বর এবং মক্কেশ্বর মিত্র নামে দুই ভাই বাস করিতেন। বক্কেশ্বর মাথাপাগ্‌লা রকমের গোঁড়া হিন্দু আর মক্কেশ্বর সেকেলে শিক্ষিত সিনিয়ার স্কলার। বক্কেশ্বর বকিয়া বকিয়া আচার বিচার করিয়া শেষ পাগল হইয়া মরিয়া যায়। মাসের মধ্যে পনর দিন তার আহার হইত না। নির্ব্বোধ অন্ধবিশ্বাসী হইয়া আল চাল কাঁচা কলা খাইয়া উপবাস করিয়া করিয়া তাহার রাগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। কেহ কখনো তাহার মুখে হাসি দেখে নাই। কেবল বকিত আর লোককে গালি দিত। মক্কেশ্বর ইহার বিপরীত। তিনি সংশয়বাদ স্কুলের ছাত্র। পড়িয়া পড়িয়া এক্ষণে তাঁহার দুইটি চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, বয়ঃক্রমও প্রায় আশির উপর হইবে। পূর্ব্বে ইহাঁর সঙ্গে বাঞ্ছারামের অনেক সময় বিজ্ঞানবিষয়ে কথোপকথন হইত, ভাবে রুচিতে জ্ঞানবিচারে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সহৃদয়তা ছিল। মক্কেশ্বর বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, রোম গ্রীশ ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস সকল তাঁর মুখস্থ বলিলেই হয়।

বাঞ্ছারামের হৃদয় যখন প্রেমরসাভিষিক্ত হইল, এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানের বিকার ছুটিয়া গেল, তখন তিনি মক্কেশ্বরের সঙ্গে যাতায়াত বন্ধ করিলেন। অনেক দিন তাঁহার দর্শন না পাইয়া মিত্রজার মনে বড় কৌতূহল জন্মিল। অন্য কাহারো সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি সুখ পান না। এক দিন লাঠী ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে বাঞ্ছারামের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। "কি হে নাতি আর দেখা পাই না কেন, ভুলে গেলে নাকি? এই দেখ তোমার জন্য আমি পথ হাতড়াইতে হাঁতড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পড়া শুনার চর্চ্চা চলিতেছে ত? আমিত অন্ধ মানুষ, এখন তোমার উপরেই আমার ভরসা। নূতন পুস্তকাদি আর কিছু বাহির হইয়াছে কি সংবাদ রাখ?"

বাঞ্ছারাম যেন একটু ঠাণ্ডা, কথায় উত্তর দিলেন, কিন্তু নিতান্ত কর্ত্তব্যানুরোধে। "কৈ নূতন পুস্তকাদি ত আর দেখি নাই। আপনি আবার এত কষ্ট করিয়া কেন আসিলেন? ডাকিয়া পাঠাইলেই ত হইত।

তাঁহার কথার সুরে এবং ভাবে মক্কেশ্বর বুঝিলেন, এ লোক সে লোক নয়। বস্তুতঃও তাই বটে। এখন বাঞ্ছারামের জ্ঞানের রুচিও পরি-

বর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি যোগ ভক্তি বৈরাগ্য বিষয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুরাগী হইয়া গীতা, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ এবং প্রাচীন পুরাণাদি অধ্যয়নে মন দিয়াছেন। এই সকলই এখন তাঁর খুব ভাল লাগে। মিত্র মহাশয়কে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আমি আর বিদেশীয় তত্ত্ব শাস্ত্র বড় পড়ি না, কেবল বাইবেল মাঝে মাঝে দেখি, আর প্রাচীন আর্য্যদিগের যোগ ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদের ঋষিরা বড় চিন্তাশীল গভীরদর্শী লোক ছিলেন।"

মিত্রজার জ্ঞানচর্চ্চার প্রভাবে চর্ম্মচক্ষু অন্ধ হইয়াছিল কেবল তাহা নহে, অন্তর্চক্ষুও ভিতরে কেবল আঁধার দেখিত। বাঞ্ছারাম পূর্ব্বে যে অনিশ্চয় সংশয় জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন ইনি এখন ঠিক তাহাই আছেন। জীবনে সুখ শান্তি কিছু নাই, কেবল সুখের মধ্যে জ্ঞানাভিমান। একটু বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "তোমাদের মত চঞ্চলমতি যুবার এই দশা তা জানাই আছে। এত কাল পরে গঁজাখোর ঋষিদিগের কল্পনারহস্যে তোমার মন মজিল? হায় হায় হায়! এতে তোমার বুদ্ধি কি চরিতার্থ হইয়াছে?

বাঞ্ছারাম। আজ্ঞে বুদ্ধি চরিতার্থ হোক না হোক প্রাণে বড় আরাম শান্তি সম্ভোগ করিতেছি। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের আলোচনাতেও আমি আমার মনকে এত দিন নিঃসংশয় করিতে পারি নাই, কেবল আঁধারে ঢিল ছুড়িতাম। ভক্তিমিশ্র জ্ঞান বড় মিষ্ট এবং শান্তিপ্রদ। সামঞ্জস্যই প্রকৃত জ্ঞান। একটি হরিভক্ত ব্রাহ্মবন্ধু "ব্রহ্মগীতোপনিষৎ" নামক দুই খণ্ড গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন তাহা পাঠে আমি বড় সাহায্য পাইয়াছি। তাহাতে যে সকল সাধনতত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে, অতি পরিষ্কার, যেন স্বর্গের সোপান।

মক্কেশ্বর গর্ব্বিত ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "স্বর্গ আবার তুমি ইহার মধ্যে কোথায় পাইলে? কি ভ্রান্তি! একবারে তবে গেছ বল! এ কালের এম, এ, বি, এ, তোমরা, নিতান্ত যেন এডুকেটেড বোর। ছি! বড় অপদার্থ। এই জন্য আমি এ সকল লোকের সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করি না। তোমাকে একটু বুদ্ধিমান বলে জ্ঞান ছিল, তাও এখন দেখছি সব ভুল।

বাঞ্ছারাম। কেবল নেগেটিভ্ জ্ঞান আর সংশয় লইয়া কি প্রাণ বাঁচে?

মহেশ্বর। তাহারই জন্য একটা কল্পনার পদসেবা করিতে হইবে না কি? কি বিপদ! তুমি যে নিহাত মূর্খের মত কথা কহিতেছ দেখি। একটা লোকও লেখা পড়া জানে না গা, কি আশ্চর্য্য! অথচ মেডেল ঝুলিয়ে, হুড্ পরে, টাইটেল্ নিয়ে জাঁক করে বেড়ায়।

বাঞ্ছারাম। জীবন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যখন নিশ্চয় আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি তখন আর কল্পনা কিরূপে বলিবেন? জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানময়কে অধ্যয়ন করা বড় সুখের বিষয়।

মহেশ্বর এ কথা শুনিয়া একবারে ক্রোধে অভিমানে অগ্নি অবতার হইলেন। "কি। আমার সঙ্গে পরিহাস!" একে কানা মানুষ, তাহাতে প্রাচীন বয়স, অধিকন্তু জ্ঞানগর্ব্ব, অবিশ্বাসাভিমান, তিনি চটিয়া ষ্টুপিড্ ফুল সেল্ফ্‌ডিলিউডেড্ ইত্যাদি কটু বচনে বাঞ্ছারামকে তিরস্কার করিলেন এবং রাগভরে লাঠী ঠক ঠক করিতে করিতে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিলেন। ক্রোধান্ধ কানা মানুষ চলিতে পারিবে কেন? দরজার চৌকাঠে ঠেকিয়া চিতপাত হইয়া পড়িয়া গেলেন। এমনি পড়িলেন যে একেবারে মৃতপ্রায় অচেতন। তখন বাঞ্ছারাম তাড়াতাড়ি ধরিয়া তুলিলেন, চখে মুখে জল দিলেন, বাতাস করিতে লাগিলেন। পাড়াপ্রতিবাসীরা চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। নাড়ীর গতি অতি ক্ষীণ, আস্তে আস্তে এক একটু কথা বাহির হইতেছে, জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি বিলোপ হইয়া গিয়াছে। বাঞ্ছারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরদাদা, এখন কি মনে হইতেছে?"

মহেশ্বর। আর ভাই মলাম, বড় কষ্ট, প্রাণ হাঁপ হাঁপ করিতেছে, কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছি না, সব অন্ধকার, সমস্ত অকূল পাথার। আমি কোথায় যাচ্চি বলিতে পার? আমার স্ত্রী পরিবার সব কোথায়? উঃ বড় কষ্ট। কেবল অন্ধকার! যেন অনন্ত অন্ধকারময় মহাসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছি।

বাঞ্ছারাম। অন্ধকারের ভিতরে জ্যোতির্ম্ময় সত্য পুরুষ আছেন বিশ্বাস ভক্তির সহিত তাঁহাকেই দেখুন।

মক্কেশ্বর। আর ভাই দেখা শুনা। সব ফাঁকি, কেবল কষ্ট আর আঁধার। যেন কয়লার খনির মধ্যে নামিতেছি। যমের বাড়ী যাইবার পথে কি ছাই একটা প্রদীপ নাই! যাক, বাঁচা গেল, বোকা ধার্ম্মিক ব্যাটারা মরণের ভয় দেখাইয়া ভজাইতে আসিত। এইত মরছি। এনাইহিলেসনটা মন্দই বা কি! পরকাল নাই বা রৈল? ইহকালই কাটে না, আবার পরকাল!

বাঞ্ছারাম বৃদ্ধের দুর্দ্দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন, "ভাগ্যে ভগবান্ আমার উপর কৃপা করিয়াছিলেন, নৈলে আমারও এই দশা ঘটিত।" অনন্তর তিনি বলিলেন, ঠাকুরদাদা, "ভবকর্ণধার দয়াল শ্রীহরি সচ্চিদানন্দ বলিয়া ডাকুন। তিনি বড় পতিতপাবন দয়াময়। ঐ অন্ধকারের ভিতরেই তিনি লুকাইয়া আছেন।" বাঞ্ছারাম এই কথা গুলি এমনি ভক্তি বিশ্বাসের দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, যে তাহা শ্রবণে পাষাণ হৃদয় গলিয়া যায়। মক্কেশ্বরের কিন্তু কিছুই হইল না। তিনি সহজেই পশুর ন্যায় নিস্পন্দ হইলেন।

মক্কেশ্বরের এই শোচনীয় মৃত্যুতে বাঞ্ছারাম অনেক শিক্ষা লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস ভক্তি ভগবন্নিষ্ঠা বাড়িল, ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভূত হইতে লাগিল। নাস্তিক মরিবার সময়েও যে নাস্তিক থাকিতে পারে ইহাও তিনি দেখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈরাগ্যোদয়।

মিত্রজার এই অপঘাত মৃত্যু সংশয়াত্মা ভগবদ্ভক্তিবিহীন অবিশ্বাসীদিগের পক্ষে একটী বড় ভয়ঙ্কর শিক্ষা। বাঞ্ছারামের নবপ্রেমের মত্ততার উপর ইহা এক প্রবলতর বৈরাগ্যাঘাত। তিনি এমনি জাগ্রত হইয়া উঠিলেন যে শববাহকদিগের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

রজনী অন্ধকারময়ী, মেঘশূন্য আকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ ঝলমল করিতেছে; দুই ধারে বিস্তৃত শুভ্র সৈকত ভূমি, মধ্যে নীলকান্তি নির্ম্মল তটিনী প্রবাহ সুমন্দ বায়ু তাড়নে অনন্ত ক্ষুদ্র বিচিমালা উত্থিত করিয়া কুল কুল নাদে চলিয়া যাইতেছে, তদুপরি জলজন্তুগণ এক এক বার মাথা তুলিয়া দেখিতেছে আবার ডুবিতেছে। অতি ভীষণ রমণীয় স্থান। তারকামালা খচিত সুনীল গগনের ছবি খানি ভাগীরথীর স্বচ্ছ নীরে পতিত হইয়া তরঙ্গভঙ্গের সহিত যেন নৃত্য করিতেছিল। নক্ষত্রালোকে তটস্থ রজতময় বালুকারাশি মৃদু মৃদু দীপ্তি পাইতেছিল। মাঝে মাঝে জলহংসের কলরবে শ্মশানের নীরব আকাশ ধ্বনিত হইতেছিল। কখন বা দুই এক খানি নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছিল এবং তাহার নাবিকদিগের সঙ্গীতরব কর্ণে আসিতেছিল।

বাঞ্ছারাম ঘাটে গিয়া দেখিলেন, দিগন্তব্যাপী অন্ধকার মধ্যে ধূ ধূ করিয়া একটী চিতানল জ্বলিতেছে, তাহা হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িয়া পড়িতেছে, শবভোজী স্থূল কলেবর কুকুরেরা দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঘাটের চারিদিকে ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, ফাটা বালিস, পোড়া কাঠ, সরা কলসী, মড়ার মাথা ও অস্থিপঞ্জর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; তাহার মধ্যে এক ভীষণাকৃতি পুরুষ মাথায় গামছা বাঁধিয়া, হাতে প্রকাণ্ড এক বংশদণ্ড লইয়া সবলে শবের মস্তক এবং হস্ত পদের অস্থিগ্রন্থি চূর্ণ করিতেছে। অদূরে জন কয়েক লোক বসিয়া হাসিতেছে, তামাকু খাইতেছে, গান গাইতেছে, জটলা করিতেছে, আর শ্রাদ্ধে আহারাদির ব্যবস্থাটা কিরূপ হইবে তাহা ভাবিতেছে। মাঝে মাঝে ভৈরব গর্জ্জনে "হরি হরি বল! হরি বোল!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। সে লোমহর্ষণ ভীষণ হরিধ্বনি শ্রবণে বাঞ্ছারামের প্রাণ কাঁপিল, অঙ্গ সিহরিল, শবদাহের বিভৎস দৃশ্য দর্শনে চিত্ত চমকিত হইল। পরে তিনি শুনিলেন, দূর হইতে পবনহিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে নারীকণ্ঠবিনিঃসৃত করুন স্বরের এইরূপ রোদন ধ্বনি আসিতেছে;—"আমায় ফেলে তুমি কোথায় চলে গেলে গো মা! আমি কোথায় যাব, কি করিব মা গো মা! তোমায় ছেড়ে একা আমি কেমন করে ঘরে যাব

গো মা!" জলস্রোতের মৃদু কল নাদ, বাতাসের স্বন্ স্বন্ ধ্বনি, তৎসঙ্গে ঘোর নিরাশব্যঞ্জক এই শোকের ক্রন্দন রব এমনি এক প্রকার মর্ম্মান্তিক কাতরতা ব্যক্ত করিতেছিল যে, তাহা শ্রবণে প্রাণ একেবারে উদাস হইয়া যায়। বাঞ্ছারাম এখানে যাহা দেখিলেন, এবং যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার নবীন প্রেমানুরাগের সঙ্গে প্রচণ্ড বৈরাগ্যানল জ্বলিয়া উঠিল।

শবদহনকারী ব্যক্তিদিগের আচরণ দর্শনে মনুষ্যস্বভাব যে কত দূর অস্বাভাবিক, বিকৃত হইতে পারে তাহা বাঞ্ছারাম বুঝিতে পারিলেন। তাহারা শ্মশানে শবের পার্শ্বে বসিয়া মদ্য পান করিতে করিতে বৃথা সঙ্গীত গাইতেছিল। পরে জানিলেন তাহারা মদ্যের লোভেই এই কাজ করিয়া থাকে। আর এক স্থানে জলের ধারে দেখিলেন, একটী প্রাচীনা মুমূর্ষু প্রায় স্ত্রীলোককে বালির উপর শোয়াইয়া তাহার আধ খানা শরীর জলে ডুবাইয়া কয় জন লোক বিকট স্বরে "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম রামঃ" বলিয়া মহা চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। বাঞ্ছারাম কৌতূহলী হইয়া তাহাদিগকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। এক জন হাসিয়া উত্তর দিল, "জান না, পাট করা যাচ্ছে!" অর্থাৎ অন্তর্জলি করিয়া বুড়ীকে শীঘ্র যমালয় প্রেরণের উদ্যোগ হইতেছে। শ্মশান ভূমি দর্শনে পৃথিবী অসার অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, আবার ইহা-দের পৈশাচিক ব্যবহার দর্শনে নরজাতির প্রতি ঘৃণা জন্মে।

তদনন্তর মিত্র মহাশয়ের মৃতদেহের সৎকারের আয়োজন হইতে লাগিল। বাহকদিগের সঙ্গে এক জন ঠোঁটকাটা অকাল কুষ্মাণ্ড গোছের' লোক ছিল, মুখাগ্নির সময় সে বলিল, "ও ভায়া, ঠাকুরদাদার মুখে শুধু আগুন কেন দিচ্ছ, একটা চুরটে আগুন ধরাইয়া দাও।" এ দলের ভিত-রেও আমোদ আহ্লাদ হাস্য কৌতুক, মদ্য পান তামাকু সেবনের ত্রুটি হয় নাই। কোমল তনু ভদ্রসন্তানেরাত এ সব কাজ আজ কাল পারিয়া উঠেন না, কাজেই গুলিখোর মাতাল প্রভৃতি যণ্ডা গোছের লোকের দরকার হয়। সে কাল আর নাই, যে কেহ শবদহনকে সৎকার্য্য মনে করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবে। মিত্রজার সন্তানাদি ছিল না, কয়েকটী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, তাহারা বিষয় বণ্টনের কাজে ব্যস্ত থাকায় ঘাটে যাইতে পারে নাই।

বকেশ্বরের মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধে পরে গ্রামের মধ্যে একটা কথা

উঠে যে কিছুতেই তাঁহার শরীরটা পুড়িল না। এক গাছি লোমেও আগুন ধরিল না। যত কাঠ চাপায় ততই রাশি রাশি ধোঁয়া বাহির হয়, কোন মতেই আর জ্বলে না। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় শবের পেটটা ফুলিয়া ঢাক হইল, মুক খান বিকট বিভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল, চক্ষুর তারা দুইটা প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া রহিল। শেষ ধোঁয়াটে আগুনে সর্ব্ব শরীর এমনি কাল ভূত হইয়া উঠিল যে ভয়ে সে দিকে আর তাকাইতে পারা যায় না। অবিশ্বাসীর কষ্টের মৃত্যু, মুখ খানি আগেই কেমন একটা বেয়াড়া রকম হইয়াছিল তার পর আগুনের ধোঁয়ায় কালী ঝুলিতে একবারে রাক্ষসের মত হইয়া দাঁড়ায়। সে দিন বারটা ছিল শনি, তিথিটেও ছিল অমা-বশ্যা ত্রয়স্পর্শ। দাহকারিগণ মদে গাঁজায় ভোঁ হইয়া ঐ মূর্ত্তি যখন দেখিলেন, তখন স্থির করিলেন ইহাকে নিশ্চয় ভূতে পাইয়াছে। কেহ বলিলেন, "ঐ দেখ, দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে।" কেহ দেখিলেন, মিত্রজা বাঁ প্যাটা উপরের দিকে আস্তে আস্তে তুলিতেছে। কেহ বলিল, "ঐ দেখ দেখ! উঃ বুকে তাল ঠুকিতেছে! চল ভাই এই বেলা পালা ই। দলের মধ্যে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, "মকেশ্বর বাবু নাস্তিক ছিল, দেবতা বামন মানিত না, তাই চিলু জ্বলিতেছে না।" নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করিতেছে, কেহ হাস্যামোদ করিতেছে, কেহ বলিতেছে "ব্যাটাকে ভূতেই পাউক, আর ব্রহ্মদত্যিতেই ধরুক, আমরাত পেট্টা ভরে আজ মদ খাই। "ওহে ভাই, মিত্তির জার শরীর যদি নাই পোড়ে, তবে এস আধপোড়া মাংস খানিক নিয়ে মদের চাটনি করা যাক্।" এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, হঠাৎ শবদেহের পায়ের দিকের কাঠ-গুল ধসিয়া পড়িল, আর অমনি তৎক্ষণাৎ মাথাটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিল। যাই শব মাথা চাড়া দিয়াছে, অমনি সকলে ভয়ে হাউ মাউ চাউ করিতে করিতে দে ছুট! "ভূতে ধরলেরে পালা! পালা! পালা! রাম রাম রাম!" কেউ হুঁকাহাতে, কেউবা গামছাকাঁধে ছুটিতেছে; দৌড়িতে দৌড়িতে কাহারো কাছাটা খুলিয়া গেল, কাহারো পায়ে হোঁচোট লাগিল, কাহারো টিকি কাঁটার ঝোপে জড়াইল। মারে! বাবারে! মলামরে! ভয়ে গলা শুকিয়ে, গা ঘেমে, পোঁ পোঁ শব্দে দৌড়! দৌড়িতে

দৌড়িতে এক জন আপথে গিয়া ঘাড় মুড় ভাঙ্গিয়া গর্ত্তে পড়িয়া মরিল, অন্য এক জন আবার তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। গর্ত্তেপতিত ব্যক্তি ভাবিল, এই রে এই বার বুঝি আমাকে ভূতে ধরিয়াছে। ছাড়! ছাড়! ছাড়! আর ছাড়, দুইটাতে জড়ামড়ি হুড়াহুড়ি মারামারি ঘসটা ঘসটি, ভয়ে কেহ কাহাকে ছাড়িতে চাহে না। আঁধার রাতে গর্ত্তের মধ্যে উভয়েই মনে করিতেছে, আমি ভূতের হাতে পড়িয়াছি। শেষ দেখে যে সেটা ভূত নয়, সঙ্গের এক জন ইয়ার, তখন হাসিয়া মরে আর দৌড়ায়। এইরূপে উর্দ্ধশ্বাসে সকলে পলাইয়া গেল, মৃত দেহ সৎকারের যাহা অবশিষ্ট ছিল, শ্মশানবাসী মিউনিসিপাল করপোরেসেনের সভ্য শৃগাল কুকুরেরা দয়া করিয়া তাহা সমাধা করিল। সকলে মিলিয়া তাহারা সেই অর্দ্ধ দগ্ধ দেহকে উদরে স্থান দিল।

আসল কথাটা ভূতে পাওয়া টাওয়া কিছু নয়, সব মিথ্যা, দাহকারীরা নেশার ঝোঁকে কাঠ কিনিতে গিয়াছিল, কাষ্ঠবিক্রেতা সুযোগ ছাড়িবে কেন? যত রাজ্যের কাঁচা কাঠ চালাইয়া দিয়াছে, কাজেই ধোঁয়া হবে নাত কি হবে? শেষ গ্রামে প্রচার করিয়া দিল যে মিত্রজাকে ব্রহ্মস্পর্শে পাইয়াছে।

বাঞ্ছারাম এ সকল ভূতের খেলা দেখেন নাই, তিনি শ্মশান ঘাটের অদূরে এক বালির চড়ার উপর বসিয়া জীবনের অসারতা বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। সন্তোষিণীর প্রতি নবোচ্ছ্বসিত প্রেমতরঙ্গ তখন এই প্রচণ্ড বৈরাগ্যের প্রভূত ঝঞ্ঝা বায়ুতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। স্পষ্টই তিনি অনুভব করিলেন, হরি ভিন্ন সকলই মিথ্যা। সমস্তই মায়ার খেলা। যে শ্মশানে কাঁদে, সেই আবার ক্ষণ কাল পরে বাড়ী গিয়া হাসে! জগৎ সংসার শূন্য দেখিয়া, নিরাশ্রয় হইয়া অতিশয় ব্যকুল অন্তরে তিনি পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দ হরির চরণে আত্ম সমর্পণ করিলেন। দৃঢ় ভক্তিসহকারে তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন। মিত্রজার মৃত্যু এবং শ্মশানের দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে এমনি বৈরাগ্য জন্মিল, যে তিনি বাড়ী আসিয়া মাথা মুড়াইলেন, দাড়ি গোঁফত কামানো অভ্যাসই ছিল, এবার চক্ষের ভ্রূ এবং পাতার লোম পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভক্তিবিকাশ।

প্রথম বয়সে বাঙ্গারাম প্রকৃতির শোভা দেখিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাহার ভিতর কোন পুরুষকে দেখিতে পাইতেন না। ব্যক্তিত্ববিহীন এক সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ শক্তি মাত্র অনুভব করিতেন। মানব প্রকৃতির মধ্যেও সেই নির্গুণ শক্তির মায়াময়ী ক্রিয়া দেখিতেন। পরে যখন শুভ ক্ষণে সন্তোষিণীর প্রেমপীযূষ রসে হৃদয় বিগলিত হইল, তখন সেই প্রেমের মধ্যে এক জন অবিভার্য্য সগুণ ব্যক্তিকে তিনি দেখিতে পাইলেন। সে ব্যক্তি মিষ্ট মিষ্ট কথা কয়, তাঁহার সুখ শান্তি আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য চেষ্টা করে, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া ভাবে, কত প্রকারে ভালবাসে। এ সকল কার্য্য কি অন্ধ শক্তিপ্রসূত আকস্মিক? এই প্রশ্ন মনে উঠিল। তখন সেই প্রেমের মিষ্টতার ভিতরে প্রেমময় পরম পুরুষের স্পষ্ট আবির্ভাব তিনি দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এ মধুময় হৃদয়ানন্দকর প্রেম নির্গুণ শক্তি বা জড় পরমাণুর ফল নয়, অদৃষ্ট চক্রের বা পঞ্চভূতের ষড়যন্ত্র নয়, এক জন সুরসিক সুনিপুন সুন্দর মহাজ্ঞানী পুরুষ ইহার ভিতরে আছেন। ভিতরে লুকাইয়া তিনি বহুবিধ লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। স্বভাবতঃ আপনা আপনি এই জ্ঞান জন্মিল। তখন আপনাকেও স্বতন্ত্র এক জন ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাসহস্তে ধরিতে পারিলেন। জগতের অন্তরালে প্রত্যেক ঘটনায় এক লীলাময় পরম পুরুষের বিধাতৃত্ব ক্রিয়া যখন তিনি এইরূপে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টিতে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম চরাচর বিশ্ব পশু ও মানব এক অবিনব সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। উদ্যানে বৃক্ষকুঞ্জে নানা বিধ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বাঙ্গারাম মনে করিলেন, সেই অনন্ত গুণাকর দিব্য পুরুষ ফুল ফুটাইয়া ডালি সাজাইয়া ফুলের হাসিতে হাসি এবং গন্ধে সুগন্ধ মিশাইয়া আপনি স্বয়ং হাসিতেছেন। হৃদয়ে এতই ভাব রস উচ্ছ্বসিত

হইয়াছে যে তিনি বৃক্ষের শাখা ফুল ফল পক্ষী প্রজাপতি মক্ষিকা ভ্রমর এবং সমীরণের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কি হে তোমরা কেমন আছ? আমাকে দেখিয়া হাসিতেছ কেন? হে নবীন তরু সখে! আমার আহ্লাদে আহ্লাদিত হইয়া কি তুমি নাচিতেছ? এস এস, আজ তোমাদের সকলকে আমি আলিঙ্গন করি। তোমরা আমার শৈশবের বন্ধু, নির্জ্জনের সখা। ভগ্নী মাধবী, দুঃখী ভ্রাতার সুখে তোমরা কি আজ বড় সুখী হইয়াছ?" বসন্তের মধু মারুত হিল্লোলে পুলকিত চিত্ত হইয়া তিনি ভাবিতেন, সেই পুরুষ আমার অঙ্গে চামর ব্যজন করিতেছেন। শীতল জলে অবগাহন করিয়া শরীর যখন স্নিগ্ধ বোধ হইত, তখন বিশ্বাস করিতেন সেই পরম পুরুষ জননী বেশে আমাকে কোলে লইয়া আমার তাপিত অঙ্গ জুড়াইলেন। জলের শীতলতা আর কিছুই নয়, সেই মায়ের স্নেহবিগলিত অমৃত রস। আকাশের চাঁদের সহাস্য বদনে মায়ের স্নেহসুধা, পক্ষীদিগের সঙ্গীত রবে মায়ের প্রীতি সম্বোধন, সৌদামিনী শোভিত মেঘমালার সৌন্দর্য্যে মায়ের মুখের হাস্যদ্যুতি; আবার বজ্রের গভীর নির্ঘোষে, নদীর ভীষণ জল কল্লোলে, প্রবল প্রভঞ্জনের প্রচণ্ড তেজে সেই জননীর দুর্জ্জয় পরাক্রম প্রকাশিত; এইরূপে তিনি সমস্ত ভৌতিক পদার্থের ক্রিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যসমাজ গৃহাশ্রম পরিবার, শস্যক্ষেত্র, বিপনীশ্রেণী বাণিজ্যাগার সর্ব্বত্র সেই এক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী মহালক্ষ্মীর প্রসন্ন মূর্ত্তি তাঁহার দিব্যজ্ঞান-নেত্রে প্রতিভাত হইতে লাগিল। মাতৃহীন শিশু পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়া এখন যেন মায়ের কোল পাইয়া কৃতার্থ হইল। সমস্ত আকাশ, সমস্ত বায়ুমণ্ডল যেন সেই জননীর অনন্ত বিস্তৃত প্রেম কোল। বাঞ্ছারাম এখন আর তিলার্দ্ধ কালের জন্য মাতৃকোল ছাড়া রহিলেন না। ভোজন করিতে বসেন, দুই চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। তখন স্পষ্টই দেখিতে পান, মা অন্নপূর্ণা স্বহস্তে মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছেন। সুপক্ক ফল ভোজন করেন, দেখেন তাহার ভিতরে মাতৃস্নেহ পরিপূর্ণ। দাস দাসীদিগের সেবার ভিতরে কেবল সেই বহুরূপিণী চৈতন্যময়ী মায়ের আবির্ভাব। রন্ধনশালায়, ভাণ্ডার গৃহে, শয়ন মন্দিরে যথা তথা মা লক্ষ্মী বিরাজিত।

বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিয়া ভাবেন, আমি মায়ের শীতল কোলে শয়ন করিলাম। বন্ধু বান্ধব অপর লোকের ভালবাসা স্নেহ মমতার ভিতরে স্পষ্ট দেখিতেন সেই পরম পুরুষ প্রাণসখা হইয়া মানবদেহে লুকাইয়া রহিয়াছেন। শরীরের রক্ত সঞ্চালন, নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার মূলে সেই দেবতাকে যন্ত্রী এবং শক্তি-রূপে দেখিতে লাগিলেন। রাজার রাজত্বে, প্রভুর প্রভুত্বে, মহতের মহত্বে প্রত্যেক ঘটনায় সেই এক জনকেই দেখিতে পাইতেন। আর সন্তোষিণীর হাসিমাখা মুখ, মধুমাখা কথা, তাঁহার কৃত সেবা যত্ন আদর মমতার ভিতর সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি মহাদেবীকে দেখিয়া একবারে প্রেম ভক্তি কৃতজ্ঞতারসে তিনি গলিয়া গেলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বস্থানে সমস্ত ঘটনায় সকল পদার্থের অভ্যন্তরে যেমন এক অনন্ত মহাশক্তি দর্শন করিতেন, এক্ষণে তেমনি প্রত্যেক বিষয়ে এক জন মঙ্গলসঙ্কল্প পরমজ্ঞানী পুরুষকে ব্যক্তিত্ব ভাবে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাপুঞ্জ সেই এক মধ্যবিন্দুর সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া বিজ্ঞান ও ভক্তি-পিপাসা চরিতার্থ করিলেন। এক জন ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় সহচর হইয়া আছেন এ জ্ঞানটী বড় উজ্জ্বল হইল। এ বিশ্বাস বড় শান্তিপ্রদ বিশ্বাস। যেখানে পূর্ব্বে আপাতদৃষ্টিতে বিবাদ অসামঞ্জস্য বোধ হইত, এখন সেখানে গূঢ় মিলন দেখিতে পাইলেন। এক আদিপুরুষ হইতে সক-লের উৎপত্তি, তাঁহাতে সমুদায়ের অবস্থিতি, এবং তাঁহাতেই সমস্ত সৃষ্টির পুনর্ম্মিলন, এই মহাসত্য দিব্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি স্বচ্ছন্দভাব অব-লম্বন করিলেন। এক বিন্দু প্রেমে মহাসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি তিনের সম্মিলনে মস্তিষ্কের বিকার, হৃদয়ের অন্ধতা সমস্ত চলিয়া গেল। অতঃপর বাঞ্ছারাম সেই অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া কিছু দিন সন্তোষিণীর সঙ্গে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গরলমন্থন।

প্রায় দুই তিন বৎসর তীর্থ পর্য্যটনের পর সস্ত্রীক নিশানাথ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমাগত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ, নানা স্থানে নানা দেবমূর্ত্তি দর্শন, পাণ্ডা ঠাকুরদিগের উপদেশ বাক্য শ্রবণ এবং সহযাত্রীদিগের দৃষ্টান্তে উভয়েই বেশ সাত্ত্বিক হিন্দুর আকার ধারণ করিয়াছেন। নিশানাথের পত্নী নয়নতারা দেবী বাটীতে প্রবেশ করিয়াই গৃহদ্বার প্রাঙ্গন অপরিষ্কার দেখিয়া একটু চটিলেন, তদনন্তর বাপের বাড়ীর যে ঘটীটী হাত পা ধুইবার জন্য সচরাচর ব্যবহার করিতেন তাহার দর্শনাভাবে নিতান্ত ব্যাকুল এবং অস্থির হইলেন। তীর্থে গিয়া কত কত দ্বিভুজ চতুর্ভুজ ষড়ভুজ ঠাকুর দেখিয়া আসিয়াছেন, সেজন্য কিছুই কষ্ট পাইতে হয় নাই, তাহাদের দর্শনবিরহে কোথাও কাঁদিতেও হয় নাই, কিন্তু এই ঘটী ঠাকুরের দর্শন না পাইয়া চক্ষে জল আসিল; সে জন্য কত বকিলেন, কত কাঁদিলেন, কেহই সে গৃহদেবতার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। পথে আসিবার কালে রেলগাড়ীতে নামিতে উঠিতে বোধ হয় ঘটিটী কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল। নিশানাথ ভয়ে যড় সড় হইলেন, পাছে ঠাকুরাণীর রাগের ঝড় তুফানে পড়িয়া তাঁহার জীবনতরী বানচাল হয় এই ভাবনায় তাঁর মুখ খানি শুকাইয়া গেল।

ঠাকুরাণী ঘরের ভিতরে গিয়া দেখেন, এ ঘরের সামগ্রী ও ঘরে, ও ঘরের সামগ্রী এ ঘরে বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত। বহুদিন অবসর পাইয়া ক্ষুদ্র মুষিক দম্পতী পুত্র পরিবারের সহিত শয়নাগারে গদির ভিতর বাসা করিয়াছে, তাহারা বালিস ও তোষকের তুলা বাহির করিয়া দেখিয়াছে, ঘরময় তাহা ছড়াইয়াছে। জানালা দরজায় উই ধরিয়াছে। ঘরের কোনে কোনে আরশুলা ছুঁচার বিষ্ঠা, বাক্স তোরঙ্গ আলমারী মাকড়শার জালে ও ধূলায় ঢাকা। রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন, পুরাতন প্রিয় পাকা চুলাটী ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে, তাহার গৃহে চামচিকার গন্ধে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য, হাঁড়ি কলসী কোনটা ভগ্ন, কোনটা অঙ্গহীন, শিল নোড়া কুলা ধুচনী ঝুলকালী মাখা, মেঝের ভিতরে বড় ইন্দুরেরা মাটী তুলিয়া রাশীকৃত করিয়াছে।

এই সকল দেখিয়া নয়নতারা মনে মনে বড় চটিলেন, পা ধোয়া আর হইল না, ধূলপায়ে নিজেই ঝাঁটা ধরিলেন। এক হাতে ঝাঁটা এক হাতে জলের কল্‌সী, আর মুখে বকুনি, ক্রোধভরে অম্বরের বলে গৃহমার্জ্জনা আরম্ভ করিলেন। কটিতটে অঞ্চল বদ্ধ করিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে আরক্ত-লোচনে যখন তিনি অবিশ্রান্ত বকিতে আরম্ভ করিলেন, এবং জলের উপর জল ঢালিয়া ঘর দ্বার প্রাঙ্গনভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন মহাকালী দনুজদলনী অসুরমর্দ্দনের জন্য রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া পৃথিবীকে রসাতলে দিতে বসিয়াছেন। ইঁহার দেহে তমগুণের উপাদান কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। সন্তোষিণী অগ্রে গৃহকার্য্যে মাসীর অনেক সাহায্য করিত, ইদানীং প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকিত বলিয়া বাড়ী ঘরের দশা এইরূপ ঘটিয়াছে। কর্ত্রী ঠাকুরাণী নিজেই বেলা একটা দুইটা পর্য্যন্ত যতবা খাটিলেন, ততবা বকিলেন। পরিশ্রমজন্য যত শরীর ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত হইতে লাগিল, মনও তত বিরক্ত এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিল; সেই পরিমাণে মুখ হইতে অনর্গল দুঃখের কাহিনী বাহির হইল। দুই তিন বৎসর তীর্থ পর্য্যটনে কত ব্যয় করিলেন, কত কষ্ট সহিলেন, দান ধ্যান ব্রাহ্মণভোজন, শেষ তাঁর সমস্ত পুণ্য তীর্থস্থানে ফিরিয়া গেল, যে সংসারী সেই সংসারী হইয়া পুনরায় তিনি ঘরকন্নায় মন দিলেন।

যাহা হউক, প্রতিবাসিনী বিধবা সধবা যাহারা কখন বাড়ীর বাহির হয় নাই তাহারা নয়নতারাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তিনি কোন তীর্থই প্রায় বাকী রাখেন নাই, তৎসম্বন্ধে লোকের প্রশংসাবাদ শুনিয়া বড়ই পুলকিত হইলেন। প্রসাদ মালা ফুলী হীরাবলী নামাবলী কুঁড়জালী তিলকমাটী ব্রজের রজ কত কি সামগ্রী বিলাইলেন। কোন নারী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা বলি, বৃন্দাবন মথুরা কি গিয়াছিলে?" প্রশ্ন শুনিয়া তখন নয়নতারা দেবী অতি বিনীত গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ বাছা,

তা যার ভাগ্যে থাক্ শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনের কৃপায় সব দেখে শুনে এসেছি। অপর নারী জিজ্ঞাসা করিল, "বলি হ্যাঁগা, রাধাকুণ্ডে নেয়েছিলে কি? তার জল নাকি শুনেছি মিছরির পানার মত মিষ্ট?" নয়নতারা বলিলেন, "ওগো, পাপ মুখে কি সে সব কথা বলিতে আছে? যার ভাগ্যে থাক সব হয়েছে।" পরে তিনি যেখানে যাহা করিয়াছেন, দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, সমস্ত অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণন করিলেন। যেখানে যান নাই, যাহা দেখেন নাই, যাহা করে নাই, তাহার বিষয়েও বলিলেন। সব কথা খুলিয়া না বলিলে হয়তো পেট ফাঁপিয়া শীঘ্রই মারা পড়িতেন। তবু পাপ মুখে সে সব বলিতে নাই। তীর্থভ্রমণের ফলের মধ্যে এই টুকু শেষ দেখা গেল, বৈকালে মেয়েমহলে গল্পটা খুব জমিত।

বন্ধ্যা পত্নীর স্বামীর উপর বড় একাধিপত্য। নিশানাথ বাবু মার্জ্জিত বুদ্ধি জ্ঞানী হিন্দু এ কথার পরিচয় পূর্ব্বেই সকলে পাইয়াছেন। যৌবনে তিনি একটু অত্যাচারী ছিলেন, যেখানে সেখানে যাইতেন, যা তা খাইতেন, কাহাকেও মানিতেন না। নয়নতারা দেবীর চরিত্র তখন সম্যক প্রস্ফুটিত হয় নাই, কাজেই তিনি স্বামীকে বড় বাগ মানাইতে পারিতেন না। কিন্তু মনে মনে সে রাগটা ছিল, এক্ষণে তাহার পরিশোধ লইবার সময় উপস্থিত। নয়নতারা বাড়ী হইতে বাহির হইবার কালে নিশানাথকে প্রথমে বলিয়াছিল, "তুমি কেবল আমাকে সঙ্গে করিয়া সব দেখাইয়া আনিও, আর তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। তুমিত আর এ সব কিছু মান টান না, আমিই সব করিব।" এই বলিয়াত সে তাঁকে পথে বাহির করিল, শেষ গয়ায় পৌঁছিয়া বলিয়া বসিল, "স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে না হইলে কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না।" এই বলিয়া সর্ব্বাগ্রে সে নিশানাথের মাথা মুড়াইল, তাঁহাকে দিয়া গয়ালীর পা পূজা করাইল, বিষ্ণুপদে পিণ্ড দেওয়াইল, নানা স্থানের পচা পুকুরে ডুবাইল, ছাই ভস্ম কত কি খাওয়াইল। অবশেষে গলায় মালা পরাইয়া, নাকে তিলক লাগাইয়া, মাথায় টিকি ঝুলাইয়া, গায়ে নামাবলী জড়াইয়া দিব্য করিয়া পাঁজির সংক্রান্তির ব্রাহ্মণের মত সাজাইল। হা নিশানাথ! একি তোমার খোয়ার? মূর্ত্তি দেখিয়া যে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে! আর যে তোমাকে চিনিতে পারা যায় না? হায় হায় হায়!

শেষে ঠাকুরাণী তাঁহাকে যেখানে যাহা করিতে বলিয়াছেন নিশানাথ নিরাপত্তিতে তাহা করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে জাতিচ্যুত হওয়ার ভয় প্রদর্শন করিয়া, পরলোকে সদ্গতির লোভ দেখাইয়া স্বামীকে তিনি হস্তগত করেন। "ঘরে মরিয়া ফুলে ঢোল হইয়া পড়িয়া থাকিবে, প্রতিবাসীরা কেহ ছোঁবে না, শরীর পচে গন্ধ হবে, পোকা পড়িবে, চিল শকুনিতে ঠোকরাবে," এ বলিলে কার না মনে ভয় হয়? তীর্থযাত্রীর দল ও পাণ্ডা ঠাকুরেরা এ কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। দশচক্রে ভগবান্ ভূত। কুসংস্কারান্ধ অশিক্ষিতা যমকিঙ্করী স্বরূপা স্ত্রীর পাল্লায় পড়িয়া নিশানাথ বিদ্যা বুদ্ধি হারাইলেন, ছায়ার ন্যায় স্ত্রীর অনুগমন করিলেন। আর কিছু দিন এইরূপে সঙ্গে বেড়াইলে তাঁহার চেহারা পর্য্যন্ত মেয়ে মানুষ হইয়া যাইত।

এই অবস্থায়ত তিনি বাড়ী আসিলেন। এখন ধর্ম্ম অপেক্ষা সমাজের ভয়টাই তাঁর অধিক। পাছে মরিলে সজ্ঞানে গঙ্গা না পান, ঘরে মরিয়া পড়িয়া থাকেন, এই ভাবনাতেই প্রাণ আকুল হইত। ভয়ে ভয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা হোম ব্রত একাদশী জন্মাষ্টমীর উপবাস করিতেন। পাছে কোন দেবতার ক্রোধ হয়, এই জন্য ষষ্ঠী মাকাল পঞ্চানন্দ ঘেঁটু মঙ্গলচণ্ডী ওলাদেবী শীতলা মনসা পীর প্যাগম্বর যেখানে যত গ্রাম্য দেবতা ছিল সকলকেই পূজা দিতেন। নিতান্ত সেকেলে অন্ধবিশ্বাসী স্ত্রী পুরুষেরাও যাহা মিথ্যা কুসংস্কার বলিয়া বহু পূর্ব্বে ছাড়িয়া দিয়াছে তাহাও তিনি মানিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে যখন যখন কলিকাতায় বেড়াইতে যাই-তেন, তখন গোপনে কখনো পাঁউরুটী, কখনো হোটেলের তরকারী ইত্যাদি ভোজন করিয়াছিলেন। সে সমস্ত মনে হইয়া আরও ভয় বাড়িল, কি জানি সে সকল কেহ টের পাইয়া যদি জাতিচ্যুত করে এই ভাবনায় মৃতপ্রায় হইলেন। সময় বুঝিয়া অপদেবতার দল দেখা দিল। তখন ভূত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিল, স্বভাববিরুদ্ধ যে কোন গাঁজাখুরি কথা পুরাণে বর্ণিত আছে সমস্তই সত্য বলিয়া মানিতে লাগিলেন। অদৃষ্টের নিয়ামক গ্রহগণের তুষ্টির জন্য হোম স্বস্ত্যয়ন প্রায়ই করিতেন। ঋষিদিগের প্রণীত শাস্ত্র সমস্তই অভ্রান্ত, তাঁহারা যে বিধি দিয়াছেন তাহা স্বমতবিরোধী হইলেও তাহা অতিক্রম করা যাইতে পারে না, এই

সংস্কার জন্মিল। সংস্কৃত ভাষায় যাহা কিছু লিপিবদ্ধ আছে, সমস্তই তাঁর পক্ষে এখন শাস্ত্র।

নিশানাথের এই সকল মতামত এবং আচার ব্যবহারের সহিত ভাগিনেয় বাঞ্ছারামের কিছু মতভেদ দঁড়াইল। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত বিশুদ্ধ ভক্তি প্রেমের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন; অন্ধ ভাবুকতাও নাই, শুষ্ক জ্ঞানমূলক নীরস কুতর্কের ধর্ম্মও তিনি মানেন না, কাজেই ভ্রান্তি কুসংস্কার কল্পনা উপধর্ম্মের সহিত কোন সহানুভূতি দেখাইতে পারিলেন না মামা ভাগিনার সম্বন্ধটা পূর্ব্বের মত আর তত মিষ্ট রহিল না। তদ্ব্যতীত নিশানাথের অনুপস্থিতিতে বিষয় কার্য্যেরও কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। প্রজাদের নিকট আদায় পত্র রীতি মত হয় নাই, যাহা হইয়াছিল তাহারও পরিষ্কার হিসাব পাওয়া যায় না, যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা ঠিকে ভুল। বাঞ্ছারাম একে ভুলো লোক, এখন আরো কেমন যেন হইয়া গিয়াছেন। আগে পড়া শুনায় কত আঁট ছিল, এখন পুস্তক ছুঁইতেও চাহেন না। লাইব্রেরির ঘরে আলমারিতে যে সকল ভাল ভাল দামী বই ছিল তাহার কোনটার মলাট ছেঁড়া, কোনটার কতকগুল পাতা নাই, কোন কোন বই একবারেই অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। নিশানাথ দেখিলেন, বাঞ্ছারাম যেন নিষ্কর্ম্মা অলসের ন্যায় শিথিল ভাবাপন্ন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। কর্ম্মচারীরা অবসর পাইয়া কয়টা বৎসর ক্রমাগত ঘুমাইয়াছে, আর দাবার বড়ে টিপিয়াছে। বাঞ্ছারামের ইদানীন্তন এ সকল কাজে বড় একটা মনোযোগও ছিল না, সুতরাং সমস্তই গোলমাল। ইহাঁদের উভয়কেই গৃহকার্য্যে অমনোযোগী এবং পরস্পরের প্রতি আসক্ত দেখিয়া কর্ত্তা গিন্নী বিরক্ত হইলেন। স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, কিন্তু মুখ ভার করিয়া থাকিতেন। ইহাতে বাঞ্ছারাম ও সন্তোষিণীর প্রণয় ব্রত সাধনের বড় ব্যাঘাত জন্মিল। ভিতরে ভিতরে নীরবে সন্তোষিণীর প্রাণ ক্রন্দন করে, বাঞ্ছারাম নির্জ্জনে বসিয়া বিষণ্ন বদনে ভাবেন।

নিশানাথ বাবু উদার হৃদয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি, প্রেমমাহাত্ম্য অনেক অবগত ছিলেন। বাঞ্ছারাম ও সন্তোষিণীর মধ্যে যে নিগূঢ় প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন। এজন্য তাঁহার মনে বড় দয়া হইল। হিন্দু

বিধবাদিগের প্রতি তাঁহার সহৃদয়তা পূর্ব্ব হইতেই ছিল। মনে মনে ভাবিলেন, "যে যাহাকে পাইলে সুখী হইবে মনে করে, তাহাকে তাহার পাওয়াই উচিত। কি করিব, আমার যে কোন ক্ষমতা নাই। স্ত্রী যেরূপ প্রগল্‌ভা প্রস্তাব শুনিলে এখনি সম্মার্জ্জনী লইয়া আসিবেন। আমার যদি সাহস থাকিত, তাহা হইলে বিধবা বিবাহ আইনঅনুসারে ইহাদের দুই জনকে পরিণয় সূত্রে আমি গ্রথিত করিতাম। আপনা হইতে যে প্রেম উৎপন্ন হয় তাহাতে বাধা দেওয়ার মত মহাপাপ জগতে আর কিছু নাই। যাউক, আর ও সব ভাবিব না। শেষ আবার কি সমাজচ্যুত হইয়া ঘরে মরিয়া পড়িয়া থাকিব? সকলি কৃষ্ণের ইচ্ছা।"

পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সন্তোষিণী ও বাঞ্ছারামের মন ছট ফট করিতে লাগিল। অন্তরে প্রেমানুরাগের উচ্ছ্বাস উঠিতেছে, বাহিরে প্রতিঘাত পাইয়া তাহা ভিতরে ঢুকিয়া মহা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। কোন কাজে মন লাগে না, আহার নিদ্রায় সুখ নাই, লোকসঙ্গে মিশিতে কিম্বা নির্জ্জনে থাকিতে, কিছুতেই উৎসাহ জন্মে না। যাহা চায় তাহা পায় না, যাহা পায় তাহা চায় না। আশা ছাড়িতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, তাহা চরিতার্থেরও উপায় নাই। প্রবৃত্তির পথ বন্ধ দেখিয়াও মন নিবৃত্তমার্গে ফিরিয়া আসিতে চাহে না। সন্তোষিণীর এখন পূর্ব্বের মত তেমন উদ্বেগ অশান্তি নিরাশ দুর্ভাবনা ছিল না, যাঁহার পদে আত্মসমর্পণের জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তাঁহার দায়িত্ব এখন বাঞ্ছারামের স্কন্ধে চাপিয়া বসিল। সুতরাং নবানুরাগসম্ভূত অপরিতৃপ্ত প্রেমতরঙ্গের আঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয় ভগ্ন চূর্ণ হইল। কিন্তু উভয়েই ইহাতে বিশেষ শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। দুঃখের শিক্ষা পরিণামে বড় কল্যাণপ্রদ, বিষ হইতে অমৃত উঠিবে তাহারই জন্য এ শিক্ষা। বিধাতার চক্রে পতিত হইয়া উভয়েই আধ্যাত্মিক নিষ্কাম প্রীতির পথে যাইবার জন্য ধাবিত হইলেন। এক্ষণে বাহির হইতে ভিতরে, রূপ হইতে গুণে, ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে অতীন্দ্রিয় শান্তির রাজ্যে অমৃতের অন্বেষণ করিতে হইবে। বিধাতার দুর্জ্জয় শাসনে বাধ্য হইয়া তাঁহা-

দিগকে সেই দিকে অনিচ্ছার সহিত ফিরিতে হইল। বিধাতা বিকারী রোগীর জন্য যেন বিষপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে অবশ্য এক দিকে আন্তরিক পিপাসা আশা কামনা বাসনা উত্তেজনা অনুরাগ, অপরদিকে বাহ্য প্রতিবন্ধক শাসন ও প্রতিকূল অবস্থা পরস্পর দুই দলের মধ্যে মহাসংগ্রাম বাঁধিল। অন্তরজগতে কাটাকাটি মারামারি রক্তপাত আরম্ভ হইল। এই শোণিতে নবজীবনের অঙ্কুর বাহির হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সামাজিক উৎপীড়ন।

নিশানাথ তীর্থ হইতে আসিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর ন্যায় কালযাপন করেন এ কথা গ্রামের মধ্যে শীঘ্রই রাষ্ট্র হইল। হরিসভার সভ্যগণের পক্ষে এটা বড়ই মঙ্গলের কথা। সভার প্রধান উদ্যোগী সেই কুড়ারাম ও ঘনশ্যাম সুযোগ বুঝিয়া অবিলম্বে নিশানাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। এবার আর আদরের সীমা নাই, নিশানাথ অস্তে ব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সম্ভ্রমের সহিত পাদ্য অর্ঘ আচমনীয় দিয়া দুই জনকে বসাইলেন। তাঁহার সাত্ত্বিক বেশ ভূষা ভদ্রতা দর্শন, বিনম্র বাক্য শ্রবণে পাণ্ডাদ্বয় আহ্লাদে পুলকিত হইয়া শত মুখে তদীয় গুণগ্রামের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বাঞ্ছারাম কৃষ্ণভক্ত, সুতরাং হরিসভার নব্য হিন্দু সভা মহাশয়গণ এমন শিষ্ট শান্ত ব্যক্তির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবেন না ত কি করিবেন? নিশানাথের এইটীই বড় ভয়, পাছে তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের অভক্ষ্য ভক্ষণের কথা ধরিয়া কেহ পীড়াপীড়ি করে। কিন্তু তিনি যাহাদিগকে ভয় করিতেছেন তাহাদের মধ্যে অনেকে লুকাইয়া এখনো নজরুদ্দীন কোচমানের আস্তাবোলে মুর্গির আণ্ডাসিদ্ধ খাইয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বলে কার সাধ্য? বিশেষতঃ নিশানাথকে এখন

সামাজিক ভয় বিভীষিকায় হতবীর্য্য ভীরু কাপুরুষ করিয়া ফেলিয়াছে, তিনি আপনার অপরাধ ভাবিয়াই শশব্যস্ত, অন্যের দোষ ত্রুটি দেখিবার বা বলিবার সাহস নাই। তদ্ব্যতীত ভাগিনেয় বাঞ্ছারামের স্বাধীন আচার ব্যবহারের জন্য তাঁহার একটা ভাবনা আছে।

কুড়ারাম বলিলেন, "খুড়, আপনার উপর সমাজের ভদ্রলোক সকল বড় চটিয়াছে। তাহারা আগামী কল্য বৈকালে সভা করিয়া আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবে। বিশেষতঃ বাঞ্ছারাম সম্বন্ধে আপনি কি জানেন তাহা আপনাকে বলিতে হইবে। শুনিয়াছি সে না কি সঙ্কটাচরণের বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করিয়াছে?" কথা শুনিয়া নিশানাথের মুক শুকাইয়া গেল, তিনি নিতান্ত ভীত এবং সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাপু, আমি এখন তোমাদের শরণাগত, তোমরা আমাকে গঙ্গা দিও। তোমরা যা বলিবে তাই আমি করিব। এক্ষণে একটু অনুগ্রহ করিতে হইবে। যদি দয়া করে আমার বাড়ী পদধূলি দিলে, একটু জল গ্রহণ কর।

কুড়ারাম ঘনশ্যাম মহা আহ্লাদিত চিত্তে অট্ট হাসি হাসিলেন, এবং জলযোগের প্রস্তাব শুনিয়া যেরূপ সৌজন্য করিবার প্রথা আছে তাহা করিলেন। নিশানাথের বড ভয় ছিল কেহ তাঁহার বাড়ীতে জলগ্রহণ করিবে না। সেই জন্য সস্ত্রীক বিশেষ যত্নের সহিত দুই জনকে জলযোগ করাইলেন।

নিশানাথকে নবানুরাগী কৃষ্ণভক্ত দেখিয়া ঘনশ্যাম নবীন ভাবে কৃষ্ণ-চরিত্রের কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ-ব্রহ্ম ভগবান্, তিনিই জীবনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ, তাঁহার পথ অনুসরণ ব্যতীত এই পতিত হিন্দুজাতির আর উন্নতি লাভের অন্য উপায় নাই।" কৃষ্ণকথা শ্রবণে নিশানাথের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। গদ্গদ কণ্ঠে সাশ্রুনয়নে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আহা, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি কি মনোহর! তাই দর্শন করিয়াই ত আমি জীবহিংসা মৎস্য মাংস পরি-ত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছি। আহা! কবে বৃন্দাবনে যাব, মাধুকরী মেগে খাব, নিরখিব যুগল মূরতি।"

কিন্তু এ কথা গুলির সঙ্গে হরিসভার নব্য সভ্য ঘনশ্যামের বড় সহানু-

ভূতি হইল না, তাঁহার মতে নিশানাথ এক জন অন্ধবিশ্বাসী ভ্রান্ত কুসংস্কারী ভাবুক মনুষ্য। নিরামিষভোজী প্রেমভক্তিপিপাসু সে কেলে রকমের গোঁড়া বৈষ্ণব দ্বারা ভারত উদ্ধার হইবে না এটা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। নবীন হিন্দুর নবহিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে যদি আধুনিক সভ্যতার যোগ না থাকে তাহা হইলে উহা কেহ লইবে না, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। এই জন্য প্রচলিত ধর্ম্মে যে কিছু আশু সুখ সুবিধা আছে তাহা ষোল আনা বজায় রাখিয়া বৈদেশিক সভ্যতার আঠার আনা সুখ সুবিধার সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া লইয়া নূতন হিন্দুশাস্ত্র এবং আচার ব্যবহার তাঁহারা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন। ইহার জন্য কোন একটা ঠাকুর দেবতা প্রয়োজন, নতুবা কেবল যুক্তি বিজ্ঞান সুবিধার দোহাই দিলে জাতসাধারণে তাহা মানিবে কেন, তাই হিন্দুদেবমন্দিরের ভিতর হইতে কৃষ্ণঠাকুরকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। নিহাত পিলেবেগা ভ্যাবা গঙ্গারামের মত ভাল মানুষ ঠাকুরের দ্বারা পতিত ভারত উদ্ধার হইবে না, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, বুদ্ধিমান্ চতুর ঠাকুর চাই; অতএব যদুকুলপতি শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্রই সে কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র।

পরে কুড়ারাম ঘনশ্যাম বিদায় হইলে নিশানাথ বড়ই ভাবিতে লাগিলেন। প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবেন এই ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইল। সে বিষয়ে গোপনে গৃহিণীর সঙ্গে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া কত যুক্তি পরামর্শ করিলেন। শেষ স্থির হইল, পুরোহিতের দ্বারা গ্রহবৈগুণ্য বিনাশার্থ হোম স্বস্ত্যয়ন আদি কিছু দৈবক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন। এই সঙ্গে এটাও স্থির হইয়াছিল, সন্তোষিণী ও বাঞ্ছারামকে বাড়ী হইতে বিদায় দিবেন।

নয়নতারা অনেক ক্রিয়া কর্ম্ম তীর্থ ধর্ম্ম করিয়াছেন, সামাজিক দণ্ডভয়, পৌরহিত্যের অত্যাচার হইতে কিরূপে সহজে মুক্তি লাভ করিতে হয়, কোথায় কি ভাবে কত পরিমাণে উৎকোচ দান করিলে শাস্ত্রীয় বিধি নিয়ম রক্ষা করা যায়, এ সমস্ত তত্ত্ব তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহার সাহস ভরসাও যথেষ্ট। ভয়ে ভীত নিশানাথকে তিনি বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিলেন। নিশানাথ বাবু ইতঃপূর্ব্বে বেশ লেখা পড়া জানিতেন, বুদ্ধি বিবেচনা, সং-

সাহস বেশ ছিল স্ত্রীসংসর্গে তীর্থে গিয়া অবধি কেমন যে মনে একটা বিষম ভয় ঢুকিয়াছে, কিছুতেই আর সে ভয়ের হস্ত হইতে তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। ভয়ে অভিভূত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু আছে সব হরিসভায় দানপত্র লিখিয়া দেওয়া যাউক, আমাদের আর কেই বা আছে, আর কেই বা ভোগ করিবে। তাহা হইলে গ্রামের ব্রাহ্মণ সজ্জন সকলে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। আর তুমি এক কর্ম্ম কর, এই এক শত টাকার নোট আছে লও, লইয়া কল্য সভার আগে যাহাতে স্বস্ত্যয়ন পুরশ্চারণ হয় তাহা করিও। পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়া আনাও।"

কর্ত্রী ঠাকুরাণী সকল বিষয়েই পাকা ঝানু লোক, ধর্ম্মভাবে গলিয়া কিম্বা ভয়ে ভীত হইয়া সহসা যে কিছু বেশী ব্যয় করিয়া ফেলিবেন সে প্রকৃতির লোক নহেন। নিশানাথ দয়াপরবশ হইয়া কোন বৈষ্ণব ভিখারীকে যদি কিছু দান করিতেন, ঠাকুরাণী আবার তাহার ভিতর দস্তুরি কাটিতেন। বিনা পরিশ্রমে তাঁহার নিকট হইতে কোন ফকীর বৈষ্ণব যে কিছু লইয়া যাইবেন সে পথ ছিল না। হয় কাঠ চেলা, না হয় কোন ঘৃণ্য বস্তু স্থানান্তর করা, কিম্বা পুরাতন জানালা দরজায় আলকাতরা মাখা ইহা ভিন্ন এক মুষ্টি তণ্ডুল কেহ তাঁহার নিকট পাইত না। বাড়ীতে রাজমিস্ত্রী কুলি মজুর যখন যখন কাজে লাগিত, তাহাদের নিকট হইতে বেশী কাজ আদায় করিবার জন্য তিনি কাহাকেও বলিতেন, "তোকে কাপড় বকসিস্ দিব।" কাহাকেও বলিতেন, "তোকে খুব পেট ভরিয়া ফলার খাওয়াইব।" মজুরগণ হাসিয়া বলিত, "আহা। মা ঠাকুরাণীর কি দয়ার শরীল। কেবল কাজ লইবার জন্য তুমি লোভ দেখাও। নয়নতারা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেন না। কাহাকেও উকুলি ঝুকুলি ছেঁড়া কাপড় খান, কাহাকেও পচা কাঁটালটা আসটা দিতেন। তাহা পাইয়া কুলি মজুরগণ নানা রঙ্গ ভঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিত আর হাসিয়া বলিত, "মা ঠাকরুণ গো, বড্ড খেয়িয়েছ! প্যাট যেন ফেটে পড়ছে! এবম্ভূত প্রকৃতি যে নয়নতারা তিনি স্বামীকে বলিলেন, "তুমি অত ভয় পাইতেছ কেন? কিছু চিন্তা নাই, আমি সব ঠিক করিয়া লইব।"

অতঃপর পাড়ার নসিরাম ঠাকুরকে ডাকাইয়া একখানা ছয় পয়সার জেলে কাচা, দুই পয়সার মধুপর্কের বাটী, একটু সোনা, একটু রূপা, কিছু তিল কিনিবার জন্য সর্ব্বশুদ্ধ বার আনার পয়সা বাজার করিতে দিলেন, বাকী চারি আনা পুরোহিতের দক্ষিণার জন্য রহিল। বলা বাহুল্য যে নসিঠাকুর সেই বার আনার ভিতর হইতেও আপনার দৈনিক অহিফেন এবং তদ্য চাটের উপযোগী দামটা বাহির করিয়া লইয়াছিল।

পর দিবস প্রাতে রোগা রোগা গোটাকতক আধপাকা কাঁটালি কলা, শুকনা দুই চারি খানা শশার কুচি আর সের খানেক বুকড়ি আতপ চাল, তাহার উপর গোটা দুই দুর্গমণ্ডা দিয়া গিন্নী স্বহস্তে নৈবিদ্য সাজাইলেন, একটু ধূনায় আগুন দিলেন; ঘরে লুচিভাজার জন্য খানিকটা ঘৃত ছিল, ভাঁড়ের তলা চাঁচিয়া তাই হোমের জন্য বাহির করিয়া রাখিলেন। পাছে সেই ঘৃত আবার পুরোহিত ঠাকুর চুরি করে কিম্বা মন্ত্র ফাঁকি দেয় এইজন্য নয়নতারা তীব্র কটাক্ষে, কাণ খাড়া করিয়া সমস্ত সময় বটিনি দিয়া কাছে বসিয়াছিলেন।

ক্রিয়া সমাপনান্তে উপকরণ সামগ্রী গুলির অর্দ্ধেক পুরোহিতকে, বাকী অর্দ্ধেক বাড়ীর ঝি চাকরদিগকে প্রদত্ত হইল। সময়ে সময়ে কোন সমারোহ ক্রিয়া উপলক্ষে ঐ রূপ দুই চারি খানি বেশী নৈবিদ্যও হইত এবং তাহার এক খানি প্রতিবাসী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাটীতে তিনি পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু বিদ্যারত্নের ছেলেরা সে নৈবিদ্যের কথা শুনিলে লাঠি লইয়া বাহির হইত। ঈদৃশ ক্রিয়া কাণ্ডে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য প্রায় কখন বাহিরে যাওয়ার দরকার হয় নাই, নিজের স্বামীকেই সে দিন গিন্নী ঠাকুরাণী ভাল করিয়া ভোজন করাইতেন। কোন ব্রত নিয়ম তাঁহার বাদ পড়িত না কিন্তু সব কাজেই তিনি এইরূপ মুক্ত হস্ত। পুরোহিত ও প্রতিবাসী গ্রামস্থ লোকেরা এজন্য বড়ই বিরক্ত ছিল। নয়নতারা যে কৃপণস্বভাব তাই সকলে জানিত। এবার কর্ত্তাটীকে সকলে বিপাকে ফেলিয়াছে, কিছু না খসাইয়া ছাড়িবে না; কিন্তু নয়নতারা বড় শক্ত ঘানি, তাঁহার হাত দিয়া এক ফোঁটা জল সরে না, টাকা ব্যয়ের ভার তাঁহার হাতে। তাঁহার ঘরের কোন দানযোগ্য অতিরিক্ত সামগ্রী পচিয়া গলিয়া তাহাতে

পোকা না পড়িলে আর তাহা অপরে পাইত না। দান বিতরণটা সমস্ত বাড়ীর ভিতর এবং অতি নিকটস্থ আত্মীয়দিগের ভিতরেই বদ্ধ ছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নসিরাম ঠাকুরের মনে বড় বৈরাগ্যের উদয় হইত। তথাপি সে জজমান ঘরটা হাতছাড়া করিত না। মরিবার সময় যদি কিছু দিয়া যায় এই আশা।

নয়নতারা ঠাকুরাণীর এই বর্ত্তমান দৈবকার্য্য উপলক্ষে দেবতাদিগের সন্তুষ্টি সাধন তত প্রয়োজন ছিল না, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করাই প্রয়োজন, এই জন্য ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন কিছু বাহুল্যরূপে করা হইয়াছে। পাঠকগণ অবশ্য এটা স্মরণ করিতে ভুলিবেন না, যে নয়নতারার বাহুল্য আয়োজন। ব্রাহ্মণেরা মধ্যাহ্নে লুচি কচুরি মালপুয়া ভোজন করিবেন বড়ই আনন্দের কথা। বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া দুইটার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতগণ কেহ তামাকু খাইতেছেন, কেহ হাঁটুর সঙ্গে পৃষ্ঠদেশ গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক ক্ষুধাজনিত নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া ঢুলিতেছেন। যাঁহার অম্লপিত্তের রোগ আছে, তিনি জঠোরানলের কঠোর ক্লেশ সন্তাপ ভোগ করিতেছেন আর চটিতেছেন। লুচি চিনির ফলার বেশী চটিবার যো নাই। সকলেই তীর্থের কাকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন,। অপেক্ষা না করিয়াই বা এত বেলায় যান কোথায়? বাড়ীতে গৃহিণীরা চুলোয় আগুন দেয় নাই। এ কালের সভ্য যুবকেরা নয়নতারা ঠাকুরাণীকে চিনিত। তাহারা দিনের বেলায় নিমন্ত্রণে কোথাও যাইতেও বড় চাহে না। বাধ্যবাধকতার জন্য যে দুই একটী গিয়াছিল তাহারাও ফিরিয়া বাড়ী গেল। অবশিষ্টেরা বাঁধা মার খাইতে লাগিল। ক্ষুধায় ছেলে গুলর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, মহাপ্রাণী ছটফট করিতেছে, এমন সময় "মহাশয়রা গা তুলে আসুন।" এই শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। আহা সে যেন স্বর্গের দৈববাণী। ক্ষুধার্ত্ত শকুনির ন্যায় ব্রাহ্মণেরা "আ। রাম বল, বাঁচা গেল, ওঠরে' রেমো সেমো, বগলা চপলা সব্বাই আমার কাছে বসিস্, আগে তুলিস, তার পর খাস।" (তুলতে আর বড় হবে না। নয়নতারার পাছের দিকে চারিটা চক্ষু) এই বলিয়া আহারে বসিলেন। নিশানাথ ভক্ত গড়ুরের ন্যায় এক পাশে দণ্ডায়মান। আগে আগে তিনি খাইয়া বসিয়া

থাকিতেন, এখন বড় ভয় ঢুকিয়াছে, কাজেই তাঁকেও উপবাসী থাকিতে হইয়াছিল।

পাতা পড়িল, হারাধন শর্ম্মা বলিলেন, "ওহে আমি দধি খাই না, পাতা টাতা বিবেচনা করিয়া দিও।" লবণ দিবার সময়েও ঐ কথা। তিনি দই খাবেন না, তাহার দাবি আর কিছুতে মেটে না। পাতা লবণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষতি পূরণ করিতে চাহেন। অপরাহ্নে ভোজন, পরিবেশক এবং ভোক্তা সকলেই ক্ষুধায় খিটখিটে হইয়া আছে। গৃহকর্ত্রী লুচি কচুরি মালপুয়া মিঠাই সন্দেশ সমস্ত হালুয়াই দোকানে বিশেষরূপে ফরমাইস দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন। যথা সময়ে লুচি সকল ঠক ঠক শব্দে পাতে পড়িতে লাগিল। তার সঙ্গে ঘরে তৈয়ারি তেলের তরকারি। আসকে পিঠের মত স্থিতিস্থাপক মালপুয়াগুলি এমনি প্রেমিক যে মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া দন্তকে আর ছাড়িয়া দিতে চায় না। তাহাতে মিষ্ট অতি কম, ডায়বিটিসের রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। সন্দেশগুলি বেশ মজবুদ গাঁথনি, পাতে দিবামাত্র লাফাইয়া উঠে; জিলাপি তাহার বিপরীত, প্রেমরসে যেন তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এলাইয়া পড়িয়াছে। শুষ্ককণ্ঠ বিপ্রগণ অত্যন্ত ক্ষুধা বশতঃ তাহাই খাইতে লাগিলেন। কিন্তু পরিবেশনকর্ত্তাগণ এমনি সাবধানী লোক, প্রতি বারে এক খানির বেশী লুচি পাতে দিবে না। সুতরাং ইহাতে ভোক্তাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং বৈরাগ্যোদয় হইতে লাগিল। তজ্জন্য কেহ ক্রোধকশায়িত স্বরে "ওহে ও লুচি, বলি ওহে ও হাঁড়িহাতে। চক্ষে দেখতে পাও না নাকি? এই পাতে দিয়ে যাও।" শেষ লুচি সন্দেশে আর কুলাইল না, চিড়া মুড়ি খই পান্তাভাত কলা কাঁটাল ঘরে যাহা কিছু ছিল সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণগণকে দিয়া গৃহস্বামিনী তাঁহাদের ক্ষুন্নিবৃত্ত করিলেন। যাহা কিছু বাকী রহিল তাহা বচনে পুরাইয়া দিলেন। কেহ মনে মনে, কেহ প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল, "ও জানাই আছে পেট ভরিবে না। বেশীর ভাগ ঠোঁট মুখ ছিঁড়িয়া গেল। এদের নাম করিলে অন্ন হয় না।" এইরূপ জনপবাদ শুনা গিয়াছে, যে গ্রামের লোকেরা আহারের পূর্ব্বে কেহ নয়নতারার নাম গ্রহণ করিত না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দলাদলির সভা।

গ্রামের মধ্যস্থলে ক্ষেপা চণ্ডীতলায় সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পর দিবস অপরাহ্নে গ্রামস্থ বিস্তর সভ্য ভদ্র লোকেরা এক এক করিয়া আসিতে লাগিলেন। ক্রমে সভা লোকে পরিপূর্ণ হইল। সভাপতি ধুরন্ধর তর্কচঞ্চু। তর্কচঞ্চু মহাশয় বিদ্যা উপাধি মান সম্ভ্রম তাবৎ বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, তদ্ভিন্ন তাঁহার মূর্ত্তি খানি এ কার্য্যের বিশেষ উপযোগী। তাঁহার উদরের দৈর্ঘ প্রস্থ এবং গভীরতার পরিমাণ আট বর্গ হস্ত। দুই জন লোকে না হইলে তাহা আঁকড়িয়া ধরা যায় না। লোমাবলীতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন। মহাসমুদ্রবক্ষে যেমন দ্বীপ, তাঁহার মুণ্ডিত মস্তকের মধ্যভাগে তেমনি শিখা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ক্ষৌরকার সেই সমুদ্রে পতিত হইয়া সময়ে সময়ে যখন বাড়ী আসিবার পথ ভুলিয়া যাইত, তখন সে ঐ শিখার অবলম্বনে দিগ্ নিরূপণ করিয়া লইত। তর্কচঞ্চুর দীর্ঘ নাসার অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রদ্বয় কাশীর নস্যপ্রভাবে অতিশয় বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছিল। যখন তিনি উদররূপ সুমেরু পর্ব্বত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া হাত পা ছড়াইয়া চিৎপাত হইয়া নিদ্রা যাইতেন তখন সেই নাসা গহ্বর হইতে সিংহগর্জ্জনবৎ ঘন নির্ঘোষে প্রচণ্ড বেগে নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইত। তাহার ঘর্ঘর কর্কর রবে বাড়ীর লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত কেবল তাহা নহে, প্রতিবাসীরাও সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠিত, এবং অকালে নিদ্রাভঙ্গজনিত ক্রোধ বিরক্তিতে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার প্রতি সকলে মর্ম্মান্তিক অভিসম্পাত প্রদান করিত, কটুকাটব্য বলিত। কখনো কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় স্বন স্বন শব্দে, কখনো বজ্রের ন্যায় কড় কড় নাদে, কখন কখন পঙ্কিলপুষ্করিণীবাসী কট কটে ব্যাঙের ন্যায় পট পট রবে, কখন বা বংশী ধ্বনিতে উহা বাজিত। এক একবার নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার ঝঞ্ঝাবায়ু ক্ষুব্ধ নদী কল্লোলের ন্যায়

ভীষণ শব্দ করিয়া উঠিত। গভীর রজনী কালে মৃতবৎ নিদ্রিত পৃথিবীর নীরব আকাশের স্থির সমীরণবক্ষে সে শব্দতরঙ্গের লীলা লহরী কত বিধ রঙ্গে যে ক্রীড়া করিত তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু এত যে কোলাহল আন্দোলন ভীমগর্জ্জন, নাসিকাস্বামী তাহার বিন্দু বিসর্গও টের পাইতেন না। নিদ্রাভঙ্গজনিত ক্লেশের কথা কেহ অভিযোগ করিলে, তিনি হাসিয়া বলিতেন, "আমার কি নাক ডাকে? কৈ আমিতো কিছুই শুনিতে পাই না!" সৌভাগ্যের বিষয় এই, ধ্রুবঙ্করের ধ্রুবঙ্করী অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে এক ঘরে শয়ন করিবার কেহ ছিল না। কোন কোন্দলপরায়ণা বরাঙ্গিনীর সহিত যদি ইহাঁর পুনঃপরিণয় হইত, তাহা হইলে আমরা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইতাম। এরূপ প্রবাদ আছে, যে নিদ্রাকালে তর্ক চঞ্চুর নাসাকন্দরের ভিতরে ক্রীড়াশীল ক্ষুদ্র মূষক শাবকবৃন্দ স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিয়া আবার প্রমুক্ত মুখগহ্বর দিয়া বাহিরে আসিত। তাঁহার বক্ষবিলম্বিত স্থূল স্তনদ্বয়ের নিম্নভাগে উদরবাজ্যের রোমাবৃত সামান্ত রেখা ক্ষুদ্র তটিনীর ন্যায় সেই বিশাল বপু পরিবেষ্টন করিয়াছিল। গ্রীষ্ম সমাগমে উদরান্নিহিত দধি মিষ্টান্ন, অম্র এবং কণ্টকী ফলসঞ্জাত উত্তপ্ত বাষ্পোদ্গমে যখন প্রতি লোমকূপ হইতে ঘর্ম্মবিন্দু সকল বৃষ্টিধারার ন্যায় প্রবাহিত হইত, তখন জ্ঞান হইত যেন গঙ্গা ভাগীরথী মহাবেগে সাগরসঙ্গমের পানে ছুটিয়া যাইতেছেন। সে দেহখাদ মধ্যে যে কত কত ক্ষুদ্র কীট জন্ম গ্রহণ করিত এবং জন্মিয়া অকালে মরিয়া অবশেষে সেইখানেই পচিয়া থাকিত তাহা কে গণনা করিবে?

সভাপতির করীন্দ্রতুল্য বিপুল তনুর উপযোগী বেত্রাসন জগতে এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই, এই জন্য এখ খণ্ড বিস্তৃত তক্তাপোষের উপর তাঁহাকে বসান হইল। পল্লীগ্রামের দলাদলির সভা আর মেছহাটা কিম্বা এঁধো পোস্তা দুই সমান। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল, সকলেই এক সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। দশ পনরটা বিভিন্ন দলে কথা চলিতেছে, কে কার কথা শুনিবে। অতঃপর ঘনশ্যাম বাবু দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "নিশানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগিনা বাঞ্ছারাম হিন্দু আচারবিরোধী হইয়াছেন, তিনি ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে গ্রামবহিস্কৃত এবং জাতিচ্যুত করা

হউক! অন্যথা নিশানাথ বাবু তাহাকে লইয়া একাকী সমাজচ্যুত হইয়া থাকুন।"

আহ্বান্ শুনিয়া নিশানাথ ভয়ে জবু থবু হইয়া পড়িলেন। দাঁড়াইতে যান, পা থর থর করিয়া কাঁপে। কথা কহিতে যান, তো তো করিয়া কথা আটকাইয়া যায়। বহু কষ্টে কোন রূপে সাহসে ভর করিয়া যদি বা দাঁড়াইলেন, কিন্তু কটির বসন শিথিল হইয়া কাচাটা খুলিয়া গেল; কাচা গুঁজিতে কোঁচা খুলিয়া পড়িল, সর্ব্বাঙ্গে দর দর ধারে ঘাম ছুটিতে লাগিল, আরো কিছু গুরুতর শারীরিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। নিশানাথ কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "আঁ—আঁ—আঁমাকে, গ—গ—গ—গঙ্গা দিও। আঁ আঁমি যেন ম মরে ম মরে থা থাকিনে।" কুড়ারাম নিকটে ছিলেন, তিনি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন "তোমার কোন ভয় নাই, স্থির হও, আমরা তোমাকে বাঁচাইয়া দিব।"

সেই সময় সভার মধ্যে সমুদ্রজলকল্লোলবৎ বড একটা গণ্ডগোল উঠিল। বাঞ্ছারামের পক্ষে যে দুই এক জন ছিল তাহারাই প্রথমে গোল তোলে, শেষ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। পরস্পর পরস্পরের নাম ধরিয়া গুপ্ত দোষ, পারিবারিক দুর্নীতি কলঙ্ক ঘোষণা আরম্ভ করিল। তখন ক্রোধভরে কেহ ঘুঁষি উচায়, কেহ দন্ত কিড়মিড়ি করে, কেহ চেঁচায়, কেহ টিকি নাড়ে, কেহ দাঁত খিচিয়ে গালাগালি দেয়, কেহ সভাপতির গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে। দুই পাঁচ জন যাঁহারা বিজ্ঞ প্রবীণ শান্ত শিষ্ট ছিলেন তাঁহারা যথারীতি বক্তৃতা করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হস্ত প্রসারণ করিলেন, গলায় সান দিলেন, দুই একটা কথাও বলিলেন, কিন্তু কেহই তাহা শুনিতে পাইল না, মহাগণ্ডগোলে সকলে মাতিয়া উঠিল। সঙ্কটাচরণের ভ্রাতা বিকটবদনও সভায় উপস্থিত ছিল। সে তখন হিন্দুমূর্ত্তি ধরিয়া হিন্দুভাবে কথা কহিতেছে আর বলিতেছে, "বাঞ্ছারামকে জাতিচ্যুত করা উচিত, নতুবা আমাদের সনাতন আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না। তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আমি তার সাক্ষী আছি। এখন আর আমরা তাঁহার সঙ্গে কোন মতেই আহার ব্যবহার সংশ্রব রাখিতে পারি না।" বিকটের এরূপ বৈরনির্য্যাতনের একটু কুটীল রহস্য

ছিল। সে সন্তোষিণীকে পাইবার আশা রাখিত। তার বিশ্বাস যে সে বড় গুণবান্ সুপুরুষ, বাঞ্ছারাম নির্ব্বোধ পণ্ডিত অরসিক ব্যক্তি। কিন্তু তাহার আশায় ছাই পড়িল, সুতরাং হিংসায় জ্বলিয়া কিরূপে কখন বাঞ্ছারামের অনিষ্ট সাধন করিবে, তাহারই চেষ্টায় ফিরিত। এক্ষণে তাহার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাই নির্লজ্জের ন্যায় বলিতেছে আর্য্যধর্ম্ম লোপ হইল। বিকটের চীৎকার কোলাহল শ্রবণে কতিপয় উদ্ধতস্বভাব যুবা তাহাকে পাতিনেড়ে দুষ্ট সয়তান বলিয়া তিরস্কার করিল। মহা হুল স্থূল হট্টগোল, কে কি বলিতেছে, তাহা শুনা যায় না। কেহ বলিতেছে, হরিসভার সভ্যেরা গোপনে যবনের হাতে মুর্গিমাংস খায়। কেহ বলিতেছে, সম্পাদক মহাশয় সভার হিসাব দেন নাই, তিনি টাকা চুরি করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া অপর এক জন বলিয়া উঠিল, চাঁদার টাকায় লুচি পাঁটা খাওয়া হইয়াছে, আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। আর এক টীকিধারী কৃতবিদ্য যুবা দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "হরিহর চাটুর্য্যের জামাই বিলাত হইতে আসিয়া গোপনে শ্বশুর বাড়ীতে সে দিন খাইয়া গিয়াছে।" তচ্ছ্রবণে গের-বাঁধা লম্বাটিকি দুলাইয়া ক্রোধকম্পিত অধরে হরিহর বলিল, "কোন্ হারামজাদা এমন কথা বলে রে। তার মাথায় আমি ছুশো জুতো গুণে মারি।" কিন্তু তিনি রাগ করুন আর যাই করুন, কথাটা সত্য আমরা জানি। মুর্গির ঠ্যাং আর হাঁসের ডিমের খোলা প্রায় চাটুর্য্যে মহাশয়ের ঘরের কানাচে দেখা যাইত। যাহা হউক, সে কথা আর আমরা বেশী বলিতে চাই না। বলিয়া কে এখন বারাসৎ আব ঘর করিবে! পাঠক মহাশয়দের মধ্যে যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন শনিবারের রাত্রে তত্ত্ব হইলে অনা-য়াসে জানিতে পারিবেন। অধিক আর কি বলিব, এই ম্লেচ্ছংক্ষ্য হিন্দুর অখাদ্য (এক্ষণে সুখাদ্য) স্পর্শ করিয়া এক দিন আমাদিগকে পৌষ মাসের রাত্রে গঙ্গাস্নান করিতে হইয়াছিল।

কুড়ারাম ভায়াও এ গণ্ডগোলে নিস্তার পাইলেন না। তিনি এক জন সুরাপায়ী সভ্য, পূর্ব্বে যখন পৈতৃক বিত্ত বিভব ছিল, তখন নিজ অর্থে মদের হ্রদ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সাঁতার খেলিতেন। এক্ষণে সঞ্চিত সম্বল নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তাই ব্রজের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া

মধুকরী মাজিয়া খান। শেষাবস্থায় তিনি ভিটে মাটী সর্ব্বস্ব বেচিয়া এক খানি মদের দোকান খুলিয়াছিলেন। দোকান খুলিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন, তিন শত টাকার মদে তিন শত টাকা লাভ। সেই লাভের টাকার উপর নির্ভর করিয়া প্রায় অর্দ্ধেক মদ আগেই খাইয়া ফেলিলেন। তদনন্তর যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহা বিক্রয় কালে ঢালিয়া দিতে ভাঁড়ে গেলাসে যে টুকু লাগিয়া থাকিত তাহা চাটিয়া খাইতেন। একবার এক জন জন্মমাতাল যুবা মদের বোতল বগলে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিল, উঠিবার সময় অসাবধানতা জন্য বোতলটী পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়, এবং যুবা ভয় ও লজ্জাবশতঃ প্রস্থান করে। কুড়ারাম তাহার সঙ্গে ছিলেন। মাচ দেখিলে যেমন পেত্নী পাছে লাগে, মদের বোতল দেখিলে তেমনি তিনি পাছে লাগিতেন; সুযোগ পাইয়া সেই ধরাপতিত মদ টুকু চাটিয়া খাইলেন। অমূল্য ধন মদকে কোথাও অপচয় হইতে দেখিলে কুড়ারামের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তিনি মদের দোকান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষ দেনার দায়ে কিছু দিন কারাবাসও করিয়াছিলেন। এই সকল গূঢ় রহস্যের কথা এক ব্যক্তি সভার মাঝে সমস্ত বলিয়া ফেলিল।

পরিশেষে সকলেই সকলের দোষ টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। সভাপতি মহাশয়ের পরিবারমধ্যে কবে কার নামে কি কলঙ্ক রটিয়াছিল তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সমস্ত কার্য্যবিবরণটীর শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন গুরুতর দোষে দোষী, প্রতি ঘরেই কেহ না কেহ ম্লেচ্ছান্ন ভোজন করিয়াছে, অতএব সকলেই জাতিচ্যুত দণ্ডে দণ্ডার্হ। অনন্তর মধুরেন সমাপয়েৎ, মারামারির উপক্রম হইল। সভাপতি গোল থামাইতে চেষ্টা করিলেন, কেহ মানিল না; অধিকন্তু তাঁহাকে পাঁচ জনে পাঁচ দিক্ হইতে নানা কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া একবারে উস্তং ফুস্তং করিয়া তুলিল। তখন সেই স্থূল কলেবর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চক্ষে যেন আঁধার দেখিতে লাগিলেন। জলতৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গেল, বাতুলের মত হতবুদ্ধি হইয়া কি সব প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাত পা ছুড়িয়া "ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও!" বলিয়া মহা চীৎকার আরম্ভ করিলেন। সভাপতির গুরুভারবিশিষ্ট

প্রকাণ্ড দেহখানি এত ক্ষণ তক্তাপোষের অনেক স্থান ব্যাপিয়া ছিল, যখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সমস্ত ভার (ওজনে প্রায় সাত আট মোণ হইবে) অল্প স্থানে চাপিয়া পড়িল. তাহার উপর আবার হস্ত পদ সঞ্চালন, সজোরে চীৎকার, কুর্দ্দন, ঝম্পন, সুতরাং আর কত সহ্য হইবে; তক্তাপোষ খানি মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গে তর্কচঞ্চুর মৈনাক পর্ব্বত সম দেহখানি পড়িয়া গেল। তক্তাপোষ ভঙ্গ এবং দেহের পতন কালে একটা অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়াছিল। সভাপতি তক্তাপোষের ভগ্ন স্থানের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া গেলেন, তাঁহার গলদেশ এবং মস্তকটী মাত্র জাগিয়া রহিল। তদবস্থায় থাকিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে প্রাণের দায়ে সিংহকবলিত গজের ন্যায় গাঁ গাঁ শব্দ করিতে লাগিলেন, আঘাতে সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা বহিতে লাগিল, তখন গোলমাল থামিল এবং সভাও ভঙ্গ হইল। পরে মোটা মোটা বাঁশের সাঁই বাঁধিয়া তাহার উপর চড়াইয়া পঁচিশ জন বাহকে ধূবন্ধরকে বাটী লইয়া যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্য নির্ণয়।

বাঞ্ছারামের মরা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটিল তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে বাহিরে ভয়ানক ঝড় তুফান উঠিল। বাহ্য প্রতিকূল অবস্থা তাঁহাকে অন্তরের অন্তরতম দেশের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তখন তিনি বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক অন্তর্দ্দিষ্টিসহকারে দেখিলেন, "প্রেমবিকারজনিত তরঙ্গ তুফানের লীলালহরী রঙ্গ রস আশা পিপাসা অনুরাগ আকর্ষণ বিলাস উচ্ছ্বাস উত্তেজনা চাঞ্চল্য মত্ততা একটী বিষম পরীক্ষা, অথচ প্রলোভনের বিষয়। ইহাতে বিচিত্র গতিক্রিয়া আছে। যদিও তাহাতে অনেক যন্ত্রণা পরিতাপ অবসাদ, তথাপি অতিশয় লোভের সামগ্রী। এই জন্যই চিন্তাশীল জ্ঞানীরা বলেন, মত্ততার পরিণাম ফল অবসাদ নির্জ্জীবতা। নির্ব্বাণের রাজ্যে এমন

বিলাস বিকারও নাই, অশান্তি নিরাশাও নাই, সেখানে কেবলই শান্তি আর আরাম।”

যাহারা বলে “সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল,” শেষোক্ত অবস্থা তাহাদের পরম প্রার্থনীয়। কিন্তু যাহারা বর্ষার মহাবেগবতী নদীর তরঙ্গান্দোলিত বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দ্রুতগামী স্রোতের উপর জলসিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিতে করিতে জীবনতরী চালাইতে চায়, প্রবল পবনতাড়নে সমুত্থিত উত্তাল তরঙ্গমালার তর তর পতপত কল কল ধ্বনি শুনিতে ভালবাসে, সেই লীলারসপিপাসু প্রেমিক বীরেরা নির্ব্বাণের শান্তি অন্বেষণ করে না। তাহারা শোণিতস্রোতপ্লাবিত অগ্নিময় সমরক্ষেত্রে ভীষণ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া রণরঙ্গে নাচিবে, দৌড়িবে, মার খাইবে, হাসিবে কাঁদিবে, অবশেষে প্রাণ দান করিবে, এই তাহাদের নিয়তি এবং ইহাই প্রকৃতি। প্রকৃতিভেদে এই শান্তি এবং প্রেমমত্ততার কার্য্য দৃষ্ট হয়।

বাঞ্ছারাম এখন প্রেমাবেশে হাসিতে এবং কাঁদিতে লাগিলেন। শান্তি ও প্রেম দুইয়ের কোনটীই তাঁহার পক্ষে এখন আর উপেক্ষণীয় নহে। নির্ব্বাণের অটল শান্তি, প্রেমের রসবিলাস মত্ততা পর্য্যায়ক্রমে মানবস্বভাব ভোগ করিতে চায় এটা তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিলেন। যদিও হৃদয়নদীতে দুর্জ্জয় প্রেমের বান ডাকিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানী বাঞ্ছারামকে একবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিতেছে না। প্রাবৃটের নদীপ্রবাহমুখে প্রোথিত বংশদণ্ড যেমন কম্পিত হয়, তেমনি সার চরিত্রের স্থির ভূমিতে মূল বদ্ধ করিয়া তিনি এক একবার প্রেমাবেশে কাঁপিতেছিলেন। তদবস্থায় বিচার করিতে বসিলেন, কি করা কর্ত্তব্য তাহা ভাবিতে লাগিলেন।

“প্রেমটী বড় ভাল জিনিষ, সৃষ্টির সার পদার্থ। ইহাকে বিশুদ্ধ ভাবে আত্মস্থ করিতে হইবে, মায়া প্রলোভনে ভুলিয়া থাকিলে সে দেবদুর্লভ ধন লাভ করিতে পারিব না, অতএব সম্মোহিনীর সহিত বাহ্য সম্বন্ধ আপাততঃ একান্ত পরিহার্য্য।” সহসা এই সিদ্ধান্ত তাঁহার মনে উদয় হইল।

পণ্ডিত বিচার করিতে বসিলেন বটে, কিন্তু এ বিচার শাস্ত্রীয় পরোক্ষ মৃত জ্ঞানের বিচার নয়, ইহা জীবন্ত প্রত্যক্ষ প্রলোভন। ভয় কিম্বা প্রলোভন যখন কোন কল্পনার বিষয় হইয়া বহু দূরে অবস্থিতি করে, তখন তাহাকে জ্ঞান-

বিচার বলে পরাভূত করা সহজ; কিন্তু যখন তাহা মূর্ত্তিমান আকার ধরিয়া সম্মুখীন হয় এবং মনুষ্যের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে তখনই বীরত্বের পরাক্রম বুঝা যায়। বরং লোকে ভয় বিপদের বিরুদ্ধে দাঁত খামাটি করিতে পারে, কিন্তু মনোমুগ্ধকর চিত্তোন্মাদকর প্রলোভনের সম্মুখে হালে পানি পাইলাম না বলিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকে। গৃহে বসিয়া আপনাকে অনেকে নিরাপদ মনে করিতে পারেন, যে অবস্থায় যিনি পড়েন নাই সে অবস্থাকে তিনি জয় করিয়াছেন ভাবিয়া গর্ব্বিত ভাবে আত্ম-গরিমা প্রকাশ করেন, কিন্তু অসাধারণ পুরুষকার ব্যতীত পরীক্ষা হইতে কেহ উদ্ধার হইতে পারেন না। এমন এক সময় ছিল যখন বাঞ্ছারাম নারীর সৌন্দর্য্যকে অসার মায়া বলিয়া অনায়াসে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তখন রূপের আকর্ষণ বা প্রেমের প্রলোভন তাঁহার চক্ষু এবং হৃদয়ের ভিতর প্রবিষ্ট হয় নাই। যে বস্তুতে লোভ জন্মে না, বরং যাহার স্মরণে মহা ঘৃণা বিরক্তির উদয় হয়, কিম্বা আদৌ যাহার মাধুর্য্য অনাস্বাদিত আছে, বিনা সাধনে তাহা মানবমনে বৈরাগ্য আনিয়া দেয়। বাঞ্ছারামের মাংস-পিণ্ডবৎ চিররুগ্না বিবাহিতা পত্নী নিজগুণে সে বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। পৃথিবীতে এরূপ অবস্থায় পড়িয়া অনেকে বৈরাগী হইয়াছেন, কিন্তু সে কেবল দুঃখের বৈরাগ্য। বিকটবদনের জীবনে তাহার প্রমাণ পরে সকলে পাইবেন। একে তিনি আলা ভোলা পণ্ডিত মানুষ, তাহার উপর আবার এই প্রেমের উৎপীড়ন, সুতরাং মনের বাঁধন, জ্ঞানের শাসন সমস্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আহা, বিজ্ঞানের পাগলকে কেন সন্তোষিণী প্রেমে পাগল করিল! ইচ্ছা অনুরাগ আশা পিপাসা এবং প্রাণের সমগ্র টান একদিকে ছুটিতেছে, দুর্ব্বল কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহার গতি ফিরাইবার জন্য চেষ্টা ও সংগ্রাম করিতেছে। ইহা নিতান্ত অপ্রীতিকর কঠোর কর্ত্তব্য। সহজে স্বইচ্ছায় কে তাহা করিতে চায়? কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্য ত্যাগস্বীকারের যথার্থ পরিচয় এই খানে। যে চিরকাল কষ্ট-সহিষ্ণু, দুঃখেতেই যে চিরদিন কাটাইয়া আসিতেছে, তাহার কষ্ট বহনকে প্রকৃত বৈরাগ্যের নিদর্শন বলা যায় না। ভগবান্‌কে ভালবাসিয়া তাঁহার প্রেমের অনুরোধে যে ব্যক্তি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হয়, এবং

কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক ত্যাগস্বীকার করে তদ্দ্বারা স্বর্গীয় বৈরাগ্য এবং ভগবৎ-প্রেমানুরক্তির দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। দৈবশক্তির বিশেষ সাহায্য বিনা ইহা কেহ পারে না।

বাঞ্ছারাম মনে মনে এইরূপ বিচার আরম্ভ করিলেন ;—"রক্ত মাংস অস্থি ক্লেদবিশিষ্ট জরা বার্দ্ধক্য মৃত্যুর অধীন যে শরীর তাহাতে কেন আমি প্রলুব্ধ হইব? পৃথিবীর অসার স্নেহ মমতা প্রীতি সৌজন্য সেবা ভক্তি তাই বা কত ক্ষণের জন্য? এ জগতে যদি এক গুণ সদ্ভাব প্রেম দেখি, তাহার সঙ্গে সহস্র গুণ হিংসা দ্বেষ নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতা কি দেখিতে পাই না? অতএব রূপও মিথ্যা গুণও মিথ্যা, সত্য কেবল প্রেম। তাই বা কিরূপে বলিব? এ পৃথিবীতে কার সঙ্গে কত দিন প্রেম থাকে? সভ্যসমাজে একদিকে যেমন কোটশিপ্ ও হনিমুন্ সম্ভোগের আড়ম্বর, অপর দিকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে ডাইভোর্সেরও তেমনি সমারোহ। রূপ যৌবনসম্ভূত প্রেম, নীচ স্বার্থপ্রসূত ভালবাসার পরিণাম ফল দেখিয়া প্রেমকে আর প্রেম বলিতে আমার ইচ্ছা হয় না, উহাকে ইন্দ্রিয়বিকারজনিত মোহপ্রলাপ বলিলেই ঠিক হয়। অবশ্য অকৃত্রিম নিস্বার্থ প্রেম নিত্য বস্তু, তাহা আমার প্রার্থনীয়, কিন্তু সে বস্তু কোথায়? প্রেমও অনেক স্থলে সাময়িক বিকারমাত্র। যে প্রেমে দুইকে এক করে, যাহা মরমে মরমে পশিয়া মিশিয়া দুই এক হইয়া যায়, যাহা পরস্পরবিরোধী পদার্থকেও মিলাইয়া দেয়, সেই মিষ্ট প্রেম, অপার্থিব আধ্যাত্মিক প্রেম আমি চাই।"

যাই তিনি এই কথা বলিলেন, অমনি তাঁহার দেহপুরনিবাসী রিপু-পরিবার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি এমন কথা। তবে আমরা কি কেহই নই? আমরা কি কেবল মৃত জড়পিণ্ড মাত্র?" ইন্দ্রিয়-গণ মহা ক্রোধে অভিমানে আস্ফালন করিয়া ভয়ানক তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। প্রবৃত্তির অন্দরমহলে মরাকান্না উঠিল; বহুপত্নিক কুলীন ব্রাহ্মণ মরিলে তদীয় বিধবাগণ যেমন এক সঙ্গে ক্রন্দন করে নিবৃত্তির কথা শ্রবণে প্রবৃত্তিগণ এক সঙ্গে তেমনি চীৎকার রবে এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল ;—"হায়, আমাদের সাধ পূর্ণ হইল না! পিপাসা মিটিল না! যৌবনে পদা-র্পণ করিতে না করিতে আমরা বৃদ্ধ হইলাম! গৃহধর্ম্মযাজন, অপত্যাদির

মুখাবলোকনস্পৃহা চরিতার্থের পূর্ব্বেই আমাদিগকে বৈরাগী বনচারী হইতে হইল। যে জন্য পৃথিবীতে মানবদেহে জন্ম লইয়াছিলাম, তাহার কি করিয়া গেলাম? এ দুঃখত মরিলেও যাবে না। হায়! হায়! কি নিষ্ঠুরতা। পিপাসা উদ্দীপন করিয়া শেষ কি না মুখের মধ্যে অম্লরস ঢালিয়া দেওয়া!” মাদকদ্রব্যাপহৃত ঘোর মদ্যপায়ী অহিফেনসেবীর ন্যায় রিপু ছয়জন উন্মাদ প্রায় হইয়া মাথা খুঁড়িতে এবং চুল ছিঁড়িতে লাগিল। কেহ বলে আমি গলায় ছুরি দিব, কেহ বলে জলে ডুবিয়া মরিব; কেহ অঙ্গে ভস্ম মাখিয়া কম্বল পরিয়া মাথা মুড়াইয়া ফকীর হইতে চায়, কেহ বক্ষে করাঘাত হানে; এইরূপে তাহারা ক্রন্দন কোলাহলে গগন মেদিনী আকুল করিয়া তুলিল। যৌবন বয়সে এরূপ বৈরাগ্য অনাসক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং অধর্ম্ম তাহাও বলিতে বাকী রাখিল না। শরীরের আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব কুটুম্বিনী অনেক, তাহারা সকলে মিলিয়া যখন হা হতোঽস্মি আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন বাঞ্ছারাম বড় বিপদে পড়িলেন।

কিন্তু সেই বিষম কোলাহল গণ্ডগোলের ভিতরেও মৃদুস্বরে কাণে কাণে বিবেক বলিতেছে, “তুমি উহাদের আর্ত্তনাদে ভুলিও না, এবং তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত হইও না। উহারা এইরূপে চিরকাল লোককে ভুলায়। খানিক পরে আপনিই এখন চুপ করিবে। এ সকল দুষ্ট বালকের দুষ্ট ক্ষুধার ক্রন্দন।”

বাঞ্ছারাম আবার ভাবিতে লাগিলেন, “শান্তিও মিষ্ট, প্রেমও খুব মিষ্ট। যে প্রেমবিন্দু আমার নীরস প্রাণে রস সঞ্চার করিয়াছে আমি তাহার সিন্ধুতে কবে যাইব! তাঁহার কাছে পৌঁছিলে আমি নিত্য প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতে পাইব। পৃথিবীতে এমন সামগ্রী থাকিতে হায়, লোকে কেন এত কষ্ট পায়! কেনই বা হিংসা দ্বেষ কলহ বিবাদ? প্রতি হৃদয়ে হৃদয়েইত এই সুমধুর প্রেম আছে! কেন তবে সমস্ত হৃদয় এক হইবে না? আহা! আমার যাহা ছিল না তাহা হইয়াছে। সন্তোষিণী আমার প্রেমের গুরু, তাহাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া একা থাকিব। বিধাতা গোপনে বসিয়া কি সুন্দর সুরভিময় পদ্মফুলটী আমার জন্য রচনা করিয়াছিলেন! এ স্বর্গীয় সুধা কি আমি পান করিবার উপযুক্ত? তবু কেন তিনি আমায় দিলেন?

"নারীর সুকোমল প্রকৃতির শীতল ছায়ায় বসিয়া আমার তাপিত হৃদয় আরাম সম্ভোগ করিয়াছে, ইহা না হইলে আমার জীবনের একটা দিক্ শুকাইয়া যাইত। পুরুষ প্রকৃতির মিলন ভিন্ন যখন সৃষ্টি রক্ষা পায় না, তখন অর্দ্ধ অঙ্গ ছাড়িয়া আমি থাকিই বা কিরূপে? স্ত্রীজাতির মধুর মূর্ত্তি, সুকোমল সুমিষ্ট বচন, সহাস্য আনন, সরস ব্যবহার, উল্লাসকর সহবাস; তাহার সঙ্গে একত্র উপবেশন, পান ভোজন, কৌতুক বিহার, নৃত্য গীত, আমোদ প্রমোদ এটা উন্নত সুশিক্ষিত সভ্যসমাজেরও যখন প্রচলিত প্রথা দেখিতে পাই, তখন অবশ্যই ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় বিজ্ঞান আছে। বাস্তবিক স্ত্রীজাতির সহায়তাতে ইয়োরোপীয় সভ্য জাতিরা এত উন্নত কার্য্যক্ষম এবং সুখী। উঃ! এটা কি প্রভূত শক্তি! যে মহাবীর নেপোলিয়ানের হৃদয়কে সমরক্ষেত্রশায়িত শোণিতধারাবিগলিত লক্ষ লক্ষ মৃত এবং অর্দ্ধমৃত সৈন্য আর্দ্র করিতে পারে নাই, ভীষণ মৃত্যুর করাল গ্রাসে পড়িতেও যাঁহার মনে শঙ্কা হইত না, তিনি জোসেফাইনের বিরহ স্মরণ করিয়া অধীর হইতেন। প্রেমশক্তি বাস্তবিকই বজ্র বিদ্যুৎ জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি ভৌতিক শক্তি অপেক্ষা মহাতেজস্বিনী। জনসমাজের পরিচালক শক্তির মধ্যে এইটীই সর্ব্বপ্রধান। ইহার উপলক্ষে কতই রাজবিপ্লব, সমাজবিপ্লব হইয়াছে। প্রেম সুবহু কার্য্যের প্রবর্ত্তক।

"নারীসঙ্গ যে চিত্তবৃত্তি বিকাশের পক্ষে স্বাস্থ্যকর উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মিছে ভয় করিলে চলিবে কেন? ইহার ফলোপধায়িতা বুঝিয়াই ইয়োরোপীয়েরা মুক্তভাবে নারীসমাজে বিচরণ করে, তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর বন্ধুত্বের মিলিত হয়। এই জন্যই তাহাদের দাম্পত্য প্রেমও অকপট এবং পরীক্ষিত,—প্রাচীরে ঘেরা নহে। সামাজিক নীতি, পারিবারিক শান্তি কুশল পবিত্রতাকে বাঁচাইয়া উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র সমাজ একপ স্বাধীন ব্যবহার যখন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, তখন এটা একবারে হাসিয়া উড়াইবার কথা নয়, সুসভ্য সুশিক্ষিত নরনারীদিগের সামাজিক প্রমুক্ত ব্যবহারের ভিতরে নীতির শাসন জিতেন্দ্রিয়তা যথেষ্ট দেখিতে পাই। বাস্তবিক চিত্তসংযম ইয়োরোপীয়দিগের জাতীয় মহত্ত্বের একটী মহৎ কারণ। আমরা বাঙ্গালী হিন্দু, একপ শিক্ষা লাভের

আমাদের কোন উপায়ই নাই। এই জন্য আমাদের সামাজিক নীতি কঠোর অস্বাভাবিক হইয়া রহিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর প্রকৃতিবিরুদ্ধ শাসনে হিন্দুজাতি এক দিকে যেমন বদ্ধভাবাপন্ন, অপর দিকে তেমনি শিথিল। কোন বিষয়ে আঁটা আঁটি নাই। হায়! কবে আমরা স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা বুঝিতে পারিব। নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে সরস সামাজিক ব্যবহার না মিশিলে এ জাতির উন্নতি হইবে না।

"অপত্যস্নেহ, পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুতার প্রণয় যদি দোষের না হয়, তবে নরনারীর সখ্যপ্রণয় কেন দোষের হইবে? বিজ্ঞানের চক্ষে ত কৈ ইহা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। প্রেমও ত একটা বিজ্ঞানের তত্ত্ব বটে। আমাদের কি সাংঘাতিক নীতিসংস্কার! এ নীতির মূলে কি কোন অপরিবর্ত্তনীয় সত্য আছে? ইহা ত বিশ্বজনীন নহে, আপেক্ষিক, দেশভেদে, কালভেদে ইহা রূপান্তরিত হয়। অমূলক ভয় ইহার প্রসূতী, বদ্ধমূল প্রাচীন কুসংস্কার ইহার রক্ষক প্রতিপালক। সভ্যজাতির অবলম্বিত স্ত্রীস্বাধীনতা যদি দোষবিমিশ্র হয়, তবে কি হিন্দুর অবরোধ প্রথা দোষযুক্ত নহে? এমন কোন্ নৈতিক নিয়ম আছে, পাত্রবিশেষে যাহার অপব্যবহার না হয়? তথাপি স্ত্রী পুরুষের সামাজিক সম্মিলন, পরস্পরের মধ্যে পবিত্র প্রেমালাপ, নির্দ্দোষ আমোদ ও বন্ধুতা যে একটী কল্যাণকর এবং স্বাস্থ্যকর সুখকর উপায় এবং জাতীয় উন্নতির পরম সহায় তাহা আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিব। এ বিষয়ে আমার কোন ভুল ভ্রান্তি নাই। অতএব এ কথা আমি সাহসের সহিত নির্ভয়ে বলিতে পারি!"

বাঞ্ছারাম শেষের কয়েকটা কথা খুব জোরে জোরে বলিলেন। গলার শব্দ এত বেশী হইয়াছিল, যে পাশের ঘর হইতে নিশানাথ তাহা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'ছোকরা পাগল হইল না কি?" বস্তুতঃ তিনি যেন বঙ্গদেশকে সম্মুখে রাখিয়া খুব উৎসাহের সহিত একা একা বক্তৃতা করিলেন। এইরূপ নির্জ্জনে বক্তৃতা করিয়া করিয়া কত কত হিন্দুযুবা শেষ ব্রাহ্মপাদরী হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতা রোগ বড় বিষম রোগ।

পণ্ডিত বাঞ্ছারাম অনেক রকমের শাস্ত্র তন্ত্র জানিতেন। উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার কোন স্বার্থ বা পক্ষপাত আছে কি না তাহাও বিচার

করিলেন, কিন্তু সে সব কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল হিন্দু জাতির বর্ত্তমান রীতিনীতির উপর একটু বিরক্ত হইলেন। কি করিবেন, মানুষ সামাজিক অবস্থার দাস, এই ভাবিয়া শেষ চুপ করিয়া রহিলেন।

বাঞ্ছারাম বহুদর্শী সুবিদ্বান্, এ স্থলে আমাদের কোন কথা বলা শোভা পায় না। কিন্তু একটা কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না। পণ্ডিতের জ্ঞান অপেক্ষা চরিত্র ভাল, মত বিশ্বাস অপেক্ষা প্রকৃতিটে বরাবর নির্দ্দোষ এবং বিশ্বাস্য।

অনন্তর তিনি শেষ এই স্থির করিলেন, "হিন্দুসমাজ যখন ইয়োরোপীয় সভ্যসমাজ নয়, তখন আমার প্রস্থানই একমাত্র শ্রেয়স্কর। অতএব রূপের ছায়া আমার কল্পনানেত্র হইতে দূর হইয়া যাউক! কেবল প্রেমের চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি, মধুর সৌন্দর্য্য আমার আত্মার পান আহার হউক! আমি এমনি করিয়া যোগে ডুবিব যে তাহাব মত্ততায় একবারে বিহ্বল হইয়া থাকিব। আমি সেই প্রেমধামে প্রেমময়ের প্রেমবক্ষে প্রেমময়ী সন্তোষিণীর প্রেমমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সঙ্গে নিত্য প্রেমবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া যোগানন্দে চিরকাল বিহার করিব।"

বহুল তর্ক যুক্তি বিচার আলোচনার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে বাঞ্ছারাম উপনীত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায় গ্রহণ।

বাঞ্ছারাম একাকী বসিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন, সন্তোষিণী নিকটে থাকিলে তাহা পারিতেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে কিরূপে প্রস্থান করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, "যদি দেখা করিয়া বিদায় লইয়া যাই, তাহা হইলে হয়তো আমার প্রতিজ্ঞাবন্ধন শিথিল হইবে, এবং আমি মায়াবদ্ধ হইয়া পড়িব।" আবার ভাবিলেন, "না, তাহাও ঠিক নহে।

এতই কি আমি ভীরু কাপুরুষ যে যাহা শ্রেয় বুঝিয়াছি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব না? গোপনে পলায়ন অপেক্ষা সম্মুখ সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হওয়া প্রার্থনীয়।”

শারদীয় সান্ধ্যগগনে অল্প অল্প শীতল বায়ু বহিতেছে, তৎসঙ্গে সদ্য-প্রস্ফুটিত শিফালিকার মৃদু সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। আকাশ অতি পরিষ্কার, যে কিঞ্চিৎ তরল মেঘ তাহাতে সঞ্চিত হইয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বে তাহা বারিরূপে বর্ষিত হইয়া ধরাকে সিক্ত করিয়াছে। তারাগুলি কৃষ্ণ-পক্ষীয় রজনীর ঘন অন্ধকার রাশির উপরে সুনীল আকাশপটে চিক মিক করিতেছে, ছায়াপথে শ্বেতাভ নক্ষত্রপুঞ্জ সুদূরবর্ত্তিনী শতদ্রু নদীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। গৃহপরিবেষ্টিত উদ্যানের বৃক্ষ লতা স..ল বৃষ্টির জলে গাত্র ধৌত করিয়া কৃষ্ণ বসন পরিধানপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছে; আর তদুপরি অগণ্য খদ্যোতিকা উড়িতেছে বসিতেছে নিবিতেছে জ্বলিতেছে। তরুশাখা প্রশাখা পুষ্প পত্র হইতে মধ্যে মধ্যে জলবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। সন্তো-ষিণীর অবস্থাও তদ্রূপ। তিনি গৃহছাদের উপর একাকিনী গভীর শোকা ভারাক্রান্ত চিত্তে নীরবে বসিয়া কাঁদিতেছেন, আর এক একবার তারকা-খচিত অনন্ত গগনাভিমুখে উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার মনের শান্তি যেন সেই উচ্চ আকাশের কোন অজ্ঞাত প্রদেশে গিয়া লুকাইয়া রহিয়াছে। এক দিন নির্ব্বাণ তত্ত্বের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে যে অপূর্ব্ব শান্তিরসের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাই স্মরণ করিয়া এখন তিনি সংসারসমুদ্রের চঞ্চল তরঙ্গরাশির মধ্যে আন্দোলিত হইতেছিলেন।

এমন সময় মৃদু পাদ বিক্ষেপে বিচ্ছেদাকুলিত মনে বাঞ্ছারাম তথায় উপনীত হইলেন। আজ আর সে প্রেম বিনিময়ের সুখের দিন নহে, আজ বিদায়ের দিন, মহা শোকের দিন। প্রথমে বাঞ্ছারামের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, কেবল চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্নি উদ্গমের ন্যায় তাঁহার ভাবরাশি তখন চক্ষু নাসিকা এবং মুখ দ্বার দিয়া যেন উথলিয়া পড়িতেছিল। শরীর কণ্টকিত, মস্তকের কেশ সকল উন্নতোমুখী, চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত। সন্তোষিণী সেই অশ্রুবিগলিত মুখারবিন্দ অব-

লোকন করিয়া আপনিও আঁখিনীরে ভাসিতে লাগিলেন। মহা শোকে আচ্ছন্ন এবং ব্যাকুল হইয়া উভয় উভয়ের স্কন্ধে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষণকাল নিঃশব্দে কাঁদিলেন, উভয়ের নয়নজলে উভয়ের গণ্ডস্থল গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ অভিসিক্ত হইল। অনন্তর শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে বাঞ্ছারাম গদ্‌গদ স্বরে বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "দেশ সন্তোষিণী, পৃথিবীতে আর সকল সামগ্রীই পাওয়া যায় কিন্তু অকৃত্রিম সরল মধুর ভালবাসা বড়ই দুষ্প্রাপ্য। ক্ষুধাতুরকে অন্ন, তৃষিতকে পানীয়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন এবং নিরাশ্রয় বিপন্ন জনকে আশ্রয় দিবার লোক এ পৃথিবীতে অনেক আছে; কিন্তু হৃদয়ের প্রেমপিপাসা কেহ চরিতার্থ করিতে পারে না। নিজের জন্যও আর তত দুঃখ করিত ইচ্ছা হয় না, তুমি অনাথিনী অবলা কুটুম্বগৃহবাসিনী, তোমার অবস্থা ভাবিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। তোমার সুখ শান্তিতে এখন আমার সুখ শান্তি। তোমার হাসিমুখ দেখিলে আমার মুখে হাসি বাহির হয়। হায় আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আদর যত্ন করিতে পারিলাম না! ইচ্ছা ছিল, সেবা করিয়া ভাল বাসিয়া তোমার বহুদিনের সঞ্চিত ভালবাসার ঋণ কিছু পরিশোধ করিব, তাহা কৈ হইল। কেনই বা তুমি আমায় ভালবাসিলে? যদি ভালবাসিলে তবে যেমন তাহা বহু বৎসর গোপনে ছিল সেই ভাবেই কেন রাখিলে না? যদি বা প্রকাশ করিলে তবে বিধাতা কেন আবার তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটাইলেন? সেই প্রেমিক চতুরচূড়ামণির বুঝি এইরূপই খেলা? তিনি চোরকে বলেন চুরি করিতে, আবার গৃহস্থকে বলেন সাবধান হইতে। অথবা আমাদিগকে নিবৃত্তি মার্গে লইয়া যাইবার জন্য ইহা শিক্ষা এবং পরীক্ষা। বেশ! বেশ! তাই হউক। তোমার ঐকান্তিক ভালবাসা যে দিন হইতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সেই হইতে আমার চিত্ত উন্মাদবৎ হইয়াছে, প্রেমের জলন্ত অগ্নিশিখা আমার হৃদয়ে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহা আর নিবিবে না। সেই আগুনে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইব, মরিয়া যাইব, তাহার পর যখন তোমার ঐ প্রেমবিন্দুর সাহায্যে অনন্ত প্রেমসিন্ধুতে গিয়া মিশিব তখন সকল

জ্বালা জুড়াইব; তখন নবজীবন পাইয়া নিত্যপ্রেমে তোমার সঙ্গে চিরবাস হইবে। তোমার মধুর ভালবাসা দেখিয়াইত আমি সেই প্রেমের সাগর অনন্ত গুণাকর রসিকচূড়ামণি ভগবান্‌কে চিনিতে পরিলাম। তিনি যে কি সুন্দর রসময় তাহা তোমার উপলক্ষে শিখিয়াছি। এবং তিনি আবার কেমন হিতৈষী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শাসনকর্ত্তা তাহাও এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। মানুষগুলকে লইয়া কেবল যেন খেলা করা! সৃষ্টি স্থিতি পালন কেবল কথা মাত্র, খেলাই উদ্দেশ্য। তা বেশ হয়েছে, তিনি যা করেন তাই ভাল। আমি কিছু বুঝি সুঝি না, তিনি জ্ঞানী, তিনি প্রেমিক, লীলারসময়, তিনি সব।

"কিন্তু এই যে তোমার প্রেম, যে প্রেমের স্বচ্ছ দর্পণে আমি সেই অনন্ত প্রেমময় পুরুষের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের আভাস পাইলাম ইহা কি অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক বিষয় নয়? অবশ্য ইহা নিরাকার আধ্যাত্মিক শক্তি। প্রকৃত পদার্থটী যদি হইল আধ্যাত্মিক, তবেত দেহ-বিচ্ছেদেও ইহ পরকালে আমরা ইহা সম্ভোগ করিতে পারিব।"

সন্তোষিণীর মুখে একটী কথাও বাহির হইল না। তাঁহার উষ্ণ প্রস্রবণের ন্যায় চক্ষু দুইটী হইতে নিরন্তর উত্তপ্ত বারিবিন্দু তখনও বাঞ্ছারামের পৃষ্ঠ বহিয়া পড়িতেছিল। অতঃপর সেই রোরুদ্যমানা বিরহকাতরা কামিনী স্কন্ধ হইতে মস্তক উঠাইয়া স্থির সজলনেত্রে এক দৃষ্টে বাঞ্ছারামের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এত ক্ষণ যে সকল মহা বৈরাগ্যের কথা শুনিলেন তাঁহাতে তাঁহার প্রেমসিন্ধু উছলিয়া উঠিতেছিল, এবং তাহার গূঢ় অর্থ তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকার ন্যায় মর্ম্মস্থানকে বিদ্ধ করিতেছিল। শেষ যখন শুনি-লেন প্রেম আধ্যাত্মিক, দেহের অদর্শনেও তাহা ভোগ করা যায়, তখন বিচ্ছেদের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

বাঞ্ছারাম পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "যদি আমরা পতি পত্নীর সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া দুই জনে গৃহাশ্রমে থাকিতাম, তাহা হইলেও নির্ব্বিঘ্নে এই প্রেমব্রত সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। কারণ, তাহাতেও অনেক বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতায় নিতান্ত প্রার্থনীয় বস্তুও পুরাতন নীরস হইয়া যায়। প্রেম প্রেমকে বিবাহ করিয়া

মিত্যয়োগে সুখী হয়, সে পথের প্রতিবন্ধক কেহই হইতে পারে না। দেহবিমুক্ত যুগল আত্মা নিষ্কাম ভাবে পরস্পরের প্রীতি সম্ভোগ করিবে, দেশ কালের ব্যবধানে ইহার কোন ক্ষতি নাই। সকাম প্রীতি অপেক্ষা এই নিষ্কাম প্রীতিই বাঞ্ছনীয়।”

এই সকল সারগর্ভ বচন শ্রবণ করত বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সন্তোষিণী বলিলেন, “বিবাহিত জীবনে প্রেম সাধনে যে বহু বিঘ্ন আছে বলিলে তাহার অর্থ কি? এরূপ কথাত কখন শুনি নাই।”

বাঞ্ছারাম হাসিয়া বলিলেন, “বিবাহ অবিবাহের কথা নয়; বিবাহও জানিবে অধিকাংশ স্থলে স্বেচ্ছাচারের অন্য একটী নাম। সমাজের সাহায্যে বৈধভাবে যথেচ্ছাচার সচরাচর বিবাহের উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক প্রেম সাধনজন্য পার্থিব সংশ্রব ত্যাগ করিয়া এ পথে যিনি চলিতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ। কিন্তু সে পথে কে যাইতে চায়? বৃদ্ধ বয়সে কি নিদান কালে কারো কারো সে ভাব হয় এই মাত্র। কোন প্রকার পার্থিব সুখ বাসনা থাকিলে আধ্যাত্মিকতার ব্যাঘাত জন্মে এবং তাহাতে কালে মোহ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। অথচ বাহ্যাবলম্বন ভিন্ন কিন্তু অধ্যাত্ম বিষয়ের ধারণা হয় না, ভাবরস জন্মে না, নির্গুণে প্রেম শুকাইয়া যায়; সুতরাং স্থূলের সাহায্য ব্যতীত সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। কেবল জ্ঞান ও ভাব উদ্দীপন, আধ্যাত্মিক প্রেমচ্ছবির প্রকাশ জন্য প্রথমে স্থূল স্পর্শনীয় বাহ্য পদার্থের আবশ্যক, পরে যথা সময়ে তাহা হইতে উপকারিতা লইয়া অন্তর্মুখে যে গমন করিতে পারিল সেই বাঁচিয়া গেল। চিন্ময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশে লোকে বাহ্য উপকরণ, বিধি নিয়ম গুরু আচার্য্য সাকার মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি সেই দৃশ্যমান স্থূল জড়ে জড়িভূত হইয়া পরে চৈতন্যের রাজ্যে আর অগ্রসর হইতে পারে না। প্রেমসাধনও ঠিক তাহাই ঘটে। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষ মিলিত হয় প্রেম মহাভাব উপার্জ্জনের জন্য, কিন্তু শেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্থি মাংসের রাজ্যে আত্মহারা হইয়া তাহারা মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়। এই জন্য বলিতেছিলাম, এ পথে অনেক বিঘ্ন আছে। আচ্ছা বল দেখি, প্রেম বড় কি রূপ বড়?”

সন্তোষিণী। প্রেমই বড়। প্রেমেতেই রূপের প্রতি এত আকর্ষণ উপস্থিত করে। প্রেমের গুণে কুরূপও সুন্দর দেখায়। তবে একটা কথা এই, রূপতৃষ্ণা নিবারিত না হইলে সাধারণতঃ প্রেমে রুচি জন্মে না।

বাঞ্ছা। আমি কিন্তু তোমার সেই প্রেমকেই সর্ব্বাপেক্ষা লোভের সামগ্রী মনে করি। দেহের উপলক্ষে সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হয় এই জন্য তোমার দেহও আমার বড় শ্রদ্ধা এবং আদরের সামগ্রী। ইহা যদি শ্রীহীন রুগ্ন ভগ্ন ব্যাধিযুক্ত হয়, তাহা হইলে আরো স্নেহ যত্নের সামগ্রী হইবে।

এ কথা বাঞ্ছারামের কত দূর সত্য তাহার প্রমাণ প্রয়োজন। প্রেমমোহে মোহিত এবং আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়াও মানুষ এরূপ উচ্চ নিস্বার্থ ভাব অনেক সময় ব্যক্ত করিয়া থাকে।

সন্তো। আমি প্রেম এবং রূপ উভয়ই ভালবাসি। আত্মাও চাই, শরীরও চাই। সাকার নিরাকার দুইয়েরই প্রয়োজন। শুধু নিরাকার মনে হইলে প্রাণ যেন হাঁপ হাঁপ করে। আমরা মেয়ে মানুষ, অত সূক্ষ্ম জ্ঞান ধরিতে পারি না।

বাঞ্ছা। আমিও কি তাহা অস্বীকার করিতে পারি? ঠিক কথাইত তুমি বলিতেছ। আগে স্থূল তার পর সূক্ষ্ম, আগে শরীর পরে আত্মা। দেহ ব্যতীত প্রেম নির্গুণ হইয়া পড়ে, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। মাতৃস্তন, তাঁহার সুমিষ্ট স্নেহকোল, সুখস্পর্শ বাহুযুগল, মধুমাখা সাদর বচন, প্রেমালিঙ্গন চুম্বন যদি না থাকিত, তাহা হইলে মাতৃত্ব কি কেহ বুঝিতে পারিত? না মাতৃভক্তি জন্মিত? মানবদেহ জড় অসার, কিন্তু সামান্য সামগ্রী নহে, দেবতার মন্দির, হরির লীলাধাম।

সন্তোষিণীর এ কথায় মুখে হাসি বাহির হইল। কিন্তু সে হাসি মেঘাবৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় মলিনতামিশ্র অনুজ্জ্বল।

বাঞ্ছারাম বলিলেন, "আমরা যাহা চাই তাহা পাইয়াছি, কারণ, আমি তোমার হইয়া গিয়াছি, তুমিও আমার হইয়া গিয়াছ, তবে আর বাকী কি আছে? আমি তৃপ্তকাম হইয়াছি, যেহেতু তুমি আমার আত্মস্থ। তুমিও এইরূপে তৃপ্তকাম হও, যে দেশে বিচ্ছেদ নাই সেই যোগের রাজ্যে রসিয়া চিরপ্রেম সম্ভোগ কর। এ প্রাণের গূঢ় যোগ মরিলেও যাবে না,

বিচ্ছেদেও ভাঙ্গিবে না। যেখানে থাকি উভয়ে একাত্মা এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া সুখে বিচরণ করিব। দেশ কাল আমাদিগকে ব্যবধান করিয়া রাখিতে পারিবে না। যেখানে ভয় বিকার শোক দুঃখ জরা মরণ হাসি কান্না সেখানে আর থাকিব না, চির আনন্দের অমর ধামে অনন্ত প্রেমময়ের বক্ষে বাস করিব। কেমন, ইহা কি আহ্লাদের সমাচার নয়?"

সন্তোষিণীর মুখ প্রফুল্ল হইল, একটু সাহস ভরসা আশা উৎসাহের জ্যোতি জলসিক্ত নয়নযুগলে দীপ্তি পাইল। তাহা দেখিয়া বাঞ্ছারাম আবার বলিলেন, "সেই পরম পিতা পরম মাতা পরম বন্ধু প্রাণসখাই আমাদের চিরপ্রেমমিলনের ভূমি। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া আমরা ঐহিক সম্বন্ধ হইতে একবারে চিরবিদায় লইব।"

"বিদায়" শব্দ শুনিবামাত্র সহসা সন্তোষিণীর সেই সহাস্য চন্দ্রানন বিষাদের ঘন মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল। মুখ যেন কালী বর্ণ হইয়া গেল। হস্ত পদের বল শিথিল হইল। অবশেষে ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। যেন মৃতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন।

যখন এইরূপ দশা ঘটিল তখন বাঞ্ছারাম কি করিলেন? তিনি স্বীয় ইচ্ছাশক্তিকে সংযত, ঘনীভূত করিলেন, এবং সেই ইচ্ছাময় পরমপুরুষের জ্বলন্ত প্রভাব ধারণ করত একাগ্র চিত্তে সন্তোষিণীর ঈষদোন্মীলিত চক্ষের দিকে চাহিয়া তাঁহার মস্তক এবং পৃষ্ঠে হস্তামর্শন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহাশক্তির আশ্রিত তাঁহার সেই ইচ্ছাশক্তির অলৌকিক তেজে সন্তোষিণীর দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, এবং তিনি তাঁহার চক্ষের উপর চক্ষু স্থাপন করিয়া শেষ উন্মাদবৎ হাস্য করিলেন। মেঘাচ্ছন্ন গগনের নিবিড় অন্ধকার প্রদেশে যেমন বিদ্যুতালোকের ছটা প্রকাশ পায় তদ্রূপ সেই হাসির উজ্জ্বল ছটা। সন্তোষিণী বাঞ্ছারামের পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক প্রেমতত্ত্বের মর্ম্ম তখন বুঝিতে পারিলেন, এবং বুঝিয়া হাসিতে লাগিলেন। নিদ্রাবস্থায় কোন দেবদূত আসিয়া যেন কাণে কাণে সে সকল মহাবাক্যের গভীর অর্থ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া গেল। বলিলেন, "তবে কি আমার সকল আশায় ছাই পড়িল! চঞ্চল চপলার জ্যোতি অনন্ত আঁধারে ডুবিয়া গেল। তৃষিত প্রাণ শীতল জলাশয়ে জল পান করিতে

গিয়া শেষ সুদূরব্যাপী ঘোর দাবানলে পরিবেষ্টিত এবং দগ্ধ বিদগ্ধ হইল। মহাবেগে ছুটিতেছিল যে হৃদয়ের নদী তাহাকে কে যেন ভীমবলে ঠেলিয়া উৎসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিল। সুকোমল প্রেমকুসুমকলিকা বসন্তের সুবিমল সমীরণ হিল্লোলে, তরুণ তপনের স্নিগ্ধ উত্তাপে ফুটিয়া উঠিতেছিল এমন সময় অদৃষ্টচক্রের নিদারুণ প্রহারে তাহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। এটা সুখ, না দুঃখ? অথবা দুঃখেতেই সুখ? ঠাকুর কত লীলাই দেখাইলেন! দুঃখ অন্ধকারের ভিতর তাঁর লীলা দেখিতে বড় মন্দ নয়। আমি এবার দুঃখে সুখী হইব, আঁধারে আলোক দেখিব, ঘোর বিপদের মধ্যে শান্তি সম্ভোগ করিব, অনন্ত তরঙ্গের ভীষণ আন্দোলনে পড়িয়া, ভয় নিরাশ বিরহ সন্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া অনন্ত নির্ব্বাণে মিশিয়া যাইব। মন, আর তুমি অধীর হইও না। দুঃখাশ্রুর নির্ম্মল দর্পণে লীলা-ময়ের নবলীলা দর্শন কর। এমন সুন্দর রূপ আর অন্য সময় দেখিতে পাইবে না। পরীক্ষার দুর্জ্জয় আঘাতে হৃদয় ভগ্ন চূর্ণ করিয়া ঠাকুর কেমন হাসিতেছেন! আহা! তবে আমিও হাসি, হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলি। ঠাকুর, মানবজীবনে যন্ত্রণাও অনেক। কিন্তু যন্ত্রণার ভিতরে আবার তোমার অপরূপ লীলাও অনেক দেখিতে পাই।

"সন্তোষিণি, তুমি বড় অভাগিনী। এখনো কি তোমার এ সংসারে সুখ-ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে? এখন অন্ধকারে বসিয়া নিরাকার ভোজন কর, শূন্যে উড়িয়া বেড়াও। এই জন্যই বুঝি প্রভু আমাকে এত কাল মায়াচক্রে আঁধারের মধ্যে ঘুরাইয়াছিলেন? ভালবাসি কেন তাও তিনি বুঝিতে দেন নাই। তিনিই সত্য, আর তাঁর প্রেমই সত্য আর যাহা কিছু সব ফাঁকি, যাদুকরের ভোজবাজী। যা হউক, বেশ হইল, বাঁচা গেল। যাঁর ধন তাঁর কাছে ফিরে গেল। আমরাও চল এখন সেইখানে গিয়া ঠাণ্ডা হই, প্রাণ শীতল করি। এই লও ঠাকুর, তোমার ধন তুমি লও, লইয়া যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

এই কথা বলিয়া দুই জনে মন খুলিয়া খুব একবার হাসিলেন। দুঃখ বিপদে পড়িয়া এক প্রকার নূতন বিধ আমোদ অনুভব করিলেন।

ভালবাসার লোকের সহিত দুঃখ ভোগেও অনেক সুখ আছে। তখন মহা-বৈরাগ্যের আনন্দে চিত্ত সবল হইল, হৃদয় শান্তি লাভ করিল, অসার অনিত্য সুখলালসা মন হইতে চলিয়া গেল। এখন আর মনে লোভ নাই, সুতরাং ক্ষোভও নাই; আশা পিপাসা নাই, ভয়ও নাই। অন্তর্বিকার যখন চলিয়া যায়, মন যখন নিস্পৃহ নিরাকাঙ্ক্ষ হয়, তখন মনুষ্য সুখ দুঃখের অতীত পরম শান্তি সম্ভোগ করিতে থাকে। এই শান্তিই প্রাচীন আর্য্য-যোগীদিগের স্পৃহনীয় ছিল। সন্তোষিণী অন্ত দিনে গরলের ভিতর অমৃ-তের আস্বাদন পাইলেন এবং মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করিয়া অমৃতের পথে পদার্পণ করিলেন।

এইরূপে যখন তাঁহার প্রেমবিকসিত বদনে মধুর হাস্যসুধা ঝরিতে লাগিল এবং দিব্যজ্ঞান প্রভাবে যখন তিনি বীরনারীর ন্যায় ঐ সকল উচ্চ বৈরাগ্যের সুমিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন, তখন আবার বাঞ্ছারামের হৃদয়ে শোকসিন্ধু মহাবেগে উথলিয়া উঠিল। এমন জীবনসঙ্গিনীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি অতিশয় কাঁদিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রিয়সখীর হাত দুই খানি নিজবক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক ব্যাকুল চিত্তে বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেখ, আমি আমার হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সকল কথাই তোমাকে বলিয়াছি। এখন আমার এই অনুরোধ, যে তুমি আমার সহায় হইয়া মা আনন্দময়ী বিশ্বপ্রসবিনীর পদতলে আমাকে পৌঁছিয়া দিবে। তুমি সেই অখিলমাতার প্রতিবিম্বস্বরূপা, তাঁহার প্রকৃ-তির মাধুর্য্য রসের কণিকা তোমার হৃদয়ে আছে। তুমি স্নেহের প্রতিমা, প্রেমের পথদর্শক। তুমি আমার উপরে সেই স্বর্গীয় শক্তি সংক্রামিত করি-য়াছ। আমি বাস্তবিক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, চলিবার আর শক্তি নাই। তোমার সঙ্গে মিশিয়া অন্তে যেন আমি সেই প্রেমসমুদ্রে গিয়া পড়িতে পারি। আমিও এ জীবন তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম।"

সন্তোষিণী তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন, বাঞ্ছারামকে সুমিষ্ট বচনে আশা-বাক্য প্রদান করিলেন, উচ্চ বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের কথা বলিলেন, সাহস ভরসা দিলেন, যথার্থ ধর্ম্মবন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বনপ্রস্থান।

যখন এক স্থানে থাকিয়াও তাঁহারা দুই জন যোগরাজ্যে অতীন্দ্রিয় জগতে বাস করিতে লাগিলেন তখন উভয়ের প্রাণ পূর্ণ হইল। ভালবাসার সামগ্রী যত ক্ষণ বাহিরে অবস্থিতি করে তত ক্ষণ তাহার আংশিক সম্ভোগ হয়, তদনন্তর আত্মস্থ এবং প্রাণস্থ হইলে আর বিচ্ছেদের ভয় থাকে না, তখন উভয়ে তন্ময়ত্ব লাভ করে। এই যোগের অবস্থায় দুই জনে যখন অবতরণ করিলেন, তখন আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, একাধারে প্রকৃতি পুরুষের মিলন হইল।

মৃত্যুকালে যেমন লোকে সংসার ছাড়িয়া যায়, সেই ভাবে আত্মীয় বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বন্ধন কাটিয়া একাকী উদাসীন বেশে বাঞ্ছারাম বদরিকাশ্রমের অভিমুখে চলিলেন। মনে কোন বিষয়ের জন্য আর এখন আশা নাই, অপেক্ষা নাই; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া চলিলেন। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সুমিষ্ট সুখকর বোধ হইতে লাগিল। গ্রাম নগর, পুর জনপদ, পথ প্রান্তর, নদী সরোবর, কানন ভূধর, জড় উদ্ভিজ, পশু পক্ষী আকাশ অন্তরীক্ষ মানব মানবী যেখানে যাহা কিছু দেখিলেন তাহাতেই হৃদয়ের ভাব উথলিয়া উঠিল। একমাত্র এখন সঙ্কল্প যে, একটী নিরাপদ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কিছু কাল যোগসাধন করিবেন। যে নিগূঢ় প্রেমতত্ত্বের মধুর রসে হৃদয় উদ্বেলিত হইল তাহাতে সিদ্ধকাম হইবেন এই বাসনা।

পথে ট্রেনে যে গাড়ীতে যাইতেছিলেন সেই গাড়ীতে একটী দেশহিতৈষী ভিখারী বাবু ছিলেন। তাঁহার গায়ে আলপাখার চোগা, নাকে আইগ্লাস, মাথায় পিরাণীপাগড়ী, বুকে ঘড়ির চেন, মুখে চুরট এবং চাঁপদাড়ি; চেহারা খানি বেশ রকমসই। হাতে এক খানি কেতাব। মার্জ্জার যেমন মুষিকের প্রতি লক্ষ্য করে, আড় চখে আড় চখে চাহিয়া তেমনি তিনি

দেখিলেন একটী গম্ভীর মূর্ত্তি ভদ্র যুবা স্থির ভাবে অনন্য মনে গাড়ীর এক কোণে বসিয়া আছে। তাঁর নিকট উঠিয়া আসিয়া "হ্যালো। মিষ্টার বনার্জ্জী, হাউ ডু ইউ ডু?" এই বলিয়া হাত ধরিয়া সজোরে এক সেকহ্যাণ্ড। বাঞ্ছারাম ফেল ফেল করিয়া মুখ পানে চাহিয়া অতি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়ের নামটী কি?" "ও মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না? সেই যে।" সুর নামাইয়া আস্তে আস্তে "চোরবাগানে আমার বাড়ী, আমার নাম অলীকচন্দ্র দাস ঘোষ, হাইকোর্টের জজ অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্র আমার ভগ্নীপতি হইতেন। আমি আন্দুলের রাজবাড়ীর দৌহিত্র সন্তান। আপনার বাড়ী, আপনার মাতুলালয় এ সমস্তই আমার জানা আছে। বসন্তপুরের খেলাত মল্লিক, যিনি ম্যাকেনাল মেকেঞ্জির বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি, তিনি আমার মামাশ্বশুর। অনেক বার আপনাদের গ্রামে গিয়াছি। সেখানকার জমিদার বরদাপ্রসন্ন বাবু আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তিনি আমার ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য কিছু কিছু চাঁদাও দেন। (হাস্যমুখে) আপনার সঙ্গে এক পার্টিতে কত বার যে আমি আমোদ করিছি! হায় হায়! সব ভুলে গেছ ভাই।"

বাঞ্ছারাম অবাক্। একটু পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?"

অলীক বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হুঁঃ বিষয়কর্ম্ম। বিষয়কর্ম্ম আর কি, জনসেবা। ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াই। পৃথিবীর হিতে সমস্ত জীবন অর্পণ করা হইয়াছে। আপনার স্ত্রী পুত্রের সেবা ত শেয়াল কুকুরেও করিয়া থাকে গা! স্ত্রী ব্যাটি কাণের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে কেঁদে মরে, কত কি বকে, কিন্তু আমি বাড়ী গেলে ত! পথে পথে বিদেশেই কাটাইয়া দিই। পরহিতে যদি প্রাণ না দিলাম তবে আর বাঁচায় সুখ কি? হায় স্বার্থপর বাঙ্গালী জাতি, কত দিনে এরা স্বদেশহিতৈষী হইবে! মহাশয় অনেক সৎকার্য্য করিয়া থাকেন আমি শুনিয়াছি, কাগজেও আপনার নাম আমি দেখিয়াছি। আপনার মত বিদ্বান্ সুপণ্ডিত পরোপকারী ব্যক্তিকে দেখিলেও পুণ্য আছে। আপনি কি আমার কটন্ শিল্প বিদ্যালয়ের কথা শুনেন নাই? সম্প্রতি এই নামে একটী ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল্ স্কুল

খোলা হইয়াছে। শুনেছেন বৈকি, আমি যে আপনার নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া আনিয়াছি। (সর্ব্বৈব মিথ্যা) আপনার মাতুল বিধবা-বিবাহের এক জন উৎসাহদাতা বন্ধু আমি সকলই অবগত আছি।"

অলীক বাবুর অধিকাংশ কথাই অলীক, কিন্তু তাহা এমনি লোকরঞ্জক, শ্রুতিমধুর, আত্মগরিমা-প্রতিপোষক যে, সহজেই তাহাতে রাজা জমিদার ধনী তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তিরা টাকা বাহির করিয়া দেয়। বাবুর হস্তস্থিত পুস্তক খানি আর কিছুই নয়, তাহাতে চাঁদাদাতৃগণের নাম লিপিবদ্ধ আছে, এবং তাঁহার কৃত কীর্ত্তিকলাপের উদ্দেশ্য বিষয়ক মুদ্রিত অনুষ্ঠান পত্র আছে। আর ঐ সম্বন্ধে যখন যাঁহার নামে ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রশংসা সুখ্যাতি ঘোষিত হইয়াছিল তাহা সংগৃহীত আছে। উহা দেখাইয়া নামলুব্ধ নির্ব্বোধ ধনীর নিকট চাঁদা আদায় করা হয়। চাঁদাদাতৃগণের নামের মধ্যে অনেকেই টাকা দেয় নাই, দিবে যে তাহার কোন কথাও হয় নাই, তথাপি নাম আছে। তাহা দেখিলে অন্যে টাকা দিবে। ভিখারী বাবুর নিজগৃহজাত দুই পাঁচটী কন্যা যাহা ছিল তাহাদিগকে লইয়া এক্ষণে স্কুলটী চলে। পারিতোষিক বিতরণের সময় তিনি বৎসরান্তর পাড়ার ছোট ছোট বালিকাদিগকে খেলনা পুতুল ও মেঠাই সন্দেসের লোভ দেখাইয়া একত্র যড় করেন। এ সকল ফাঁকির ব্যাপার স্কুল ইনেস্পেক্টর বাবু একবার ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই হইতে গবর্ণমেন্টের সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। প্রতারণার জন্য শ্রীঘরে যাওয়ারও আয়োজন হইয়াছিল, ইনেস্পেক্টর বাবু কোন রকমে বাঁচাইয়া দেন। তাহার পর হইতে সাধারণ চাঁদার দ্বারা বাবুর স্কুল চলে, অর্থাৎ তাঁহার সংসার চলে। নিজের সম্বন্ধী স্কুলের শিক্ষক আর কন্যাগণ ছাত্রী।

কটন শিল্পবিদ্যালয়টীও বেশ নূতন প্রণালীর। ভিখারী বাবুর পৈতৃক বাসভবনের সংলগ্ন কতকগুলি ছোট ছোট ঘর ছিল, তাহাতে ভাড়াটীয়া কলু, ময়রা, তাঁতি, ছুতার, কুমার, কামার, চামার, স্বর্ণকার, ধোপা, নাপিত, দপ্তরী ইত্যাদি ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা বাস করিত। ধোপার ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য অলীক বাবু বিশেষ যত্নশীল। ধোপারা বড় দেমাকে, তাহা-দের একচেটে ব্যবসায় যাহাতে উঠিয়া যায় তাহার জন্য তিনি বিশেষ

উৎসাহী। ইহারই নাম "কটনশিল্পবিদ্যালয়" ইংরাজেরা ইহাঁকে বেগিং বাবু বলিয়া ডাকিত, তাই আমরা ভিখারী বাবু শব্দে অনুবাদিত করিয়াছি।

বাবু টিকিট কিনিয়াছেন তৃতীয় শ্রেণীর, শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত, কিন্তু চাপিয়াছেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, কথায় কথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত। বাঞ্ছারামকে ভাল মানুষ পাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি বড় ভুল করিয়াছি, আপনার সঙ্গে কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, অতিরিক্ত মাসুল গুটিপাঁচেক টাকা আমার চাই। এখন আমাকে ধার দিন, পরে শোধ করিব" টাকা পাঁচটী লইলেন, অতিরিক্ত ভাড়া আর দিলেন না, সেই টাকায় আসানশোল পর্য্যন্ত আর একখান টিকিট লইয়া কেল্‌নারের হটেলে টিফিন খাইয়া বাঞ্ছারামের স্কন্ধে গিয়া পুনরায় ভর করিলেন, এবং বলিলেন, যে "শেয়ারশোলের রাজবাড়ীতে একবার যাইতে হইবে। চলুন ভালই হইল, আজ আমার বড় শুভ দিন যে মহাশয়ের সঙ্গ পাইলাম, এক সঙ্গে কতক দূর যাওয়া যাক।" যাইতে যাইতে পথে রাত্রি হইয়া গেল, বাঞ্ছারামের একটু তন্দ্রা আসিল, সেই অবসরে বেগিং বাবু বাঞ্ছারামের কৃত উপকারের বিনিময়ে তাঁহার পোর্টম্যাণ্টটি লইয়া একটা ষ্টেসনে আস্তে আস্তে নামিয়া পড়িলেন। বাঞ্ছারাম জাগিয়া দেখেন সে বাবুও নাই, তাঁহার পোর্টম্যাণ্টও নাই। ইহা দেখিয়া তাঁহার হাসি পাইল। ভাবিলেন, পৃথিবী কি আশ্চর্য্য লীলার স্থান। লোক গুল যেন নানা সাজে সাজিয়া যাত্রা অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে। দেশহিতৈষণাও জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হইল। লোকটা কি চতুর। কি বাচাল। এরূপ ভদ্রবেশধারী দেশহিতৈষী বাবু চোরত কখন দেখি নাই! যাক্ বেশ হইয়াছে, ভার কমিয়া গেল, নিশ্চিন্ত হইলাম।"

তদনন্তর পরিধেয় এবং উত্তরীয় বসন রামরজের মাটীতে রঙ্গাইয়া দাড়ি গোঁফ নখ চুল রাখিয়া সন্ন্যাস বেশে গম্যস্থানাভিমুখে তিনি যাত্রা করিলেন। সহজেই তিনি নির্ম্মম সংসারত্যাগী তাহার উপর বেগিং বাবুর এই দৌরাত্ম্য, ইহাতে বাঞ্ছারামের চিত্ত আরও উদাস হইয়া গেল। মায়াবদ্ধ জীবের দুর্গতি দর্শনে তিনি একটু আমোদও অনুভব করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদ যন্ত্রণা।

মানুষ যতই কেন জ্ঞানী চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শী হউক না, দেহ থাকিতে দেহের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া কেবল নিরাকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস কয় জনের আছে যে, তাহারা নিরাকার চিন্ময় অতীন্দ্রিয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ আত্মীয় ব্যক্তির ন্যায় স্পষ্ট অনুভব করিতে সক্ষম হইবে? বিশেষ স্ত্রী জাতি; ইহারা যোগ ধ্যান তত্ত্বচিন্তার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। নিরাকার ভজিতে গিয়া কত কত জ্ঞানী পুরুষও শেষ জড়বাদী নরোপাসক হইয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইতেছে।

সন্তোষিণীর সেরূপ প্রেমোন্মত্ততা উচ্চ বৈরাগ্য অধিক ক্ষণ রহিল না, তাহা থাকিবার নয়। আশার সামগ্রী নিকটে উপস্থিত থাকিলে পিপাসা বেশী থাকে না, কারণ মন তখন জানে যে সে যাহা চায় তাহা পাইয়াছে, প্রাণ ঠাণ্ডা আছে, সে অবস্থায় অনেকেই কল্যাকার জন্য না ভাবিয়া মর্কট বৈরাগী হইতে পারে।

সন্তোষিণী প্রিয়তমকে বিদায় দিয়া এক্ষণে চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, বিষাদের ঘন অন্ধকারে তাঁহার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, প্রাণ হু হু করিতে লাগিল, হৃদয় খালি হইয়া গেল। বাঞ্ছারামের স্বর্গীয় চরিত্র প্রভাবে এবং তদীয় তত্ত্বোপদেশের গুণে চিত্তে যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল, এখন তাহা রক্ষা করিবে কে? ভবিষ্যৎ জীবনের করাল মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "আমি যোগী বৈরাগীর ন্যায় কেবল আত্মতত্ত্ব লইয়া নিরাকার ভাবিয়া কি সুস্থির থাকিতে পারি? বাহ্য সাহায্যে আন্তরিক জ্ঞানযোগ সাধনের কথা যে তিনি বলিয়াছিলেন তাহা মানি, কিন্তু তাহা কি দুই চারি বৎসরে সিদ্ধ হয়? পেটের ছেলেকে মা যদি স্তন্যদুগ্ধ না দেয়, কোলে পিঠে না করে, সে ছেলে মা বলে না, কাছেও আসে না, সে মাও ছেলেকে স্নেহ মমতা করে না।

পিতার প্রেমালিঙ্গন বাৎসল্য না পাইলে পুত্র কি পিতৃভক্তি লাভ করিতে পারে? মাতৃ পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রণয় যেমন, প্রেমও আধ্যাত্মিকভাবে পরিণত হইবার পূর্ব্বে তেমনি দেখা শুনা সেবা শুশ্রূষার উপর নির্ভর করে। এ সকলের সাহায্য কি আমি যথা পরিমাণে পাইয়াছি? হায়। আমি তাঁর কাছে বসিয়া, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া ভুলিয়া থাকিতাম, এখন আমাকে কে ভুলাইয়া রাখিবে? চক্ষু কর্ণের লালসা যে এখনো আমার চরিতার্থ হয় নাই। ইচ্ছা হইতেছে পাখীর মত উড়িয়া তাঁহার কাছে যাই, গিয়া একবার দেখিয়া আসি, দুইটী কথা শুনিয়া এবং বলিয়া আসি। ভাবনা চিন্তা দুঃখ সন্তাপে যদি মৃতপ্রায় হই, তবে এ কঠোর সাধনই বা করিবে কে? সাধন করিতে হইলে যে একটু উৎসাহ অধ্যবসায় চাই, কৈ আমিত সে টুকুও দেখিতে পাই না! যদি শুকাইয়া মরিয়া গেলাম তবেত সবই ব্যর্থ হইল। কঠোর ব্রত অবলম্বন দ্বারা উপবাসাদিতে শরীরকে ক্লেশ দিতে পারি, সুখ বিলাস ত্যাগ, কদন্ন ভোজন, ভূমিশয্যায় শয়ন, সামান্য অশন বসনে জীবন ধারণও অসাধ্য নহে; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ে যদি শান্তি আরাম না পাই, তবে যে কেবল কষ্ট বহনই সার হইবে। প্রাণ যে আমার বড় খালি খালি বোধ হয়। হৃদয়পিঞ্জর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, জীবনবিহঙ্গ আমার কোথায় কোন্ দেশে উড়িয়া গেল। হায়। সকলই আছে, কেবল এক জন নাই।

"আহা! কি মিষ্ট কথা গুলিই বলিয়া গেলেন। কথা গুলি ভাল, কিন্তু মুখ খানি কৈ? সে সুন্দর মধুর অধর, সে সুধাময় কণ্ঠধ্বনি কৈ? সে দিব্যকান্তি শান্তিপূর্ণ আনন্দ মূর্ত্তিটী কৈ? কৈ সে প্রশান্ত উজ্জ্বল নয়ন দুটী কোথা গেল? যে পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া আমি পুণ্য সঞ্চয় করিতাম সে পদদ্বয়ই বা কোথা রহিল? পড়িবার ঘর, উদ্যান, ছাদ সকলই শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। আহা! সে নির্দ্দোষ শিশুতুল্য বদন কমলের হাসি আর এ তৃষিত চক্ষু কি দেখিতে পাইবে না! দেহ অনিত্য তাহাত বুঝিলাম, কিন্তু প্রাণ তাহা মানিল কৈ? শরীর নাই অথচ মানুষ আছে, এটা কিছুতেই ধরিতে পারিতেছি না। কিন্তু যিনি আমাকে ভাল বাসিতেন তিনিত শরীর নহেন আত্মা, তবে আত্মা দ্বারা তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া

শরীর দ্বারা কেন আমি শরীর খুঁজিয়া বেড়াই? হায় আমি কাঁদিবই বা কার কাছে? কে আমার চক্ষের জল মুছাইবে? ভগ্নী ভ্রাতার বিরহে, পুত্র পিতা মাতার বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিলে সকলে আহা বলে, কিন্তু আমি জীবনসর্ব্বস্বকে হারাইয়া কাঁদিতেছি, তথাপি আমার প্রতি কাহারোত দয়া হইবে না!

"বিদায় কালে তাঁহার কাছে গিয়া হায় আর একবার প্রাণ ভরিয়া কেন কাঁদিলাম না। অন্ধকারে অন্ধকারে অদৃশ্যভাবে ক্রমে তিনি অন্তর্হিত হইলেন, শেষ কেবল গুটি কতক বাক্য মাত্র কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। যদি দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া অন্তরালে বসিয়া কেবল কথা শুনাইতেন তাহাতেও আমার প্রাণ প্রবোধ মানিত। বাহিরের ক্রিয়া সমস্ত বন্ধ হইলে আন্তরিক প্রণয় প্রমাণ অভাবে যে শুকাইয়া যাইবে। কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর। বড় কঠিন কথা।" কঠিন বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন যে প্রেম তাহা বণিক্‌বৃত্তি। বিশ্বাসই প্রেমের জীবন। সন্তোষিণী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আহা কোথায় গেলেন, কি করিতেছেন, কিছুই জানিবার উপায় নাই। পত্রাপত্র লিখিবার যদি নিয়ম করিয়া দিতেন, তাহা হইলেও মনকে কতকটা সান্ত্বনা দিতে পারিতাম। সকল পথই যে বন্ধ। যেন বন্দীর ন্যায় কারাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। যখন আমি মনে মনে গোপনে তাঁহাকে ভাল বাসিতাম, সে অবস্থা যে আমার ইহা অপেক্ষা ছিল ভাল!

"আহা প্রিয়তমের কি বিনম্র অমায়িক ভাব! কি দয়া মায়া। আমি সামান্যা অনাথা অশিক্ষিতা দুঃখিনী নারী, আমার প্রতি তাঁর কত মর্য্যাদা সম্ভ্রমই না প্রকাশ পাইত! আমার পার্থিব জীবন ভেদ করিয়া অমরত্বের শোভা দেখিতেন, তাই দেখিয়া এত সম্মান করিতেন, ভাল বাসিতেন। আমি কত সময় চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে কোন দিন অসারতা বা চাপল্যের চিহ্ন দেখি নাই। বিদায় কালের সে মূর্ত্তি, এবং খেদোক্তি স্মরণ করিতেও আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। কাড়িয়া লইবার জন্যই কি বিধাতা তাঁহাকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন? তাঁহার কোলে সে বার সেই সাংঘাতিক রোগে কেন আমার মরণ হইল না?"

এইরূপ খেদ ও বিলাপ করিতে করিতে বিরহকাতরা সন্তোষিণী শ্রান্ত

হইয়া পড়িলেন। এমন এক জনও ব্যথার ব্যথী দুঃখার্দ্ধভাগিনী সুখবর্দ্ধনকারিণী নাই যাহার নিকট মনের দুঃখ বলিতে পারেন।

অতঃপর উন্মাদপ্রায় হইয়া তিনি উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া আরো প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল। সেই চাঁপা গাছ, সেই পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাট, সেই চামেলীকুঞ্জ সমস্ত তাঁহার প্রাণসখাকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। সন্তোষিণী প্রথমতঃ নির্জ্জন বনমধ্যে মাধবী-কুঞ্জে লুকাইয়া গদ্গদাশ্রু লোচনে প্রাণভরিয়া হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া খুব খানিক কাঁদিলেন। তাঁহার আলুলায়িত রুক্ষ চুলেরগোছা পৃষ্ঠে, কপালে স্কন্ধে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সমীরণ হিল্লোলে তাহা উড়িয়া উড়িয়া ফুলের গাছে লাগিতেছে, তজ্জন্য ছিন্ন পত্র কুসুমদল ও পরাগ কেশর সকল তাহাতে বিজড়িত হইয়াছে, নয়নদ্বয় গণ্ডস্থল অশ্রুজলে অভিষিক্ত, মুখ খানি শোকে মলিন, প্রেমবিরহে পাগলিনী প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে চম্পক তরু, হে আমার প্রেমতীর্থ, আমার হৃদয়নাথকে কি আর তুমি দেখাইবে না? তোমার পুষ্পপরিমল সকল বায়ুস্রোতে নানা দেশে গমন করে, তাহারা কি আমার প্রাণেশ্বরকে আমার দুঃখের কথা বলিয়া যাইতে পারে না? হে নির্ম্মল সরসীনীর, তোমার হৃদয়দর্পণে আমি যে কত বার তাঁহার সুন্দর মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি, আজ এক বার সেই মুখ খানি আমায় দেখাও না। লোকসমাজে আমার দুঃখের দুঃখী কেহ নাই, তোমরা কি আমার ব্যথার ব্যথী হইবে না? হে প্রেমিক বিহঙ্গদল, তোমরাত দেখিতেছি পূর্ব্বের মত গীত গাইতেছ, আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছ, আজ একবার আমার সঙ্গে কি কাঁদিবে না? তোমরাওত অনেক দেশ দেশান্তরে, পর্ব্বত, অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া থাক, আমার জীবনবন্ধুর সঙ্গে কি তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে না? যদি হয়, তবে এই অভাগিনীর দুর্দ্দশার কথা তাঁহাকে বলিও।"

সন্তোষিণী দেখিলেন, কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিল না, কেহ কাঁদিল না, আহা বলিল না, বরং তাহারা চিরকাল যেমন হাসে নাচে গান করে অম্লান মুখে তাহাই করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হতাশ হইয়া তিনি গোলাপ পল্লিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া

বলিলেন, "ভগ্নীগণ, হে আমার বাল্যসখী সকল, তোমরাও আমার ক্রন্দন কি শুনিবে না? তোমাদের সেই পুরাতন সহচরীর আজ কি দশা হইয়াছে একটী বার দেখ, দেখ! আহা তোমরা যে আমাকে বড় ভাল বাসিতে।"

কৈ, কেহইত কাঁদিল না। তাহারা হাসিয়া বন আলো করিয়া বসিয়া আছে, চারিদিকে মধুগন্ধ ছড়াইতেছে, বায়ুভরে নাড়িতেছে, রবিকিরণে দীপ্তি পাইতেছে, ভ্রমর মক্ষীকা, প্রজাপতি ও পক্ষীদিগকে লইয়া আহ্লাদ আমোদে মহা মহোৎসব করিতেছে।

ইহাদের ভাব গতি দেখিয়া শুনিয়া সন্তোষিণীর কিঞ্চিৎ চেতনা হইল, মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, শোকাবেগ কমিয়া আসিল। তখন বুঝিলেন, এইরূপই বুঝি বিধির বিধান। যে যায় সেই যায়, কেহ কাহারো জন্য কাঁদে না, কাঁদিয়া কিছু করিতেও পারে না। সুন্দর গোলাপটী দিবসে ফুটিয়া হাসিয়া খেলিয়া সুরভি বিতরণ করিয়া রাত্রিতে ঝরিয়া পড়ে, আহা! তার জন্য কে এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলে? শ্যামল পত্রদলে শোভিত তরুলতাগণ শীর্ণ জীর্ণ হইয়া কালে শুকাইয়া যায়, কে তাহার সমাচার গ্রহণ করে? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কে কোথায় মরিতেছে, মেঘের পশ্চাতে মেঘ, জলস্রোতের পশ্চাতে জলস্রোত, সমীরণের পশ্চাতে সমীরণ তরঙ্গ অনন্ত কাল ছুটিতেছে, কে কাহার সংবাদ লয়? এ সকল অনন্তের লীলা। অনন্ত কাল অনন্তে সকলেই চিরপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাই ইহারা কাঁদে না, শোক করে না। বালক বালিকা যুবক যুবতী হইতেছে, তাহারা আবার বৃদ্ধ বৃদ্ধা হইয়া মরিয়া যাইতেছে; পুনরায় তাহাদের স্থান বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা আসিয়া পূর্ণ করিতেছে। এই রূপেই পৃথিবী চলে, কেহ কাহারো জন্য চিরকাল ভাবে না। তবে কেন আমি ভাবিয়া মরি! এইরূপ চিন্তা করিয়া শেষ আপনাকে আপনি তিনি বুঝাইলেন,—"আমার হৃদয়সখার প্রেমত স্থান কালে আবদ্ধ নয়; তাহাওত অনন্তে প্রতিষ্ঠিত, অনন্তের অঙ্গীভূত, তবে তাঁহার ভালবাসা যে আমাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন তাহাই করিয়া দেখি পারি কি না। জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা যাঁহার প্রকৃত অস্তিত্ব, আত্মার মধ্যে তাহাই দেখি। বাস্তবিকতো তিনি শরীর নহেন, তিনি প্রেমময় আত্মা। কষ্ট দুঃখের ভিতর পড়িয়া তাই ভাবি, ভাবিতে ভাবিতে

তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই। মরিয়া মরিয়া তাঁহাকে ডাকি, ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার প্রেমরসে গলিয়া এক হইয়া যাই।"

সন্তোষিণী এইরূপে এক একবার আপনার মনকে প্রবোধ দিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করেন, আবার ভবিষ্যজ্জীবনের নিরাশা ও কঠোর বৈরাগ্যের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়েন। নির্দ্দয় বিপদের দানব যেন তাঁহাকে লইয়া প্রতি ক্ষণে ক্রীড়া করিতেছিল। মদমত্ত করী যেন বিশাল পদদলনে কোমলাঙ্গী নলিনীর সুকুমার বপু একবারে পঞ্চভূতে বিলীন করিয়া দিতেছিল।

মহা দুর্ভাবনা মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরিশেষে অবসন্ন মনে ভগ্নহৃদয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। পুনরায় হঠাৎ গভীর নিশীথ কালে সে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন নিদ্রালসোভারাক্রান্ত অসংযত মন আবার প্রিয়বিরহের প্রচণ্ড অনলে জ্বলিয়া উঠিল। এ সকল নিদারুণ মর্ম্মপীড়া কি ঘুমাইলে ভুলা যায়? বরং ঘুমের ঘোরে আরও তাহা প্রবলতর হইয়া উঠে।

আপনার এই বিষম যন্ত্রণাত ভোগ করিতে লাগিলেন, তৎসঙ্গে বাঞ্ছারামের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ আরো ব্যাকুল হইল। "আহা, কে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে, কেইবা আদর যত্ন করিবে? হয়তো অনাহারে পথশ্রান্তিতে, বৈরাগ্যের কঠোর ব্রতাচরণে কোথায় গিয়া প্রাণ হারাইবেন! তবে কি এটা আমার মৃত্যুবিরহ! জীবদ্দশায় মৃত্যুশোক আমাকে ভোগ করিতে হইল!" এই বলিয়া ভয়ানক শোকে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন। আহা, সে ক্রন্দনে পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। পরে কোন দিকে উপায় না দেখিয়া, হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে ধরিয়া তিনি অবস্থাচক্রের দুর্জ্জয় গতিমুখে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিলেন। এখনও শেষ হয় নাই, মানসিক দুর্ব্বিসহ ক্লেশের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরেও নির্য্যাতন অত্যাচার আরম্ভ হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তুফানে তরণী।

সন্তোষিণীর এত কষ্ট, এত যন্ত্রণার কারণ কি? অকৃত্রিম বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যেও মোহগরল লুক্কায়িত থাকে সেই জন্য এত যন্ত্রণা। "সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতা ময় হে, যদি সে প্রেমকনকে তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।" এটি বড় খাঁটি কথা। বাস্তবিক এ পৃথিবীতে অমিশ্র খাঁটি জিনিষ কিছুই নাই, সকলই সত্য অসত্যে পাপ পুণ্যে জড়িত। সুতরাং অমিশ্র শান্তি সুখও এখানে নাই। তাই এখানে আনন্দ উৎসবের অন্তরালে শোকের বিলাপ, প্রিয়জন সম্মিলনের ভিতর বিচ্ছেদের অগ্নি, সুখের মধ্যে দুঃখ, হাস্যের ভিতর ক্রন্দন, অমৃতের সঙ্গে গরল প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে। নির্দ্দোষ সুখ সম্ভোগই হউক, আর বিধিসঙ্গত স্বাভাবিক তৃষ্ণা চরিতার্থের কথাই বল, যাহা মায়া তাহা মায়া। এ জগতে যাহা সুখের কারণ তাহাই আবার দুঃখের জনক। বিষয় ভোগে রোগ জন্মে,—যোগে বিয়োগ ঘটে, সুতরাং তাহার জন্য কোন না কোন সময়ে যাতনা পাইতেই হয়। অভ্যাসের ফল বা কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শিক্ষা ও উন্নতির জন্য ইহা প্রয়োজন, এবং ইহাকেই ভগবানের লীলা বলা যায়।

বাঞ্ছারামের প্রস্থানের পর নিশানাথের সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তির আর আশঙ্কা রহিল না; তজ্জন্য তিনি এবং তদীয় পত্নী নয়নতারা দেবী একটু নিরাপদ হইলেন। সন্তোষিণীর প্রতি মায়াটা কিছু বেশী ছিল, অথচ সে অধিক লেখা পড়ার চর্চ্চা করে, স্বাধীনভাবে চলে, এটাও ইচ্ছা করেন না। সমাজের ভয়ে শাসনে উৎপীড়নে তৎপ্রতিও ক্রমে তাঁহাদিগকে কিছু নিষ্ঠুর হইতে হইল। প্রতিবাসী গ্রামস্থ লোকের নিন্দা, জ্ঞাতি কুটুম্ব-গণের শ্লেষ বচন ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। সন্তোষিণীর প্রাণ একে শোকে জর্জ্জরিত, তাহার উপর এই সকল গ্লানি গঞ্জনা নির্দ্দয় ব্যবহার; অগত্যা তিনি মুক্তির পথ দেখিতে লাগিলেন।

খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীতে মিসেস্ হালদার নাম্নী একটী প্রচারিকা ছিলেন, তিনি ইতিপূর্ব্বে শেলাই বুনন প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নিশানাথের ভবনে আসা যাওয়া করিতেন। তাঁহারই মন্ত্রণায় এবং সাহায্যে সন্তোষিণী একদা নিশাবসানে গৃহের বাহির হইয়া পড়েন। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান পল্লীমধ্যে তিনি তিষ্ঠিতে পারিলেন না। একে অনাচার, মদ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুনের দুর্গন্ধ, তাহাতে আবার পুরুষদের দৌরাত্ম্য, বড় বিপদেই পড়িলেন। পাদরী ভগান একবার বাইবেল পড়াইতে আসেন, ক্যাটিকিষ্ট টিমথি বিশ্বাস আসিয়া উপদেশ দেন, যুবকদল চারিদিকে উঁকি ঝুঁকি মারে, কেহবা হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলে, "কি গো, কি কোচ্চ?" কেহ হাসে, কেহ গান গায়; স্বাধীনভাবে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অনেকেই আনাগোনা টানা করিতে লাগিল। শীঘ্রই ব্যাপ্টিষ্ম হইবে; সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, মণ্ডলীমধ্যে মহা আনন্দধ্বনি উঠিয়াছে, এমন সময় কালান্তক যমকিঙ্কর স্বরূপ মালকোঁচামারা বড় বড় বাঁশহাতে টিকিমাথায় আর্য্যসভা ওরফে হরিসভার হিন্দু যুবার দল এবং টোলের ছাত্রগণ হঠাৎ তাহার মধ্যে পড়িয়া দাঙ্গা করিয়া সন্তোষিণীকে কাড়িয়া লইয়া গেল। তখন পাদরী ভগান্ হতভম্বা হইয়া গম্ভীরভাবে পদচালনা করিলেন, দাড়ি চোমরাইলেন, আঙ্গুল কামড়াইলেন, আপন মনে ড্যাম রাস্কেল নেটিভ নিগার বলিয়া গালি পাড়িলেন, পরিশেষে স্থানীয় বিচারালয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। কিন্তু হিন্দুরা ত্রিশ বৎসর বয়স্কা সন্তোষিণীকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা বলিয়া দিব্য প্রমাণ করিয়া দিল, সুতরাং ভগানের মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল। কেবল ইহাতেও তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না, যাহাদিগকে তিনি সচরাচর "হে হিন্দু যুবতী বালকগণ!" বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক পথিমধ্যে উপদেশ দিতেন, তাহাদের হাতে এক দিন দুই পাঁচটা চপেটাঘাতও খাইলেন।

মোকদ্দমা মামলাত মিটিল, কিন্তু এখন সন্তোষিণী থাকেন কোথায়? জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন, আরতো হিন্দু সমাজে স্থান পাইতে পারেন না। তখন দলপতি সমাজপতি গোষ্ঠীপতি ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষ সকলে মিলিয়া এই সিদ্ধান্ত

করিলেন, "বরং ব্রাহ্মজ্ঞানীর হাতে ছাড়িয়া দিব, তথাপি খ্রিষ্টান ব্যাটাদের দলভুক্ত হইতে দিব না; অতএব সঙ্কটাচরণের হস্তে উহাকে সমর্পণ করা হউক।" খ্রিষ্টিয়ানদিগের উপর ক্রোধ বিদ্বেষ হইলে ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দুদের এক প্রকার দুষ্ট সহানুভূতি হয়। যাহা হউক, শেষ এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

এখানে সঙ্কটের গৃহে আবার সেই বিকটবদন মুখ ব্যাদান করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি এক্ষণে বিড়াল তপস্বী, বহু দিনের অনাহারী জীব; বিবাহের উমেদারি করিতে করিতে চুল পাকিয়া গিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে, পায়ে কোমরে বাতে ধরিয়াছে, এখন গঙ্গাযাত্রা করিলেই হয়। তথাপি তিনি আশা ছাড়েন নাই। বিবাহের জন্য অনেক দিন হইতে খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্মসমাজে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন কোন স্থানে পাত্রী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বহু চেষ্টায় একটী বারবধূর সহিত একবার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, সেও তাঁহার দৈন্যদশা দেখিয়া শেষ পিছাইয়া যায়। বিবাহ বিবাহ করিয়া বিকট কিছু দিন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। যাকে তাকে বিবাহ করিতে চাহিত, সধবা বিধবা কুমারী স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ বুঝিতে পারিত না। এ জন্য একবার বড় বিপদেও পড়িয়াছিল। কতকগুল চ্যাঙ্গড়ার দল গ্রামের একটা হাবা গোবা আধপাগলা ছোঁড়াকে মেয়ে সাজাইয়া তাহার সঙ্গে বিকটের বিবাহ দেয়, এবং তাহার সঞ্চিত সম্বল দ্বারা লুচি সন্দেশ খায়। বিকট পরে যথা সময়ে সমস্ত ফাঁকি টের পাইয়া মনে বড় কষ্ট পাইল। এবম্বিধ পাঁচ কারণে এক্ষণে বিকট বাবুর মনে অতিশয় বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। তাই শেষ জীবনে ফকিরী লইবেন মনে করিয়া এইরূপে তিনি খেদ করিতেছেন,—

(১)

"ভাই হে, বৃথাই জনম গোঁয়াইনু।

না পরিনু কোট হ্যাট না করিনু চিট্ চ্যাট
মিশে বিবি যুবতীর দলে;
না খাইনু কাটলেট্, সেম্পিয়ান কেলারেট্
না বাঁধিনু নেকটাই গলে।

(২)

হায় হায় জনমিয়া কেন না মরিনু।

পাইনু পাপের দণ্ড, না দেখিনু ইংলণ্ড,

দিব্যধাম লণ্ডন নগরী;

পড়িয়া চরণপ্রান্তে, না ভজিনু শ্বেতকান্তে,

অন্তে কি হইবে ভেবে মরি।

(৩)

কবে মোর হবে শুভ দিন।

সাজিয়া ইংরাজ সাজে, লণ্ডন নগরী মাঝে,

লেডীর সমাজে বিহরিব;

টেম্‌স নদীর তীরে, বেড়াইব ধীরে ধীরে,

প্রেমানন্দে চুরট টানিব।

(৪)

অধমের ভাগ্যে তা কি হবে?

বাহিরে সাজিব সং, কিন্তু শাদা কাল রং,

দোঁহে কি কখন মিশ খাবে?

(৫)

হায় ভবে বিফল সে আশা।

স্নান করি গঙ্গাজলে, ছেঁড়া কাঁথা বাঁধি গলে,

পরিয়া কৌপীন বহির্বাস;—

যাই আমি বৃন্দাবনে, রাধাকৃষ্ণ দরশনে,

বৈষ্ণবের সঙ্গে করি বাস।"

মহাদুঃখে হতাশ মনে এইরূপে যখন তিনি দুশ্চর বৈরাগ্যের গাথা গাইতেছিলেন, সেই কালে হঠাৎ সন্তোষিণী তাঁহাদের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। বুভুক্ষু ব্যাঘ্রের মুখের সম্মুখে যেন একটী হৃষ্ট পুষ্ট অজা শিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। বিকট বিবাহের আশাত ছাড়েন নাই, জুটিয়া উঠিল না, বয়ঃক্রম বেশী হইয়া পড়িয়াছিল, কি করেন, কাজেই বৈরাগ্য সঙ্গীত গাইতেছিলেন। সন্তোষিণীর আগমনে সেই যমালয়গত ইচ্ছা

আবার জাগিয়া উঠিল। মনে ভাবিলেন, “এত দিনে বিধাতা বিবাহের ফুল ফুটাইলেন। আমি জানি, সন্তোষিণী আমাকে অনেক দিন হইতে ভাল-বাসে, কেবল বাঞ্ছারামের জন্য কিছু করিতে পারিত না।” তখন আর এক বার বেতো পায়ে ভর করিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনাথা আশ্রয়হীনা সন্তোষিণীকে দেখিয়া চিত্ত ব্যাকুল হইল। সঙ্কটেরও ইচ্ছা, যদি ঘটেত ঘটিয়া যাউক, একটা পরিবার বৃদ্ধি হইবে, ব্রাহ্মসমাজ জুঁকিবে। সন্তোষিণী সিংহের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ব্যাঘ্রের হস্তে পড়িলেন। বিকট তখন তাহার ছাতাধরা পচা পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া, পুরাতন পোষাক দুই একটা যাহা ছিল রৌদ্রে শুকাইয়া, চারপোকা বাছিয়া অঙ্গে চড়াইল, চুরট দ্বারা মুখাগ্নি করিল, পাকা চুল ফিরাইল ভাঙ্গা হারমনিয়মের বেলয় সুরে গান গাইল, একটু ইংরাজি মথন পড়িল, দুই পকেটে দুই হাত দিয়া নানা রঙ্গ ভঙ্গে উঠানে বেড়াইতে লাগিল এবং ছিন্ন কর্ণটী সোলাটুপির দ্বারা ঢাকা দিল। কোর্টশিপের জন্যও অনেক চেষ্টা চরিত্র করিল, কিন্তু বড় সুবিধা হইয়া উঠিল না।

বিকট পূর্ব্বে কাদম্বরী শকুন্তলা কিছু পড়িয়াছিল, সাধু ভাষার দুই চারিটা বাঁধি গৎ জানিত। সেই অব্যর্থ বাণ সন্তোষিণীর প্রতি এক্ষণে নিক্ষেপ করিল। বলিল, “অয়ি, কুরঙ্গনয়না, মধুরভাষিণি, তোমার ঐ প্রফুল্ল রাজীব সদৃশ মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় কেন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া রহি-য়াছে। সুন্দরী, তোমার এই অনির্ব্বচনীয় রূপরাশি কি বাঞ্ছারামের ন্যায় রসহীন মানবের উপযুক্ত? কখনই নহে। তুমি আন্তরিক আমায় ভালবাস তা জানি, এত দিন কেবল সেই হতভাগ্যের কুমন্ত্রণায় তোমাকে বাধা দিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে শুভ দিন নিকটবর্ত্তী, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? হে অনিন্দিতে, ভদ্রে, আর কেন মৌনাবলম্বন কর, কথা কও। এক বার সহাস্য আননে মধুর স্বরে কথা কও।”

বিকটের কবিত্ব শক্তি খুলিয়া গেল। সে মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, “আমার সুললিত বচনে সন্তোষিণীর হৃদয় নিশ্চয় গলিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই।” তাহাকে পাগল মনে করিয়া সন্তোষিণী দূরে দূরে ফিরিতে লাগিলেন। অতঃপর বিকটের সর্ব্ববিধ ভদ্র উপায় যখন ব্যর্থ হইল,

তখন সে নানা রকমে উৎপাত আরম্ভ করিল। কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়, পথ আটকায়, মুখে সিস্ দেয়, কাশে, গায়ে মদ ছিটাইয়া দেয়, হিহি করিয়া হাসে, সেকহ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়ায়। সন্তোষিণী মহাবিপদ দেখিয়া এক দিন গোপনে গোপনে সে স্থানও পরিত্যাগ করিলেন, এবং যাত্রীদিগের সঙ্গে মিশিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। তথায় তাঁহার এক প্রাচীনা দিদিমা ছিল, খুঁজিয় খুঁজিয়া শেষ তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে বিকট বাবুও শোকে দুঃখে ত্রিভুবন আঁধার দেখিয়া খেদ করিয়া বলিলেন, "হায়, আমার তিন কাল গিয়াছে এক কালে ঠেকিয়াছে, এই অসার অনিত্য দেহ ধারণ বৃথাই হইল! মনের আশা মনেতেই মিলাইয়া গেল। তবে আর এ জীবনে সুখ কি? আমার মরণই মঙ্গল" এইরূপে অনুতাপ করিয়া বাসনাগরল পান করিতে করিতে হঠাৎ এক দিন দাঁত মুখ সিটকাইয়া, চক্ষু উলটাইয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। গরল হইতে আর অমৃত উদ্ধার করা হইল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থে ধর্ম্মনাশ।

আমাদের এ গল্প শুনিতে শুনিতে কেহ যেন ঘুমাইয়া না পড়েন। এখনো অনেক ভাল ভাল কথা আছে।

সন্তোষিণী কাশীধামে পৌঁছিয়াই দেখিলেন, ঘাটে ঘাটে স্ত্রী পুরুষ দল বাঁধিয়া গঙ্গাস্নান শিবপূজা করিতেছে, মন্দিরের মাথায় মাথায় ধ্বজা উড়িতেছে, অলি গলিতে যেখানে সেখানে শিবের মঠ, দেবীর মণ্ডপ। সেখানে যত না শিব, তত বা ষাঁড় এবং তত সন্ন্যাসী। পথে পথে মহারাষ্ট্রীয় দ্রাবিড়ী সারস্বত তৈলঙ্গী মৈথিলী কঙ্কানী হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী উড়িয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের জনতা, সকলেই যেন ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল এবং উন্মত্ত। এই রমণীয় দৃশ্য সহসা অবলোকন করিয়া সন্তোষিণীর ধর্ম্মভাব প্রজ্বলিত

হইয়া উঠিল। কাশীবাসী লোকদিগকে তিনি কত সুখী সৌভাগ্যশালীই তখন মনে করিলেন! দেবমন্দির সকলে নিরন্তর ঠনাঠন ঢনাঢন ঘণ্টা বাজিতেছে, যেখানে সেখানে পাঠ কথকতা চণ্ডীর গান হইতেছে, পুরোহিতেরা মন্ত্র পড়িতেছে, তীর্থযাত্রিগণ কৃতাঞ্জলি পুটে গললগ্নিকৃতবাসে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কেহ মালা জপিতেছে, কেহ ধুলায় লুটিতেছে। সুবর্ণমণ্ডিত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সন্ধ্যাকালীন আরতির শোভা দেখিয়া, তথায় শত সহস্র যাত্রীর কণ্ঠনিঃসৃত হর হর ব্যোম ব্যোম ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সন্তোষিণীর শোকভগ্ন হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভক্তিভাবের উদয় হইল। অনেক কষ্ট নির্য্যাতনের পর তিনি একটু যেন আরাম পাইলেন। ভাবিলেন, "কত দুঃখিনী বিধবা এখানে দিবা নিশি ধর্ম্মকর্ম্মে, দেবদর্শনে, পুণ্য উপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়া সুখে কাল হরণ করিতেছে। ইহাদের সংসারচিন্তাও নাই, বিচ্ছেদবিকারেও কেহ দগ্ধ হইতেছে না, সদানন্দ আশুতোষ মহাদেবের লীলাধামে সকলেই সদানন্দ চিত্ত। আহা ইহাদের কি নিষ্ঠা! ধর্ম্মের জন্য কি প্রগাঢ় অনুরাগ! পাণ্ডা বাবাজীরা কেমন আদর যত্নের সহিত যাত্রীদিগের সেবা করিতেছেন। স্বর্গতুল্য স্থান, আমি কি এই পুণ্যধামে স্থান পাইব!"

নগরমধ্যে, গঙ্গাতীরে, দেবমন্দিরে, রাজমার্গে এই সকল দেখিয়া পরে নগরপ্রান্তে সন্ন্যাসী দণ্ডীদিগের আশ্রম, নির্জ্জন বন, উদ্যান সরসী, প্রাচীন কীর্ত্তি গুহা গহ্বর দর্শন করিলেন। সেখানে দলে দলে দণ্ডী পরমহংস পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ত্রিশূলধারী ভৈরব ভৈরবী অঘোরপন্থী বানপ্রস্থ উদাসী যোগী জটাধারী সকল বাস করিতেছে। কেহ কটিতটে গৈরিক বসন আঁটিয়া, মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া নন্দরাণী যশোদার ঘোলমন্থনের ন্যায় মহাবিক্রমের সহিত সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। কেহ মৌনব্রত লইয়াছেন, তাঁহাকে কথা কহিতে নাই; কিন্তু তিনি হস্ত পদ সঞ্চালন, চক্ষু ও মুখভঙ্গী দ্বারা মনের সকল প্রকার ভাব রসই প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বড় বড় কাঠের কুঁদো যড় করিয়া ধুনি জ্বালাইয়া, গায়ে ছাই মাখিয়া, জটা এলাইয়া মুদ্রিত নয়নে গাঁজা ফুঁকিতেছেন, এবং পাছে একটু মাল লোকসান হয়, তজ্জন্য সমস্ত ধোঁয়া গিলিয়া গিলিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ

বা সেই আগুনে মোটা মোটা রুটী, গোল গোল লিট্টি বানাইয়া মনোযোগপূর্ব্বক তাহাতে ঘি মাখাইতেছেন। যিনি ঊর্দ্ধবাহু তিনি নখ চুল বড়াইয়া বসিয়া আছেন। কেহ দিগম্বর মূর্ত্তি ধরিয়া চিমটাহাতে পথে পথে ফিরতেছে, কেহ দুই চক্ষু সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিতেছে, কেহ পঞ্চাগ্নির তাপে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের ডালে ঝুলিতেছে ;—তাহার পদদ্বয় স্ফীত হইয়া তাহা হইতে রস রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে এবং শিষ্যেরা গরম জল দিয়া তাহা ধুইয়া দিতেছে। আর এক স্থানে দেখিলেন, এক ব্যক্তি উদরস্থ নাড়ী সকল বাহির করিয়া তাহা ধুইয়া আবার উদরে পূরিতেছে। কেহ মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। কেহ কুম্ভক যোগে উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, ন্যাংটিপরা সন্ন্যাসীর চোট চোট ছানা গুল পালে পালে বেড়াইতেছে, ভুখা সাধু বলিয়া ভিক্ষা মাগিতেছে। আবার কোন এক স্থানে দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে জল তাহার মধ্যে মাচা বাঁধিয়া এক যোগী জপ করিতেছেন, আর সোটা ধরিয়া দর্শক যাত্রী হাঁকাইতেছেন। কেহ গুহাভ্যন্তরে দিন রাত্রি ধ্যানে মগ্ন, কেহ বা শিষ্যদিগকে বেদ বেদান্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত। আবার কেহ বা হেঁণ্ডমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে তপস্যা করিতেছেন। কেহ চেলা দ্বারা গা হাত পা সর্ব্বাঙ্গ টিপাইতেছেন।

সন্তোষিণী কাশীধামে আসিয়া যাহা কিছু নয়নগোচর করিলেন, সমস্তই ধর্ম্মের পরিচ্ছদ, ধর্ম্মের কার্য্য, ধর্ম্মের আচার ব্যবহার। কাশীতীর্থ যেন ধর্ম্মময়। এই সকল দেখিয়া তিনি বিমোহিত হইলেন, এবং মনে মনে স্থির করিলেন, "অবশিষ্ট জীবন আমি এই পবিত্র স্থানে সাধুসঙ্গে জপ তপে ধ্যান চিন্তায় অতিবাহিত করিব।" এই সঙ্কল্প করিয়া দিদিমায়ের নিকট থাকেন। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ক্রমে তত লোকদিগের গুপ্ত ব্যবহারের পরিচয় পাইলেন। শেষ বুঝিলেন, পাণ্ডারা ডাকাত, সন্ন্যাসীরা চোর, পুরোহিতেরা শঠ ধূর্ত্ত। অনেক স্ত্রী পুরুষ বাহিরে যেমন ভিতরে ঠিক তদ্বিপরীত। ধর্ম্ম কর্ম্ম বাহ্যাড়ম্বর অধিকাংশই বাণিজ্য ব্যবসায় তুল্য। সরল বিশ্বাসী সাধুচরিত্র মুমুক্ষু লোকও আছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প।

লোকের কপটাচরণ কুব্যবহার দেখিয়া সন্তোষিণীর উৎসাহ আশা ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন তথায় তাঁহার দিদিমার আশ্রিতা ভাড়াটিয়া কোন এক সুন্দরী নারী বাস করিত। লক্ষ্মীর মত তাহার শ্রী সৌন্দর্য্য। বেশ বিন্যাস করিয়া যখন সে বারাণ্ডায় দাঁড়াইত, তখন বোধ হইত যেন আকাশের বিজলী স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিবিড় জলদ জাল-স্বরূপ কুন্তল রাশির সম্মুখে বিহার করিতেছে। কিন্তু তাহার মনটী অতি-শয় বঙ্কিম। কি পুরুষ কি নারী সকলকে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় সে নাচা-ইতে পারিত। তাহার চক্রে পড়িয়া দুই একটী খুন জখমও হইয়া গিয়াছে। রূপমুগ্ধ যুবকদিগকে ঠকাইয়া তিনি বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। গায়ে একটী গা গহনা। ঘরটী ঝাড় লণ্ঠন পাখা খাট পালঙ্গ আয়না ছবি দ্বারা বিলক্ষণ সুসজ্জিত। বিছানা কাপড় চোপড়ে আতর গোলাপ ওডিকলম ল্যাবেণ্ডারের গন্ধ। এক সেট কাঁটা চামচ ছুরি ডিস্ প্লেটও আছে। খুঁজিলে দুই পাঁচটা ব্রাণ্ডি বোতলও না পাওয়া যায় এমন নয়।

যে কার্য্যালয়ের বড় হইতে ছোট প্রত্যেক কর্ম্মচারী উৎকোচগ্রাহী সেখানে এক জন সত্যবাদী ন্যায়বান্ কর্ত্তব্যপরায়ণ ধার্ম্মিক লোক প্রবেশ করিলে সে যেমন বিপদে পড়ে, নির্ম্মল চরিত্রা সন্তোষিণীর পক্ষে কাশীধাম তদ্রূপ হইয়াছিল। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি এই দেখিলেন, অধর্ম্ম দুষ্কর্ম্মকে লোকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার এবং আচরণ করে। উপরিউক্ত স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে সেই রূপ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইল। লোকদিগের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইয়া অন্তরালে বসিয়া সে হাসিত। গালা-গালি, ভাঙ্গাভাঙ্গি, ইহার কথাটী উহার কাণে, উহার কথাটী ইহার কাণে, এই তাহার প্রধান কাজ। মনটী কুজড়ামিতে যেন পরিপূর্ণ। কিন্তু নিজে সে মন্দচরিত্র ছিল না, কেবল অপরকে লোভ দেখাইয়া পাপে মজাইয়া পরীক্ষা প্রলোভনে ফেলিয়া আমোদ অনুভব করিত। তাহার হাতে পড়িয়া কত কত চঞ্চলমতি যুবক একবারে পাগল হইয়া অধঃপথে গিয়াছিল। সুন্দরীর নামটী কনকলতা। সন্তোষিণী এক দিন তাহাকে বলিলেন "দিদি, আমাকে কথকতা শুনাইতে লইয়া চল না।"

কনক। কথকতা শুনিবে। কত দক্ষিণা দিবে বল, আমি ঘরে বসিয়াই তোমায় কত কথা শুনাইতে পারি।

সন্তো। কেন দিদি ঠাট্টা কর, আজ আমি শিবচতুর্দ্দশীর উপবাস করিয়া আছি, কিছু ভাল কথা শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।

কনক। উপবাস করে আছ। ও মা! কেন গা! কাশীতে কি উপবাস করে। তাতে যে বাবা বিশ্বেশ্বরের অকল্যাণ হবে!

সন্তো। তবে এখানে কি করিতে হয়?

কনক। একটু হাসিয়া, এখানে বাবা বিশ্বেশ্বরের উপর সব পাপের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আহ্লাদ আমোদে থাকিতে হয়।

সন্তোষিণী ধর্ম্মের জন্য পিপাসু হইয়া যত ব্যাকুলতা এবং গাম্ভীর্য্যের সহিত কথা কয়, কনক ততই হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলে, "বোন, তোমার এ বয়সে কি এত ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাল দেখায়! বিশ্বেশ্বরের উপর সব ভার দাও।" সে নারী ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে চার্ব্বাকের শিষ্য, ভিতরে ভিতরে ধর্ম্মকে কেবল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইত। কিন্তু সে সন্তোষিণীকে কিছুতেই টলাইতে পারিল না। শেষ রাগিয়া চটিয়া হিংসায় জ্বলিয়া তাঁহার নামে এমনি এক মিথ্যা কলঙ্ক রটাইল যে একবারে তাঁহাকে দেশছাড়া করিল। এমনি মিষ্ট মিষ্ট করিয়া ব্যাকুল ভাব ভঙ্গীতে মিথ্যা কথা গুলি সাজাইয়া বলিত, যে তাহা কেহ বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। সন্তোষিণী তজ্জন্য লজ্জিতা অপমানিতা হইলেন, দিদিমায়ের কাছে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা খাইলেন, পাড়ার নষ্ট দুষ্ট স্ত্রী পুরুষেরা নিন্দা উপহাস করিল, হাসিল, টিট্‌কারী দিল, মর্ম্মভেদী কথা বলিল, অগত্যা তিনি শেষ কাশীবাসও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের আশ্রয়।

বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস, ঘোর নিশীথ সময়, বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষিত হইতেছে, আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া এক একবার বিদ্যুতের ছটা চমকিতেছে, মধ্যে মধ্যে রাত্রিচর জন্তুগণের রব শুনা যাইতেছে, নিকটে কল্লোলিনী ভাগীরথী কল কল তর তর নাদে তীব্র বেগে ছুটিয়া যাইতেছে এবং তাহার উন্মত্ত তরঙ্গ সকল উপকূল আকুল করিয়া গম্ভীর শব্দ উত্থিত করিতেছে। একটী তারকা কিংবা একটী খদ্যোতিকার আলোকও সেখানে নাই, কেবল পরপারে শ্মশান ঘাটে চিতাগ্নির শিখা দূর হইতে দেখা যাইতেছিল, এবং জলস্রোতের উপর তাহার উজ্জ্বল কিরণ জ্বলিতেছিল। চারিধারে তিমিরময় মহাসমুদ্রবৎ বিস্তীর্ণ প্রান্তর, তাহার মাঝখানে রাজপথের সেতুর উপর বসিয়া সন্তোষিণী একাকিনী রোদন করিতেছেন। জীবন যায় সেও ভাল, তথাপি পাপসংসর্গে অসৎ জনসমাজে তিনি বাস করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছেন। চক্ষের জলে গণ্ডস্থল ভাসিতেছে, বৃষ্টির জলে পরিধেয় বসন, মাথার চুল ভিজিয়াছে। বিষণ্ণ বদনে, সাশ্রু নয়নে, হতাশ মনে কাঙ্গালিনীর ন্যায় রাজপথে বসিয়া কাঁদিতেছেন। দুঃখের যেন অবতার। সেই ভয়ঙ্করা কাল রজনীর অন্ধকার মধ্যে বরং বিদ্যুতের আলোক আছে, কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যজ্জীবনের অন্ধকার একবারেই অবিমিশ্র অন্ধকার, তাহাতে ক্ষীণজ্যোতি আশাখদ্যোতিকাও একটী জ্বলে না। অনাথা অভিভাবকহীনা যুবতী স্ত্রীলোকের পদে পদে শত্রু, নির্জ্জন প্রান্তরও যেমন বিপজ্জনক, সজন নগরও তেমনি; যে ভালবাসা দেখায়, দয়া করে সেও শত্রু। কোথায় যাইবেন, কে স্থান দিবে, এই ভাবিয়া আকুল চিত্তে তিনি কাঁদিতেছেন। যাহার দয়া করিবার কেহ নাই, তাহার ক্রন্দনের অশ্রুজলবিন্দু যেন অগ্নিকণা সদৃশ। বাহিরের অন্ধকার

অন্তরের অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সে দুঃসময়ে তথায় জনমানবের গতি বিধি নাই, গ্রাম নগর পথ কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। কিন্তু ভগবান্ নিরুপায়ের উপায়। যখন মানুষের বুদ্ধি ক্ষমতা পরাস্ত হয়, পৃথিবীতে কোন দিকে আর আশা ভরসা থাকে না, বাহিরের আলোক সমস্ত নিবিয়া যায়, তখন সেই সর্ব্বব্যাপী বিপদভঞ্জন দেবতা বিপদান্ধকার ভেদ করিয়া নিরাশ্রয় জীবকে রক্ষা করেন, এমন উপায় দেখাইয়া দেন, যে তাহা গণনার অতীত।

যে সময় সন্তোষিণী এইরূপে পথে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন তৎকালে একটী পথিক দৈবঘটনা ক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি দূর হইতে বামাকণ্ঠবিনিঃসৃত কাতর ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং অদূরে দাঁড়াইয়া রোদন শব্দ শুনিতে লাগিলেন। এক এক-বার চঞ্চলা চপলার আলোকে তিনি সেই রোরুদ্যমানা দুঃখিনী নারীকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সন্তোষিণী অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতেছেন, মহা দুঃখের অনন্ত পারাবার যেন তাঁহার চারিদিকে ভৈরব গর্জ্জনে আস্ফালন করি-তেছে, আর তরঙ্গনিক্ষিপ্ত কুসুমকুমারীর ন্যায় তিনি আন্দোলিত হইতেছেন। আগন্তুক পাথিক ক্ষণকাল চাহিয়া চাহিয়া শেষ নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন "মা, তুমি কে গা? কেন ক্রন্দন করিতেছ? আর কেনই বা এ ঘোর নিশাকালে একাকিনী এখানে বসিয়া রহিয়াছ? যদি আমা দ্বারা কোন সাহায্য হয় বল, আমি আহ্লাদের সহিত তাহা করিব।"

সন্তোষিণী স্বদেশে এবং কাশীধামে লোকচরিত্রের যেরূপ ভয়ানক নিদ-র্শন সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সাহস হইল না যে কোন কথার উত্তর দেন। কেবল এইমাত্র বলিলেন, "মহাশয়! আমি পথের কাঙ্গা-লিনী হইয়াছি, দয়া মায়া করিবার আমার আর কেহ নাই। আমার এ দুঃখ কষ্ট বোধ হয় মানুষের দ্বারা দূর হইবে না। জীবনান্তই আমার দুঃখের অন্ত।"

পথিকের মাথায় একটী ছাতা ছিল, এবং হস্তে কতক গুলি ঘুঁটে এবং কিছু ঘৃত ময়দা। তিনি নিকটস্থ কোন গুহাবাসী সাধুর সেবার্থ সেই গুলি লইয়া যাইতেছিলেন। তিনি এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, ধার্ম্মিক এবং

পরোপকারী ব্রাহ্মণ। সন্তোষিণীর উত্তর শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। বলিলেন; "মা, তুমি কেন বৃষ্টিতে ভিজিয়া কষ্ট পাইতেছ এই ছাতাটী রহিল, আমি শীঘ্র আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি দ্রুত পদে সাধুর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। সেই স্থানের অনতি দূরে একটী ক্ষুদ্র নগর, তথায় সেই ভদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পরিবার পুত্র কন্যা ছিল। নাম তাঁহার সেবানন্দ শর্ম্মা। অতঃপর সাধুর ভোজ্য সামগ্রী রাখিয়া আসিয়া সন্তোষিণীকে তিনি নিজগৃহে লইয়া চলিলেন, এবং তথায় অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। বাড়ীর গৃহিণীও তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সন্তোষিণী নানা স্থানে উৎপীড়িত অত্যাচরিত হইয়া এই ব্রাহ্মণগৃহে কিছু দিন নিরাপদে শান্তিতে অবস্থিত করেন। গৃহস্বামীর চরিত্রটী বড়ই ভাল। তিনি পরের দুঃখ শুনিলে কাঁদিতেন। ধর্ম্মের কোন আড়ম্বর বাচালতা ছিল না। বাড়ীতে পূজা পার্ব্বণের বেশী ঘটা জাঁক জমক দেখা যাইত না, কিন্তু জীবে দয়া, ভগবানে অচলা ভক্তি ছিল। পথের মধ্যে কে কোথায় কোন্ অন্ধ খঞ্জ আতুর পঙ্গু দরিদ্র কাঙ্গাল অনাহারে নিরাশ্রয়ে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাই তিনি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং কাহারো দেখা পাইলে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিতেন। যাহারা হাতে তুলিয়া খাইতে পারে না, গলিত কুষ্ঠ রোগে মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে, তাহাদিগের মুখে স্বহস্তে তিনি আহারসামগ্রী তুলিয়া দিতেন। কাহাকেও রাহা খরচ, কাহাকেও বস্ত্র, কাহাকেও খাদ্য দান করিতেন। কেহ একাকী রোগশয্যায় ঘরে পড়িয়া আছে, একটু জল দেয় এমন লোক নাই, মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে তাহার কোন সংবাদ কেহ লয় না, তাহার রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া রাত্রি জাগিতেন, বাড়ী হইতে পথ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহার সেবা করিতেন। এ সকল সেবার কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য সৎকার্য্যও তাঁহার অনেক ছিল। কাহারো বাড়ীতে কেহ মরিলে সর্ব্বাগ্রে তিনি গামছা কাঁধে লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন এবং মৃত দেহের সৎকার করিয়া আসিতেন। মুখে একটী কথা নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে, অন্ধকার রাত্রি, প্রতিবাসী অলস যুবকগণ বলিল, "দাদা মহাশয়, বড় খিদে পেয়েছে, কিছু দিন না খাই।" বিনা বাক্য ব্যয়ে

অমনি সেবানন্দ ছাতাহাতে বাজারে চলিলেন। কেহ বলিল, "জ্যেঠা মহাশয়, "আমি কাল জন কয়েক লোককে খাইতে বলিয়াছি, একটু সাহায্য করিতে হইবে।" সেবানন্দ রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে গিয়া হাজির। নিজেই রাঁধিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে প্রিয়াপ্রিয় শত্রু মিত্র আত্ম পর ভেদজ্ঞান ছিল না। কোন বিধি উপবিধির সঙ্গে তাঁহার সৎকার্য্য মিলিতেছে কি না তাহাও তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেন না। যিনি গোপনে দেখিয়া গোপনে এবং প্রকাশ্যে পুরস্কার দেন তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ এই সকল সাধুকার্য্য করিতেন।

এই সুখী পরিবারে শান্ত্যাষিণী সুখে বাস করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামীর পরোপকার জনহিতৈষণা দুঃখীর প্রতি দয়া মমতা দেখিয়া, তাঁহার বিনম্র মধুর বচন শুনিয়া এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সরল মধুর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অত্যন্ত মোহিত ও প্রীত হইলেন। এই শান্তির পরিবারের শীতল ছায়া প্রতিবাসী নরনারীগণের জুড়াইবার স্থান ছিল। কেহ কাহারো সঙ্গে বিবাদ করিলে, কিম্বা কোন পরিবারমধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিলে এই সাধু বিপ্র সপরিবারে তাহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া কৃতাঞ্জলি করিয়া সমস্ত গণ্ডগোল মীমাংসা করিয়া দিতেন। তিনি বক্তৃতা করিয়া কিম্বা ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় বচন ব্যাখ্যা করিয়া, অথবা উপদেশ দ্বারা লোকের ক্রোধ বিদ্বেষ হিংসা প্রবৃত্তির চিকিৎসা করিতেন না, তাহা জানিতেনও না, কেবল আপনাকে ভুলিয়া পরের দুঃখে দুঃখী হইয়া কাঁদিতেন, মুখ খানি কাঁচু মাচু করিয়া হাতযোড় করিতেন, বাপ না ভাই দাদা সম্বোধনে দুই একটী কথা বলিতেন, দাসের মত মাটী হইয়া লোকের পদসেবা করিতেন তাহাতেই সকলে একবারে নরম হইয়া যাইত। ভাল মন্দ স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী পাপী সাধু ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে লোকে উপকৃত হয়, দুঃখ চলিয়া যায় সেই সকল কার্য্য করিয়া তিনি পরের সুখে সুখী হইতেন। তদীয় ব্রাহ্মণী এবং পুত্র কন্যাগণ এইরূপ সৎকার্য্যে চিরসহকারী ছিলেন। স্বামী স্ত্রী দুই জনে মিলিয়া যখন তাঁহারা দুঃখীর সেবা করিতেন, তাহা দর্শনে পাষাণ হৃদয়েও স্নেহের সঞ্চার হইত। ঘোর অহঙ্কারী মহাক্রোধী ব্যক্তিও সেবানন্দের মুখের বিনয়জ্যোতি দেখিয়া ভাল মানুষের মত আস্তে আস্তে কথা কহিত।

সন্তোষিণী তাঁহার গৃহে থাকিতেন আর এই সকল স্বর্গীয় ব্যবহার নীরবে বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেন। যত দিন যাইতে লাগিল ততই তিনি ব্রাহ্মণের আচরণে অধিকতর মোহিত হইতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে ভাবিতেন, "প্রকৃত ধর্ম্ম যে জনসমাজে মানবপরিবারে আছে তাহা এত দিনে আমি বুঝিলাম। এ স্বর্গীয় কুসুম তীর্থস্থানে, পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে প্রস্ফুটিত হয় না।" সন্তোষিণী ব্রাহ্মণকে বড় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন। এইরূপে তিনি গৃহের কন্যার ন্যায় আত্মীয় পরিচিতা হইয়া রহিলেন। সেবানন্দের সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়া তিনিও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন।

এই গৃহবাসী নিরীহ ধর্ম্মাত্মা বিপ্রের উপর এক জন সাধু মহাপুরুষের ছায়া পড়িয়াছিল তাই তাঁহার স্বভাব এত সুন্দর সুমিষ্ট। গুহাবাসী সাধুর সেবা করিয়া ইনি তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হন। তিনি যেমন বিনয়ী প্রেমিক প্রশান্তাত্মা গুরু, ইনিও তেমনি তাঁহার অনুরূপ শিষ্য। বাহিরে কোন আড়ম্বর সমারোহ নাই, অথচ স্বভাবতঃ তাঁহা হইতে ধর্ম্মের শীতল জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়িত। তিনি জানিতেন না কেমন তিনি ধার্ম্মিক। এক দিন কথায় কথায় ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা, তুমি যেরূপ ধর্ম্মের জন্য লালায়িত দেখিতেছি, যদি আমাদের বাবাজীর নিকটে এক বার যাও, তাহা হইলে বড়ই শান্তি লাভ করিতে পার। আমাদের বাবাজীর এমনি প্রসন্ন মূর্ত্তি, আর এমনি তাঁহার মিষ্ট কথা যে নিমেষের মধ্যে সকল প্রকার ভব-যন্ত্রণা চলিয়া যায়। কত বিধবা পতিপুত্রবিহীনা অনাথা তাঁহার কথা শুনিয়া শান্তি পাইয়াছে। তুমি যদি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, বড়ই কৃতার্থ হইবে। তাঁহার দর্শনে সশরীরে স্বর্গ লাভ হয় আর অধিক কথা কি বলিব। আমি সেই স্বামীজীর চরণপ্রসাদে পরিবার মধ্যে থাকিয়াও শান্তি সম্ভোগ করিতেছি। তিনি লোকসঙ্গ প্রায়ই করেন না। কদাচিৎ মাসের মধ্যে দুই একবার বাহির হন, অবশিষ্ট সময় গভীর নির্জ্জন গহ্বর মধ্যে ধ্যানে মগ্ন থাকেন। তিনি কাহাকেও শাস্ত্রও শিখান না, উপদেশও দেন না, কিন্তু এমনি হাসেন আর মিষ্ট মিষ্ট কথা বলেন যে তাহাতেই মৃতপ্রাণে আশার সঞ্চার হয়। তাঁহার হাসিমুখখানি বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবত

অপেক্ষাও গভীর অর্থযুক্ত। তুমি দেখিলেই সব বুঝিতে পারিবে। অদ্ভুত তাঁহার চরিত্র, একাকী অন্ধকার মধ্যে গত পাঁচ বৎসর কাল মহাযোগব্রত সাধনে নিযুক্ত ছিলেন. লোকে মনে করিত তিনি অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, কেহ বা বলিত গর্ত্তের ভিতর তাঁহার শরীর পচিয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে সম্প্রতি হঠাৎ তিনি দেখা দিয়াছেন। দেশ দেশান্তর হইতে কত কত সাধু মহন্ত তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতেছেন। আমাকে তিনি বড় কৃপা করিয়া থাকেন। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে তুমি চল, আমি দেখা করিয়া দিব।"

ব্রাহ্মণের মুখে বাবাজীর অদ্ভুত গুণকাহিনী শুনিয়া সন্তোষিণীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল, চক্ষে জলধারা বহিল, অন্তরনিহিত ভগবদ্ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি যে কিরূপ মহাপুরুষ তাহার আভাস ব্রাহ্মণের পবিত্র উদার চরিত্র দেখিয়া সন্তোষিণী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তদনন্তর নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া গৃহস্বামীর পায়ে লুটাইয়া বলিলেন, "আপনি যদি আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যান বড় কৃতার্থ হই। আমি বড় দুঃখিনী, শোক সন্তাপে আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যথিত আহত, এক্ষণে আপনার কথা শুনিয়া মনে আশা হইতেছে সেই সাধু মহাজনের কৃপায় আমারও তাপিত হৃদয় শান্তি লাভ করিবে। চলুন, আমি অদ্যই আপনার সঙ্গে যাই, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আপনি যে আমাকে পথ হইতে তুলিয়া আনিয়াছেন, ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা আমি এখন বুঝিতে পারিলাম।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারে মাণিক।

গঙ্গার ধারে একটী অতি সুরম্য নির্জ্জন স্থান, চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত শস্য-ক্ষেত্র, মধ্যস্থলে অশ্বত্থ নিম্ব এবং আম্রবৃক্ষের বাগান, তাহাতে বিচিত্র বিহঙ্গকুল নিরন্তর কলনাদে সঙ্গীত করে। ভাগীরথীর সলিলসিক্ত স্নিগ্ধসমীরণ রাশি সম্মুখস্থ প্রান্তর পার হইয়া সেই তরুকুঞ্জের পরিষ্কৃত ভূমিতলে সর্ব্বদা প্রবাহিত হইত। এই বিজন স্থান স্বামী সদানন্দের আশ্রম। ইহাঁর প্রকৃত নাম হরভজনদাস, কিন্তু আমরা সদানন্দ বলিয়া ডাকিতে ভাল বাসি। একটী কুটীরের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ আছে, তাহার ভিতরে অন্ধকার গুহা, সেইখানে বসিয়া বাবাজী সর্ব্বদা যোগ ধ্যানে মগ্ন থাকেন। তিনি পার্থিব সুখ বিলাসের নিকটতো চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছেন, অনায়াস লভ্য যে স্বভাবের উপহার তৎপ্রতিও স্পৃহা রাখেন না। প্রকৃতির নয়ন-রঞ্জন শোভা দেখিয়া চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিতেও কখন ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এমনি তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ শরীর, প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় মুখকান্তির এমনি প্রসন্নতা, যে তাহা দেখিলে মায়াবদ্ধ জীবের ভবের জ্বালা নিবারিত হইয়া যায়। অতি কোমল স্বভাব, কথাগুলি বড়ই মধুর, বিনয়ের যেন একবারে অবতার। তাঁহার যে কোন গুণ আছে, বা ভক্তি প্রেম বৈরাগ্য আছে ইহা তিনি জানিতেন না। বৈরাগ্যের প্রতিও তাঁহার বৈরাগ্য। একাল পর্য্যন্ত বাবাজীকে অগ্রে কেহ প্রণাম করিতে পারে নাই। পুরুষকে পিতা, স্ত্রীকে মাতা এবং আপনাকে দাস বলিয়া তিনি সম্বোধন করেন। যে সময় জগতের লোক সকল নিদ্রায় অচেতন থাকে তখন তিনি জাগিয়া শৌচ আচমন স্নানাদির জন্য বহির্গত হন। প্রাগুক্ত ভদ্র বিপ্র বাবাজীর বড় অনুগত প্রিয় সেবক, তিনি এক দিন সন্তোষিণীকে সঙ্গে লইয়া ঐ সময় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

তখন রজনী অবসান প্রায় হইয়াছে, কিন্তু অন্ধকার সকল প্রস্থান করে

নাই; নিভৃত কক্ষে, বৃক্ষান্তরালে তাহারা লুক্কায়িত রহিয়াছে। উষার আলোকে সূর্য্য দেবের সমাগম চিহ্ন দেখিয়া নক্ষত্রগুলি একে একে ভয়ে গা ঢাকা দিতে লাগিল। প্রভাততারকার জ্যোতিও সেই জন্য ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিল। আকাশপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিবার জন্য পবন দেব ধীরে ধীরে চামরহস্তে বাহির হইলেন, তাপসদিগের কানে কানে কি বলিলেন, পক্ষীদিগকে জাগাইলেন। বিহঙ্গপরিবার কেহ উঠিয়া বসিয়াছে, কেহ পাখা ঝাড়িতেছে, কেহ গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছে, কেহ কেহ বা গলায় সান দিতেছে। এমন সময় সদানন্দ স্বামী ধীর গম্ভীর পাদ বিক্ষেপে কমণ্ডলুহস্তে তরুণ তপনের ন্যায়, প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় গঙ্গাস্নান করিয়া আশ্রমে উপনীত হইলেন। সহসা বাবাজীর সেই দেবশ্রী সন্দর্শন করিয়া সন্তোষিণীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, চিত্ত চমকিত হইল, চকিতলোচনে তিনি তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কে সেই নারী, সেবানন্দ তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বলিয়া সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

আহা সেই বিজিতাত্মা সাধুর কি প্রসন্ন মূর্ত্তি! শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী। মুখমণ্ডল আনন্দে ঢল ঢল করিতেছে। যেন হাসির এক খানি চিত্রপট। ধন মান বিলাস ঐশ্বর্য্য লাভের হাসির মত সে হাসি নয়। ভোগ সুখাসক্ত ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্ত ব্যক্তি বৃথা আমোদে আমোদিত হইয়া যেমন হাসে সে হাসিও নয়। হায় রে আপ্তকাম সাধুর স্বর্গীয় হাসি, তোমার মত পবিত্র বস্তু জগতে কোথায় পাইব। কাহার সঙ্গেই বা তোমার উপমা দিব! নির্দ্দোষ শিশু সন্তান জননীর কোলে স্তন্যপান করিতে করিতে হাসে তাহা দেখিয়াছি। প্রেমের প্রতিমা স্নেহের অবতার সতী নারীর প্রফুল্ল আননের হাসিও দেখিয়াছি। শত্রু নির্জ্জিত হইলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ জন্য বৈরনির্য্যাতনকারীর মুখে যে দুষ্ট হাসি বাহির হয় তাহাও দেখিয়াছি। ফুলের হাসি, চাঁদের হাসি, হেমকান্তি শস্যমঞ্জরীশোভিত বিস্তীর্ণ ভূভাগের হাসি, নবজলপ্লাবিত স্ফীতবক্ষ তরঙ্গাকুলিত বর্ষাকালীয় নদীর হাসি, তরুণারুণের লোহিত রাগে অনুরঞ্জিত চিরতুষারাবৃত ধবল গিরির হাসি, নবনীরদকোলে চঞ্চলা চপলার হাসি, সকল প্রকার হাসিই দেখিয়াছি, কিন্তু সিদ্ধ মহাজনের যোগপ্রভা-

সমন্বিত অটল শান্তির দিব্যহাসি যেমন সুন্দর এমন আর কিছুই নাই। বিপুল ক্লেশ বহন করিয়া, পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কৃপাসিদ্ধ সাধু পরিণামে অনন্ত হাস্যময়ী বিশ্বমনোমোহিনী অখিলমাতার নিকট এই হাসি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কৃত্রিম কৌশলে শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কল্পিত আলোক দেখিয়া যে হাসির উদয় হয়, তাহাতে সৌন্দর্য্য নাই। মাদকসেবী মদ্যপান করিয়া যে হাসি হাসে তাহাতেও কিছু রস নাই। যৌবনমদে অন্ধ, বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত, সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত যুবক যুবতী এবং নবপ্রেমানুরাগে উন্মত্ত নায়ক নায়িকা যেরূপ হাসে তাহাতেই বা প্রতিভা মাধুর্য্য কৈ? এ স্বর্গের হাসি, স্বর্গবাসী অমরগণের পৈতৃক সম্পত্তি। মানুষ ধর্ম্মের জন্য কেন এতকষ্ট স্বীকার করে, সংসারের কোন অবস্থাতে শান্তি না পাইয়া পরিশেষে কেনই বা সে ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয় এবং তাহার শেষ ফলই বা কি, তাহা এই সদানন্দ স্বামীর হাসিমুখ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতে-ছিল। ইহা শরীরের ধর্ম্ম নহে, যোগী আত্মার যোগপ্রতিভা, আনন্দময়ী জননীর অনন্ত হাস্যের প্রতিচ্ছায়া। ফল দ্বারা যেমন বৃক্ষ চেনা যায়, হাসি মুখ দ্বারা তেমনি সাধুর সিদ্ধত্ব লাভের পরিচয় হয়। তাঁহার অন্তরের যে সচ্চিন্তা, যোগানুভূতি, ব্রহ্মসম্ভোগ, বিশ্বাস ভক্তি প্রেমের সৌন্দর্য্যচ্ছটা ললাটে, গণ্ডস্থলে, নয়নে ও ভ্রূযুগলে দন্তে ওষ্ঠাধরে বাহু বক্ষে আপনাদের স্বরূপ মূর্ত্তি অঙ্কিত করে, তাহাকেই আমরা হাসি বলিতেছি। তাহার প্রভাব ক্ষণপ্রভার ন্যায় কোন বিশেষ অবস্থাসাপেক্ষ বা সাময়িক নহে, কিন্তু স্থির সৌদামিনী তুল্য চিরস্থায়ী। এ হাসি চিরশান্তির পুণ্যভূমিজাত আনন্দের ফুটন্ত গোলাপ কানন সদৃশ। যেন মেঘোন্মুক্ত শারদীয় পূর্ণ শশধরের কমনীয় কৌমুদীর উপর তীব্র বিজলীর জ্বলন্ত রেখা। যদি কখন প্রেমের বিজলী অন্তর্হিত হয়, তথাপি শান্তিচন্দ্রমার শুভ্র শীতল জ্যোতি নির্ব্বাণ হইবে না। তাঁহার চিরহাস্যমুখ কেবল ইহাই বলে যে "ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই মিথ্যা, সুখ দুঃখ জীবন মরণ সকলই মিথ্যা, কেবল হাসিই সত্য।" হায় কবে হাস্যালোকপূর্ণ অনন্ত চিদাকাশে এই ক্ষুদ্র জীবাত্মা পরমাত্মার হাসিতে হাসি মিলাইয়া মহাহাসি হাসিয়া হাস্যার্ণবে ডুবিয়া যাইবে!

সন্তোষিণী সদানন্দ স্বামীর এই হাস্যময়ী ভাগবতী তনু সন্দর্শনে

অতিমাত্র প্রত্যাশাপন্ন হইয়া বলিলেন, "পিতঃ। এই চিরদুঃখিনী অনাথিনীর প্রতি এক বার কৃপাকটাক্ষ কর, আমি ভবযন্ত্রণানলে সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেছি, আমার মুক্তির পথ বলিয়া দাও, আমি আর তোমায় ছাড়িব না।" এই বলিয়া তিনি বাবাজীর পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত রহিলেন।

সদানন্দ তদীয় প্রিয় শিষ্যের মুখে সেই সুভগা সুলক্ষণা বরবর্ণিনীর গুণের কথা সকল শুনিয়া বলিলেন, "অম্বে। তুমি অধীর হইও না, যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি কাহাকেও কখন উপদেশ দিই না, কেবল শুনি। তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয় বড় আর্দ্র হইতেছে। কিন্তু কি করি, আমি পৃথিবীর নিকট যাহা শিখিবার ছিল যাহা শিক্ষা করিয়া এক্ষণে দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। পূর্ব্বে মাসান্তে এক এক বার বাহির হইতাম, এবং লোকসঙ্গ করিতাম, কিন্তু কাহাকেও পথের পথিক ভাবের ভাবুক পাইলাম না, তবে আর আমার অসার কুটস্থিতায় প্রয়োজন কি? শীঘ্রই আমি আকাশে অনন্তের সঙ্গে মিশিব।

সন্তো। আমার একটা গতি আপনাকে করিয়া যাইতেই হইবে। আপনার নিকটে থাকিয়া দাসী হইয়া আমি পদ সেবা করিব।

সদা। আমার কি বাড়ী ঘর আছে মা, তাই নিকটে থাকিবে? পদসেবাই বা কিরূপে করিবে? উহাত অচিরে নাটীতে মিশিয়া যাইবে।

সন্তো। আমি আপনার গুহার ভিতর থাকিব।

সদা। তাই বা আর কয় দিন, আমারত শেষ হইয়া আসিয়াছে। গুহার ভিতর থাকিবে যে বলিতেছ, আচ্ছা মা, তুমি কি সংসারের মায়া একবারে কাটাইয়াছ বলিতে পার?

সন্তো। পিতা, আমার আর সংসারে কিছু নাই।

সদা। পৃথিবীর কোন ব্যক্তি কিম্বা পদার্থে কি আর তোমার আসক্তি নাই?

সন্তো। কোন আসক্তি নাই, কেবল যাঁহার পদে আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়।

সদা। তিনি কি তোমার স্বামী?

সন্তো। তদপেক্ষা বেশী, তিনি আমার জীবনসর্ব্বস্ব।

সদা। যে রাজ্যে তুমি আসিয়াছ, এখানে পার্থিব কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকে না। এখানে কেহ কাহারো স্বামী বা স্ত্রী নহে, সকলেই সেই অনন্ত চিদানন্দের প্রতিবিম্ব সদৃশ। আচ্ছা বল দেখি মা, তিনিও কি বাসনাবিজয়ী মুক্তিপিপাসু সাধক ?

সন্তো। আজ্ঞে হাঁ। আমরা উভয়েই আধ্যাত্মিক প্রেমযোগে সম্মিলিত।

সদা। প্রেমের বিকার কাটিয়াছে কি বলিতে পার ?

সন্তোষিণী এ কথার পরিষ্কার উত্তর দিতে সক্ষম না হওয়ায় বাবাজী বলিলেন, "কিছু কাল তপস্যা করা চাই। সকল প্রকার ইচ্ছাকে নিবৃত্ত করিয়া ভগবান্ সচ্চিদানন্দে আত্মবিসর্জ্জন কর, কেবল তাঁহারই অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দিবা নিশি ভুলিয়া থাক। আমার এ আশ্রমে কাহারো বাস করিবার অনুমতি নাই, তুমি একটু দূরে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক যথারীতি তপস্যায় নিযুক্ত হও, পরে যথাসময়ে আবার দেখা হইবে।" এই বলিয়া তিনি গুহাপ্রবেশ করিলেন।

তদনন্তর স্বামীজীর উপদেশানুরূপ আশ্রমবাটীর প্রান্তভাগে অদূরে তাঁহাকে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইল। সেই পরপ্রেমিক দয়ালু ব্রাহ্মণই তপস্যার সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ করিয়া দিলেন। তিনিই তাঁহার আহার সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাইতেন। এইরূপে সাধুর সাহায্যে ভগবানের কৃপায় সন্তোষিণী মুক্তির সোপানে পদার্পণ করিলেন। যখন পথ পাইলেন, সঙ্গী ধরিলেন, তখন আর গম্য স্থানে পৌছিবার অন্তরায় কোথায় ? বাবাজীর স্বর্গীয় যোগবল তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাবে তিনি মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া সংসারসমুদ্রের ঘটনারাজীকে জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী অনুভব করত ভগবৎপদারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিলেন। আশা বিশ্বাসের হস্তে সিদ্ধির ফল ধারণ করিয়া সাধনে নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং সাধনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নবজীবন।

সন্তোষিণীর ত এক প্রকার গতি করা গেল, বাঞ্ছারামের সংবাদটা এখন এক বার লওয়া যাউক। তিনিত সেই বেগিং বাবুর হস্তে সংসারের উচ্ছিষ্ট যাহা কিছু সঙ্গে ছিল সমস্ত উৎসর্গ করিলেন। তার পর একাকী উদাসীন বেশে মত্ততার আবেশে পদব্রজে বদরিকাশ্রমে গিয়া যথা সময়ে পৌঁছিলেন। তথায় মহারণ্য পরিবেষ্টিত নির্ঝরনিনাদিত এক অতি সুরম্য গিরিকন্দর তাঁহার তপোনিবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। সমস্ত দিন রাত্রি তথায় ধ্যান চিন্তা জপ তপে মগ্ন থাকিতেন, কেবল দিনান্তে এক বার মাত্র ফল মূল ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য বাহিরে যাইতেন। মহা একাগ্রতা এবং দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

যোগীজন নিসেবিত প্রাচীন তীর্থ বদরিকাশ্রম অতীব পবিত্র গম্ভীর স্থান। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস ইহা তুষারাবৃত থাকে। দূরে দূরে তাপসদিগের এক একটী নিভৃত নির্জ্জন কুটীর, নিকটে অপর মনুষ্যের গতায়াত নাই, বিষয় বাণিজ্যের কোলাহল নাই। চতুর্দ্দিকে মহোচ্চ শৈলমালা, তন্মধ্যে পর্ব্বতনিঃস্যন্দিনী তটিনী সকল রজতঃ রেখার ন্যায় কুল কুল নাদে বহিয়া যাইতেছে, আর তাহার মৃদু কলধ্বনির সহিত [illegible] মিলাইয়া পার্ব্বত্য বিহঙ্গগণ গীত গাইতেছে। উপরে ঘন নীল সুনির্ম্মল অনন্ত গগন, নিম্নে নয়নরঞ্জন হরিদ্বর্ণ উন্নতশির তরুরাজী। শীতল আকাশে স্নিগ্ধ সমীরণ, শান্তি শৈলে শান্তি সলিল নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। শস্যতৃণাচ্ছাদিত উপত্যকা ভূমি সকল সোপান শ্রেণীর ন্যায় গহ্বর হইতে ঊর্দ্ধে শিখর প্রদেশে উঠিয়াছে, এবং তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে শত শত ক্ষুদ্র জলস্রোত শুভ্র ফেনরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে দশ দিকে ধাবিত হইতেছে। বায়ুর স্বন স্বন শব্দ, তটিনীর মৃদু কলনাদ এবং পক্ষীদিগের সঙ্গীত ধ্বনি তিন সুরে সুর মিলাইয়া শান্তিদায়িনী প্রকৃতিদেবী মহাদেবের মহিমা

গানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বর্ষাকালীন নিবিড় নীরদের ঘন কৃষ্ণছায়া যখন ঐ বিশালবপু ভূধরের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলে এবং তাহার গভীর ঘন গর্জ্জনে গিরিকন্দর সকল প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, আর সেই সঙ্গে কনকলতিকা দামিনীর সহস্র কিরণে দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বলিত হয়, তৎকালকার গাম্ভীর্য্য দর্শনে মন আপনা আপনি সেই অনন্ত প্রশান্ত মহান্ পুরুষের কোলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। তুষারকিরীটি নগেন্দ্রপতি হিমালয়ের এই সকল গম্ভীর দৃশ্য দর্শনে, এবং বিচিত্র সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণে, তাহার স্নিগ্ধ বায়ু সেবনে এবং শীতল জল পানে চঞ্চল চিত্ত অযোগীর আত্মাও যোগের শান্তি অনুভব করে। নীল আকাশের তলে, মুক্ত বায়ুর কোলে, তুঙ্গ গিরির শিখরে বসিয়া, ভীমকান্তি অভ্রভেদী হিমানিমণ্ডিত প্রকাণ্ড গিরিরাজীকে সম্মুখে করিয়া একবার অনন্তের পানে চাহিলে আর অন্য কিছু মনে থাকে না, ক্ষুদ্র জলবিন্দু যেন অনন্ত মহাসিন্ধুতে একবারে বিলীন হইয়া যায়। অসীম চিদাকাশে চিত্তবিহঙ্গ যোগভরে যেন উড্ডীন হইতে থাকে।

"মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাঞ্ছারাম যোগাসনে উপবেশন করিলেন। দিন রাত্রি মাস বর্ষ নিমেষ মুহূর্ত্তের ন্যায় চলিয়া যাইতে লাগিল। আহার নিদ্রা কেবল নাম মাত্র, পরম চৈতন্যের ধ্যানে চিত্ত সর্ব্বদা নিমগ্ন। কিন্তু অগ্রে শরীরের পতন, তার পর মন্ত্রের সাধন। ক্রমে তপস্যার তেজে শরীর শীর্ণ দুর্ব্বল শুষ্ক হইতে লাগিল। শেষ এমনি নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন, যে এক বার বাহিরে গিয়া যে আহার অন্বেষণ করিবেন তাহারো সামর্থ্য রহিল না। ক্ষুধা নিদ্রার অধীন বলহীন পাঞ্চভৌতিক তনু নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহে না। জলের মীন জলেই বাঁচে, ভৌতিক দেহ তেমনি ভৌতিক পদার্থ অন্বেষণ করে। সুতরাং সেবার অভাবে শরীর ক্ষীণ মলিন রুগ্ন হইয়া পড়িল।

বাঞ্ছারাম শরীরকে একবারে কঙ্কালমাত্র সার করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে যেন পদদ্বারা দলিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভৌতিক দেহরাজ্যে রিপুপরিবারমধ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। তখন অপরিতৃপ্ত শোণিত মাংসলোলুপ বাসনারাক্ষসী পশুপ্রবৃত্তি দৈহিক জীবনীশক্তিকে ডাকিয়া বলিল,

"দেখ, পূর্ব্বে আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই তো সত্য হইল! এবার আমরা সবংশে নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছি, আর রক্ষা নাই, শীঘ্রই আমাদের জীবন বিনষ্ট হইবে, তোমরা শেষসংগ্রামের জন্য সকলে প্রস্তুত হও। আমরা মরিবার জন্যই জন্মিয়াছি, প্রাণ তো যাবেই, তবে বিনা-যুদ্ধে কেন যায়; প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া মরিব। তোমাদের যাহার যত টুকু শক্তি বল আছে, তাহা লইয়া আমার পশ্চাতে আগমন কর। আমরা আত্মরক্ষার জন্য সমরে প্রবৃত্ত হই।"

এই বলিয়া কুবুদ্ধি, কুযুক্তি, কুকল্পনা, নিরাশা, অবিশ্বাস, ভয়, আত্মবিস্মৃতি সন্দেহ প্রভৃতি যাহারা ভয়ে লুকাইয়াছিল তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই রণরঙ্গিণী ভীমদশনা বাসনা রণস্থলে দণ্ডায়মানা হইল। উহারা সদলে মহা হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া বাঞ্ছারামকে ভ্রূকুটি সহকারে বলিতে লাগিল, "রে আত্মঘাতী, ভ্রান্ত, গৃহাশ্রমে অবস্থান কালীন মনে মনে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলি তাই শেষে কাজেও করিলি? আমরা সকলে মিলিয়া এত যে বিলাপ আর্ত্তনাদ করিলাম, কত সৎপরামর্শ সদুপদেশ দিলাম, তাহার প্রতি একবারও মনোযোগ দিলি না? আচ্ছা তোবে উপ-যুক্ত শিক্ষা দিতেছি দাঁড়া?" অনন্তর তাহারা বাঞ্ছারামের তপোনিষ্ঠা, সাধনপ্রতিজ্ঞা, বৈরাগ্যপ্রভাব, যোগানুরাগ সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহার উপর চাপিয়া বসিল। শত্রুকুলের ভীষণ আস্ফালন দেখিয়া অগত্যা তিনিও মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা কিছু বল সম্বল অস্ত্র সস্ত্র ছিল তাহা লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। যোগ ধ্যান নামগান জপ তপ প্রভৃতি রক্ষকগণের আশ্রয় লইলেন।

স্থির চিত্ত হইয়া যাই নির্ব্বাণানন্দ সম্ভোগের জন্য বাঞ্ছারাম একটু আয়োজন করিতেছেন, সহসা অলক্ষিতভাবে নিজজীবনের প্রেমলীলার বিচিত্র বর্ণের ছবিগুলি মানসনেত্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি মন সংসারের দিকে মহাবেগে ছুটিতে লাগিল। জাগ্রদাবস্থায় স্বপ্নের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, যেন সন্তোষিণীর কোলে মাথা দিয়া শুইয়া আছেন এবং ভাবে গদ্গদ হইয়া তাঁহার প্রীতিসুধা পান করিতেছেন। এত দিন মহাবৈরাগ্যের জ্বলন্ত তেজে প্রাণ মন প্রমত্ত

উৎসাহিত ছিল, বিচ্ছেদ বেদনা অনুভূত হয় নাই, এক্ষণে পূর্ব্বের সমস্ত ভাব চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য ঘটনা, কল্পনা, সুখস্বপ্ন সমস্ত যেন স্রোতের ন্যায় সারি সারি একটার পর একটা মনে উদিত হইয়া কষ্ট দিতে লাগিল। তাড়াইতে যান, ভুলিতে চেষ্টা করেন, কিছুতেই কিছু হয় না; বরং আরো তাহারা মুখ বাহির করিয়া নিকটে আসে, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটার পশ্চাতে দৌড়িয়া যান, অন্য দ্বার দিয়া আর দশটা ঘরে প্রবেশ করে। দূর হ! বলেন, কেহ নড়ে না; ভয় দেখান, তাহাতে ভয় পায় না। আবার হাসে, মুখ ভ্যাংচায়, উপহাস করে। ভৌতিক দেহ যত দিন দেবভাবে পরিণত না হয় তত দিন সে ভূতের অধীন। যেন শত শত ভূত পেত্নী তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। একে অনাহারে অনিদ্রায় দেহ ক্ষীণ, ক্লিষ্ট অবসন্ন, তাহার উপর নিরাশা অবিশ্বাস বিরক্তি মানসিক দৌর্ব্বল্য, তাঁহার চিত্ত নিমেষের মধ্যে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল। এরূপ উজ্জ্বল মোহময় রমণীয় ঘটনা তাঁহার জীবনে ইতি পূর্ব্বে কখন ঘটে নাই, এ যেন একবারে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত, প্রস্তরে খোদিত, অস্থি মজ্জার সঙ্গে গ্রথিত। যদিও ইহা মহাবিকারের অবস্থা, কল্পনার লীলা, অবিদ্যার খেলা, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। অসংযত মন, দুর্ব্বল রুগ্ন মস্তিষ্ক, সেই স্বপ্ন কল্পনা পান ভোজন করিয়া সুখী হইতে চায়, কিন্তু শেষে দুঃখে মরে। বিরহের অবস্থায় প্রণয়ের ঘটনাবলী আরো সহস্র গুণ মনোহর এবং সুমিষ্ট বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। অনলের সঙ্গে পতঙ্গের কি যে নিগূঢ় আত্মীয়তা তাহা বিরহানলদগ্ধ প্রণয়ীই কেবল জানে।

"আচ্ছা, এক বার ধ্যান করিয়া দেখি, মনের গতি ফিরাইতে পারি কি না"। এই বলিয়া তিনি চিত্ত সমাধানপূর্ব্বক ধ্যানে মগ্ন হইবার চেষ্টা করিলেন। "তুমিই সত্য, তুমি সার, আর সকল মিথ্যা অসার। তোমাতে আমি, আমাতে তুমি। অন্তরে বাহিরে তুমি পরিপূর্ণ।" বারম্বার এই কথা বলিলেন। ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া "এ কি বিপদ! ধ্যানের মন্ত্র জপিতে জপিতে আবার কোথায় আসিয়া পড়িলাম। পুকুর, বাগান, ফুলের গাছ, শিবের মন্দির, রাসমঞ্চ, পূজার দালান, আটচালা, অট্টালিকার ছাদ, এ যে

সেই মামার বাড়ীর ছবি দেখছি! যা, সব ভস্মে ঘি ঢালা হইল! মুখে বলছি এক, মনে ভাবছি আর এক। হায় কেন আমি তোমায় ভাল বাসিয়াছিলাম! এত জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার পর আমার যদি এই অবস্থা হইল, তবে না জানি তোমার কতই যন্ত্রণা হইতেছে! আহা, তোমাকেওত সান্ত্বনা দান করিবার কেহ নাই! তোমার দুর্দ্দশা যে কি ঘটিয়াছে তাহা ভাবিলেও আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। অসহায় বিরহকাতরা দেখিয়া হয়তো কত দুষ্ট লোকে তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে। আমাকে হারাইয়া নিরাশ্রয় অনাথিনীর বেশে হয়তো পথে পথে বনে বনে তুমি কাঁদিয়া বেড়াইতেছ। কিম্বা শোক দুঃখে ভগ্নহৃদয় হইয়া শেষ অকালে মৃত্যুমুখেই বা পতিত হইয়াছ। যাউক, আর কাঁদিব না। কাঁদিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া দেহ পাত করিলেও কি এ দুঃখের অন্ত আছে? এ যে অনন্ত দুঃখ।

"কিন্তু যাহা করিতে বসিলাম তাহা ত হইল না। এ যে অনন্তের পরিবর্ত্তে সান্ত, বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিবর্ত্তে জড়চৈতন্য আসিয়া পথ রোধ করিল। যাহাতে পিপাসা বৃদ্ধি হয় তাহাই পুনঃ পুনঃ পান করিতেছি! হায় প্রেম কি ভয়ানক বিকার! যাহাতে মনের শান্তি ভঙ্গ করে, চিত্ত বিচলিত হয়, জ্ঞানী যোগীরা তাহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। সবইত বুঝিলাম, এখন মিথ্যা মায়ার হাত এড়াই কি প্রকারে? আহা সত্য যদি মিথ্যার মত সহজে মিষ্ট লাগিত। ঠাকুর, যাহা অসার অনিত্য তাহাকে কেন তুমি এত মোহিনী শক্তি দিলে? যদি দিয়া আবার কাড়িয়া লইবে, তবে মন হইতে তাহার দাগ কেন একবারে মুছিলে না? ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব প্রলোভনে আসক্ত হইলে তোমাকে পাওয়া যায় না, এই জন্য তাহা হইতে যদি বঞ্চিত করিয়া থাক, তবে তুমি সদয় হইয়া কেন তোমার গুণ সৌন্দর্য্যে আমাকে ভুলাইয়া রাখ না? বুঝিলাম তুমি বড় ঈর্ষান্বিত দেবতা, অন্য কাহাকে ভালবাসিলে তোমার প্রাণে তাহা সহ্য হয় না। আচ্ছা তা ভালইত, অন্যদিকে তবে আমাকে যাইতে দাও কেন? আপনার দিকে কেন টানিয়া লও না? হায়! যে ইচ্ছা সকল কার্য্যের মূল শক্তি, সে নিজেই যদি মায়ামুগ্ধ হইয়া পড়ে, তবে আমি কাহার শরণাপন্ন হইব? রিপুদিগের বিষাক্ত বাণে হৃদয় মন প্রাণ জর্জ্জরিত হইয়াছে। এখন মরিলে

যদি প্রকৃতির প্রতিশোধ হয়, তবে না হয় আমার মরণই হউক। হায় রে আমি দুই কূল হারাইলাম। যদি উচ্চ জ্ঞানের অনুমোদিত উচ্চ ব্রত না লইয়া কোন রূপে সংসারে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আর এত কষ্ট হইত না। আবার কি সংসারে ফিরিয়া যাইব? না, মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া তাহার আকর্ষণে কি আর ভুলিতে পারি। কিন্তু আর সহ্য হয় না, হৃদয় অশান্তির অনলে জ্বলিয়া যাইতেছে, ভজন সাধনে কোন ফল ফলিল না। প্রবৃত্তি সকল যেন এক সময় মত্ত মাতঙ্গবৎ দশদিকে ধাবিত হই-তেছে। হে রিপুগণ, হে প্রবৃত্তিসকল, আর আমাকে দুঃখ দিও না, রক্ষা কর। আমার অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল।"

এই রূপ বিলাপ আর্ত্তনাদের পর বাঞ্ছারাম সেই খানে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। এ প্রকার বিপদে একবার যে তাঁহাকে পড়িতে হইবে তাহা জানা কথা। কেন না, অজ্ঞাতসারে যে মোহগরল তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা জীর্ণ হয় নাই, সুতরাং তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী।

বাঞ্ছারাম নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া জপ তপ জ্ঞান কর্ম্ম ধ্যান যোগ সাধন চিন্তার অভিমান ছাড়িয়া যখন ক্ষীণ স্বরে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"মা গো, তুমি কোথায়। কাতর সন্তানের পানে মুখ তুলে এক বার চাও মা, আমি বুঝি এই বার মরিলাম। আমার ব্যথিত অঙ্গে তোমার স্নেহহস্ত খানি একবার রাখ মা, তোমার শীতল কোলে আমি একটু ঘুমাই। একটু চরণামৃত আমার মুখে দাও, শুষ্ক কণ্ঠ শীতল করি।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। সেই অবস্থায় এই মৃদু মধুর দৈববাণী শ্রবণ করিলেন;—"ভয় নাই, ভয় নাই, আশা পূর্ণ হইবে। পুরুষ আত্মা স্ত্রীআত্মা পরমাত্মায় গিয়া মিশিবে। সশরীরে স্বর্গারোহণ করিবে। যোগিনী মাতার নিকট দীক্ষিত হও, তিনি তোমায় সৎপথ দেখাইয়া দিবেন।"

যখন এই স্বর্গীয় আশাবাক্য শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার শুষ্ক বিশীর্ণ মুখমণ্ডলে আবার কিঞ্চিৎ জীবনের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। আশ্রমের অদূরে এক যোগিনী মাতা অবস্থিতি করিতেন, তিনি সেই সময় বাঞ্ছারামকে অচেতনপ্রায় দেখিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লন, এবং কমণ্ডলু হইতে বিন্দু বিন্দু জল তাঁহার মুখে প্রদান করেন। তাঁহার যোগানন্দময়ী তনুর

সংস্পর্শে বাঞ্ছারাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শনে তাপস-মণ্ডলীমধ্যে মহা আনন্দ ধ্বনি উঠিল। সকলে এই নবজাত শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গরল হইতে এত দিনে অমৃত উৎপন্ন হইল।

এই অমৃত প্রতি ঘটে, প্রতি ঘটনায়, প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে গরলের সহিত মিশ্রিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। প্রত্যেকের জীবনে, মানবীয় প্রত্যেক সম্বন্ধের মধ্যে ইহা লুক্কায়িত রহিয়াছে। সুখ দুঃখ রোগ সুস্থতা, জীবন মরণের ভিতর অমৃত আছে। শত্রুতা মিত্রতা, সংসার বৈরাগ্য, সুনীতি দুর্নীতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলের মধ্যে অমৃত আছে। ঘোর নরকের ভিতরেও আছে। তাই স্বয়ং মহাদেব ভূভারহারী ভগবান ইহা উদ্ধারের জন্য মঙ্গলহস্তে বিশাল ন্যায়দণ্ড ধারণপূর্ব্বক পাপকলুষিত এই বিস্তীর্ণ ভবসমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। তিনি সকলকে এই কার্য্যে যোগ দিবার জন্য ডাকিতেছেন। যাহারা এই পবিত্র কার্য্যে সহকারী হয়, তাহারা অন্তিমে গোলোকধামে বৈকুণ্ঠপতির পারিষদ হইয়া অমরগণসঙ্গে নিত্য কাল অমৃত রস পান করে। যেখানে যে অবস্থায় যে কোন সম্বন্ধের ভিতর যিনি এক বিন্দু প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া তিনি স্বর্গীয় প্রেম সাধনে প্রবৃত্ত হউন। ধন্য তাহারা যাহারা সংসার-গরল হইতে অমৃত তুলিয়া লইতে শিখিয়াছে! দুর্ভাগ্য তাহারা যাহারা বলে, "আমরা গরলপানে জীবন শেষ করিব, তাহা মন্থন করিয়া আর অমৃতের অপেক্ষা করিতে পারিব না।" ভগবানের রাজ্যে নিরাশা নাই। গরল মন্থনের জন্যই মনুষ্য জীবন এবং তাহাতেই তাহার কৃতার্থতা। সে কার্য্য ছাড়িয়া আর সে কিই বা করিবে? বাঞ্ছারামের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে অমৃতের অন্বেষণ কর, নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যোগশিক্ষা।

অনন্তর সেই বিজনবাসিনী যোগিনী মাতা শীর্ণদেহ বাঞ্ছারামকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক আপনার আশ্রম-কুটীরে লইয়া আসিলেন এবং তথায় মাসাধিক কাল তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার সেবা যত্নে সাধু বাঞ্ছারামের স্বাস্থ্য বল ফিরিয়া আসিল কেবল তাহা নহে, তদীয় যোগপ্রভাবে তিনি যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া পূর্ণকাম হইলেন।

এক নিভৃত গিরিসঙ্কটে গহন বনমধ্যে নির্ঝরতটে যোগিনী মাতার আশ্রম। তাঁহার মাতৃমূর্ত্তি বনদেবীর ন্যায় সেই বনস্থলীর চারিদিকে শান্তি প্রসন্নতা নিরন্তর বিকীর্ণ করিত। তাঁহার এমনি মহিমাময় দেব-প্রভাবশালী রূপলাবণ্য, যে দেখিলে হঠাৎ বুঝা যায় না বয়ঃক্রম কত। পরিণত দিব্য-দেহে প্রবীণতা ও গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ সকল দেদীপ্যমান, অথচ তাহা ধর্ম্ম-যৌবনের প্রফুল্লতা এবং কমনীয় মধুর সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। জটাভার-লম্বমান আগুল্‌ফলম্বিত কৃষ্ণ কেশরাশিতে পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত। ঈষৎ লোহিত রাগরঞ্জিত শুভ্র সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি গোলাপ কুসুমের আভায় দীপ্তিশালী; সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, এবং উজ্জ্বল গৈরিক বসন, হস্তে কমণ্ডলু, গলে রুদ্রাক্ষমালা। তাঁহার অচঞ্চল কমল নয়ন যোগপ্রভাসমন্বিত, এবং ললাট ও গণ্ডস্থল অতি-মাত্র প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট। শ্বেতোজ্জ্বল দন্তশ্রেণী শোভিত মুখমণ্ডল পরমানন্দে বিকসিত। সেই সহাস্য আস্যে মৃদু মধুর স্বরে যে সকল স্বর্গীয় বাক্যসুধা সচরাচর ক্ষরিত হইত তাহা ভবদাবানলদগ্ধ সন্তপ্ত জনের পক্ষে অমৃত সদৃশ ছিল। দেবী যোগসম্ভোগে তৃপ্তকাম হইয়া বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক জলপ্রপাতের ধ্বনির সহিত বীণাধ্বনি মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে যখন সংস্কৃত ভাষায় মধুর গম্ভীর নাদে দেবাদিদেব ভগবানের স্তব গান করিতেন, তখন বোধ হইত যেন অমরগণ স্বর্গ হইতে তথায় অবতীর্ণ হইয়া সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। সেই তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত রব ক্রমে বনভূমি ছাড়িয়া

গিরিশৃঙ্গে, গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া আকাশে, আকাশ হইতে মহাকাশে স্তরে স্তরে গ্রামে গ্রামে সমুত্থিত হইয়া পবনহিল্লোলে যেন ক্রীড়া করিত, এবং লতাকুঞ্জ তরুরাজীকে বিধূত ও নির্ঝরবারি শৈলকন্দরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া পুনরায় আবার গায়িকার নিকট ফিরিয়া আসিত। তাহা শুনিতে শুনিতে বাঞ্ছারাম যোগমগ্ন-চিত্তে যেন ঘুমাইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহার আত্মা আকাশবৎ স্বচ্ছ হইয়া চিদাকাশে মিশিয়া যাইত। স্বয়ং ভগবান যেন একাকী বিজনে বসিয়া সেই বামাকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন।

বাঞ্ছারাম কৃতজ্ঞরসে বিগলিত হইয়া বলিলেন, "মাতঃ। আপনার শীতল বক্ষের সংস্পর্শে আমার বাসনাজর্জ্জরিত ভগ্নদেহ শান্তি লাভ করিল, আমি বড় কৃতার্থ হইলাম। বাল্য কালে আমি মাতৃহীন হইয়া এক্ষণে আবার মাকে পাইলাম। এক্ষণে এমন নিষ্ক পথ দেখাইয়া দিন যাহা ধরিলে আর আমাকে ভবিষ্যতে পরীক্ষায় না পড়িতে হয়।"

যোগিনী বলিলেন, "বৎস তুমি বালক অপক্কমতি, ভারি সাহসের কার্য্যে হাত দিয়াছিলে। অগ্রে চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ সম দম বিচার শান্তি সাধনপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিয়া তার পর বাহিরে আসিতে হয়, ইহাই যোগশাস্ত্রের চিরপ্রসিদ্ধ বিধি এবং তপোধনদিগের অবলম্বিত পথ। তুমি বাহ্য প্রমত্ততার সাহায্যে আধ্যাত্মিক প্রেমে প্রবেশ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছ। যোগের অটল ভূমিতে প্রেমের বৃক্ষ জন্মে। আগে যোগ তার পর প্রেমমহাভাব। যাহা কিছু হয় ভালর জন্যই হয়, আর কোন ভয় নাই, কঠোর ব্রত সাধনে আর তোমাকে ব্রতী হইতে হইবে না।"

তাঁহার স্নেহপূর্ণ আশা বচনে বাঞ্ছারাম সাহস ভরসা পাইলেন এবং উৎফুল্ল লোচনে বলিলেন, "মাতঃ বলুন দেখি, কেন আমার এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল? আমিত সমস্ত ত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, মনে কোন বাসনাকেও স্থান দিই নাই, তবে কেন আবার দুঃখ পাইলাম?"

সমাহিত চিত্ত নিত্যযোগময়ী যোগিনীর যোগবিদ্যা এবং যোগবল উভয়ই করতল ন্যস্ত ছিল। পুনরপি তিনি বলিলেন, 'ছাড়াটাইত ধর্ম্ম নয়, সে

কেবল মনকে খালি করা, তৎসঙ্গে আবার সৎপদার্থ ধরা চাই। ভগবৎ-স্বরূপের জীবন্ত লাবণ্য প্রেমমাধুর্য্য জীবে প্রস্ফুটিত না হইলে শান্তি লাভের আশা নাই। অনেক সাধক কেবল ছাড়ে, কিন্তু ধরিতে পারে না। তাহাদের জীবনে চিদানন্দের জ্যোতি বিকসিত হয় না। তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞান, ইচ্ছায় ইচ্ছা, ভাবে ভাব, রুচিতে রুচি, আনন্দে আনন্দ মিলিয়া এক হইবে, তবেত সিদ্ধত্ব লাভ করিবে। 'আমি সুখ বিলাস ছাড়িয়া বৈরাগী হইয়াছি, এই জ্ঞানের মধ্যেও অহমিকা থাকে। ধর্ম্মেরই হউক, আর বিষয়েরই হউক, আমিত্বের একটুমাত্র দুর্গন্ধ থাকিলে ভগবান্ সে দিকে আর অগ্রসর হন না। ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত নিষ্কাম ধর্ম্মে ব্রতী হইলে ভগবচ্চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্ব্যতীত কেবল পণ্ড শ্রম।

"ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন "যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম কর। ফলাফলে সমান হইয়া যে মনের সাম্যাবস্থা হয় তাহাকে যোগ বলা যায়।

তিনি আরো বলিয়াছেন, "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥" যে ব্যক্তি সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, অথচ অন্তরে কেবল বিষয় চিন্তা করে, সেই নির্ব্বোধ মনুষ্যকে কপটাচারী বলা যায়।

"তুমি যে উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করিবে মনে করিয়াছিলে তৎপ্রতি তোমার ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত আসক্তি জন্মিয়াছিল, তাই তপস্যাতে এত বিঘ্ন ঘটিল। অনেক লোক উপায়কে ভালবাসিতে গিয়া এইরূপে ভগবান্কে একবারে হারাইয়া ফেলে। তাহারা উপায়ের পূজা করে, উপায়কে যত পারে খুব বাড়ায়, সময়ে সময়ে ক্রোধ বশতঃ বৈরনির্য্যাতনের জন্য উপায়কে স্বর্গে তুলিয়া দেয়, অবশেষে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ঘোরতর পাপানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হয়।"

যোগিনী মাতার অলৌকিক যোগবলের পরিচয় পাইয়া বাঞ্ছারাম তখন কাঁদিয়া অধীর হইলেন, এবং আত্মগ্লানি সহকারে বলিতে লাগিলেন, "হায়, কোথায় আমি বিন্দুর সাহায্যে সিন্ধুকে পাইব, না বিন্দুর প্রলোভন

মায়ার প্রেমসিন্ধু হরিকে ভুলিয়া গিয়াছি! আমার প্রাণের সখা হরিকে আমি আদর যত্ন, ভক্তি শ্রদ্ধা করি নাই! মানুষকে আমি তাঁহার প্রতি-দ্বন্দ্বী, প্রেমের অংশী করিয়া ফেলিয়াছি! হায় কি মূর্খ আমি! কি নীচাশয় কঠোর হৃদয় আমি। যাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এক সময় আমি পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিয়াছিলাম, তাঁহার প্রতি উপেক্ষা হতাদর ঔদাসীন্য! অহো! এ কি নিদারুণ মনঃপীড়া! আমার বড় অপরাধ হইয়াছে। এমন প্রেমময় উদার ক্ষমাশীল চিরসুহৃদ্‌কে আমি ভালবাসিতে পারিলাম না। তবে আর আমি কোন্ অপকর্ম্ম না করিতে পারি? হায় মোহ, তুমি কত রূপেই না মনুষ্যমনকে বিপথগামী কর! হা ধর্ম্ম, তোমার মধ্যেও দেখি অশেষ বিধ মায়ার ছলনা আছে। কি দুর্ভাগ্য আমার! কি ভয়ানক ভ্রম! ঠাকুর, তোমার চক্র কে বুঝিবে? আমি কি তোমার অনন্ত লীলা বুঝিয়া উঠিতে পারি? আহা এখন তোমাকে ভালবাসিয়া তোমার মধুর প্রেমে কিরূপে মজিয়া যাইতে পারি তাই বলিয়া দাও। তোমাকে ভালবাসিবার জন্য যে প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছে! ভুলাইয়া লও, মুগ্ধ করিয়া ফেল; তোমার প্রেমের জ্বলন্ত দ্রাবকের ভিতরে ফেলিয়া আমাকে বিগলিত কর। ঐ প্রেমের রং চক্ষে মাখাইয়া দাও, সেই চক্ষে আমি সমস্ত জগৎ দেখি। আর আমাকে পরীক্ষায় ফেলিও না, মায়ায় মুগ্ধ করিও না। দয়াময়, তোমার চরণে মাথা দিয়া এই আমি পড়িয়া রহিলাম।"

জলসিক্ত উর্ব্বরা ভূমিতে উত্তম বীজ রোপিত হইলে তাহা যেমন অচিরে অঙ্কুরিত এবং ফলফুলে সুশোভিত হয়, যোগিনী মাতার উপদেশাবলী বাঞ্ছারামের চিত্ত-ক্ষেত্রে তদ্রূপ অচিরাৎ সুফল প্রসব করিল। তিনি তাঁহাকে "সৎ চিৎ আনন্দ" এই মূল মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক যোগশক্তি সংক্রামিত করিয়া যথারীতি দীক্ষিত করিলেন। এই মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন লাভ হইল। আহা সে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় অবস্থা! সচ্চিদানন্দ পুরুষের সুবিমল জ্যোতিতে প্রাণ একবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি সমস্ত আকাশ চিদালোকময় দেখিতে লাগিলেন। কি সুন্দর দৃশ্য! যেন জ্যোতির সাগরে জ্যোতির তরঙ্গ। নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লাবিত, মুখমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শান্তিরসে

প্রফুল্লিত, সর্ব্বাঙ্গ স্থির, আত্মা প্রেমানন্দসাগরে নিমগ্ন। ভগবানের প্রেম-বক্ষে সাধু ভক্ত অমরাত্মাদিগকে দেখিয়া তিনি তৃপ্তকাম হইলেন। তখন গুরু শিষ্য উভয়ে উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন সব দিক জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময় হইল, তখন যোগিনী মাতা "পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোপিলভেৎ তস্য তুচ্ছম্ সকলম্। প্রেমসূর্য্য যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে, সকলং হস্ততলম্।" এই সুললিত সঙ্গীত গাইলেন।

বাঞ্ছারাম জীবনে কখন গান করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার এমনি ভাবাবেশ হইল যে তিনিও অজ্ঞাতসারে সুরে সুর মিলাইয়া সেই গীত-তরঙ্গে জীবন ভাসাইয়া দিলেন। পরে যোগিনী মাতা তাঁহাকে কোলে বসাইয়া কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া অধিকতর উল্লাসের সহিত গান ধরিলেন। এমনি সে মধুর সঙ্গীত, তাহা শ্রবণে হিমানিরঞ্জিত গিরিশৃঙ্গ সকল যেন দ্রবীভূত হইয়া স্রোতস্বতীরূপে বহিয়া যাইতে লাগিল, বায়ুমণ্ডলের সহিত সমস্ত আকাশমণ্ডল মধুময় হইল, বিহঙ্গকুল বিপুল ঝংকারে মহাহরি-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল, লতাকুঞ্জ এবং পাদপশ্রেণী নীরবে তাহা শুনিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, চকিতনয়না কুরঙ্গিনীগণ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝাঁকে ঝাঁকে মধুমক্ষীকা ও অলিকুল উড়িয়া আসিয়া পড়িল, সমস্ত বিশ্ব যেন সঙ্গীতসুধার্ণবে ডুবিয়া গেল।

যোগসম্ভোগ এবং সঙ্গীতের অবসানে যোগিনী বলিলেন, "এক্ষণে তুমি সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়াছ, এখন গাজীপুরে গঙ্গাতীরে আমার ভক্তিভাজন ধর্ম্মবন্ধু শ্রীমৎসদানন্দ স্বামীর আশ্রমে গমন কর, তথায় তোমার নিত্য-সহচরী জীবনসঙ্গিনী সন্তোষিণীকে প্রাপ্ত হইবে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গারোহণ।

জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, ভক্তি, প্রেম, পুণ্যের স্বর্গীয় উপাদানে রচিত ভাগবতী তনু লাভ করিয়া বাঞ্ছারাম পূর্ব্বোক্ত দৈববাণীর অনুসরণ করিলেন। ভক্তিবিগলিত চিত্তে যোগিনী মাতা এবং আশ্রমবাসী তাপসমণ্ডলীর নিকট প্রণামপূর্ব্বক বিদায় লইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি জগতের প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থ এবং মানসিক ক্রিয়ার মূলে পরম পুরুষ ভগবানকে পিতা মাতা সখারূপে ভক্তিনেত্রে দর্শন করিয়া ভক্তবিশ্বাসী হইয়াছিলেন, এক্ষণে যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া অন্তর বাহ্য, ইহ পরকাল, স্বর্গ পৃথিবী, ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত হরিময় দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে আপ্লুত হইল, প্রেমরাগে রঞ্জিত নয়ন ভক্তিজলে ভাসিতে লাগিল, তাহার স্বচ্ছ দর্পণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দধাম রচনা করিল। প্রথমে নির্গুণ, তার পর সগুণ, পরিশেষে তন্ময়ত্ব লাভ। ইচ্ছা ভাব জ্ঞান সমস্ত অনন্তের অঙ্গীভূত হইল। জড় উদ্ভিদ, পর্ব্বত নির্ঝর, আকাশ বায়ু, চন্দ্র সূর্য্য, সমস্ত তাঁহার নিকট জীবন্তভাবে তখন কথা কহিতে লাগিল। জীব যখন প্রকৃতিস্থ হয় তখন প্রকৃতির গঢ় প্রকৃতি ভাবগতি নৃত্য গীত আমোদ কৌতুক কথাবার্ত্তা সমস্ত সে বুঝিতে পারে। যে নির্গুণ আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদের অঙ্কুর বাঞ্ছারামের প্রথম যৌবনে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে সগুণ পুরুষের সহিত মিশিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধন করিল। পূর্ণ ব্রহ্মে অপূর্ণ জীবাত্মা, চিদাকাশে চিদ্বিন্দু, অনন্ত জ্বলদগ্নিশিখায় জ্যোতি কণিকা মিশিয়া গেল।

অতঃপর প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে পর্ব্বতের অধিত্যকা ভূমি ছাড়িয়া উপত্যকা ভূমিতে তিনি অবরোহণ করিলেন। ভাবে মত্ত বাঞ্ছারাম পথিমধ্যে কখন ফলভরে অবনত তরুরাজীকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হন, কখন বা নবপল্লবাবৃত দোদুল্যমান কুসু-

মিত লতিকা সকলকে পবন হিল্লোলে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি সর্ব্বত্র আপনার প্রতিরূপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সদানন্দের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। মহাযোগের আবেশে প্রমত্ত হইয়া শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন। যোগের বিচ্ছেদ নাই, ভাবেরও বিরাম নাই। এইরূপে নাচিতে গাইতে হাসিতে খেলিতে শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় বালকবৎ পথে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষিপ্তের ন্যায় বেশ ভূষা দেখিয়া নগর জনপদের বালকগণ অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করিল, কেহ কটু বলিল, কিন্তু কিছুতেই কেহ তাঁহার শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিল না। সমস্ত ব্যাপারমধ্যে তিনি কেবল ভগবানের বিচিত্র লীলা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাল মন্দ শোক হর্ষ সুখ দুঃখ স্তুতি নিন্দা মান অপমানের অতীত অবস্থায় তখন তিনি পৌঁছিয়াছেন। যিনি অনন্তের সন্তান অন্তরাত্মা স্বয়ং অনন্তদেব তাঁহার অন্ন পান সুখ সম্পদ। যথাসময়ে বাঞ্ছারাম গম্য স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। পথ ভ্রমণের পরিশ্রম, দেশ কালের ব্যবধান কিছুই আর অনুভব করিতে পারিলেন না; যেন যোগবলে অচিরকাল মধ্যে আপনার স্বজাতীয় সম-প্রকৃতি সমভাবী আত্মীয় অন্তরঙ্গের সঙ্গে আসিয়া মিশিলেন। তৎকালে আশ্রম-কুটীর দ্বারে স্বামী সদানন্দের সম্মুখে অজীনাসনে যোগসমাহিত চিত্তে সন্তোষিণী বসিয়াছিলেন। সদানন্দের মুখের হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়াছে, চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, ভয় দুঃখ ভাবনার লেশ মাত্র তাহাতে নাই। প্রাণ যেন প্রাণারামের শান্তিকোলে পরম শান্তি সম্ভোগে তৃপ্তকাম হই-য়াছে। বস্তুতঃ তৎকালে স্বামীজীর অমিত যোগপ্রভা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সন্তোষিণীর নির্ম্মল শুদ্ধদেহে বিভাসিত হইতেছিল। সে অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করত বাঞ্ছারাম পুনরায় গাইলেন, "পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোপিলভেৎ।" যোগরাজ্যে কেহ কাহাকে আত্মপরিচয় প্রদান করে না। ব্যাবধান ছিন্ন হইলে জলে যেমন জল, আলোকে আলোক মিশিয়া যায়, ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে বিলীন হয়, তেমনি যোগীআত্মা সকলের পরস্পর মিলন। এখানে জ্ঞানে ভাবে ইচ্ছায় সমজাতীয়ত্ব।

বাঞ্ছারাম যোগনেত্রে দেখিলেন, সন্তোষিণীর পূর্ব্বের শ্রীর সঙ্গে এখন

আর কিছুই ঐক্য হয় না। দেহের অস্থি মাংস যেন বিদ্যুৎবৎ তেজোময়, চক্ষু হইতে যেন কমনীয় চন্দ্ররশ্মি অবিরত ঝরিয়া পড়িতেছে। মুখ খানি যেন সদ্যবিকসিত শ্বেত শতদল পদ্মের ন্যায় প্রফুল্লিত। মস্তকের সেই কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশগুচ্ছ এখন স্বর্ণবর্ণ। অনন্তর ইহাঁদের তিন জনের জ্ঞানে জ্ঞান, ভাবে ভাব ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিয়া এক হইয়া অনন্তে গিয়া প্রবেশ করিল। মহাযোগ-সমুদ্রে প্রেমমত্তাভাবের তরঙ্গ উঠিল। তখন তিন জনে মিলিয়া এক হাসি হাসিলেন, এক নাম গাইলেন, এক তত্ত্ব বুঝিলেন, এক ভাব ভাবিলেন, এক লীলা দেখিলেন, এক মতে এক পথে মহামিলনের রাজ্যে চলিলেন। ইহা জড় ভূতের মিলন নহে, স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মার স্বেচ্ছা মিলন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অধীনে তিনের মিলন। বিচিত্রতার ভিতর একতা এবং একতার ভিতর বিচিত্রতা।

পরে স্বামী সদানন্দ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "হে যোগী আত্মাদ্বয়, তোমরা পরস্পরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও, এবং বল, জয় সচ্চিদানন্দের জয়! জয় সচ্চিদানন্দের জয়। জয় সচ্চিদানন্দের জয়।"

বাঞ্ছারাম সন্তোষিণী স্বামীজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত মহাবাক্য সমস্বরে বারত্রয় উচ্চারণ করিলেন। সেই ধ্বনি সমস্ত ভুবনে প্রতিধ্বনিত হইল। যৎকালে এই প্রমুক্তাত্মা যোগীত্রয় দণ্ডায়মান হইয়া সচ্চিদানন্দের জয় গান করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অঙ্গকান্তি চিরতুষারাবৃত গিরি-শৃঙ্গের ন্যায় চারিদিকে শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল। মহাযোগে এবং মহাভাবে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মসত্তাতে দীপ্তি পাই-তেছিলেন। তদনন্তর স্বামী উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ! পুষ্পরথে চড়িয়া স্বর্গদূতগণ তোমাদিগকে লইতে আসিতেছেন! অমর ধামে গিয়া অমৃত পান করিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

(১)

অনন্ত আকাশে নীলাম্বর পথে
দেবদূতগণ চড়ি পুষ্পরথে
আসিল নামিয়া গাইয়া গাইয়া
অমর ধামের মধুর গান;

গগনে গগনে ছুটিল সে ধ্বনি,
ধ্বানত করিয়া বিশাল ধরণী ;—
বহিল পবনে, তপনকিরণে.
শুনিয়া জুড়াল তাপিত প্রাণ।

(২)

শ্বেত পীত নীল লোহিত বরণ
সুবাসিত যত কুসুম রতন
গাঁথিয়া যতনে সুরবালাগণে
দিয়াছে পরায়ে রথের গায় :
অপরূপ ভাতি কুসুমবিমান,
উড়ে কত তাহে ফুলের নিশান,
করে ঝল মল আকাশ ভূতল
পবনে পবনে সুরভি ধায়।

(৩)

শ্বেত সুবিমল রজতঃ উজ্জ্বল,
হিমানি সমান ধবল কায়
দেবদূতগণ মূরতি মোহন
শোভে সারি সারি বসিয়া তায়।

(৪)

মিশে প্রাণে প্রাণে, সুললিত তানে,
ভগবৎ যশঃ সকলে গায়,
জয় জয় নাদে পরম আহ্লাদে
দেয় সুরগণ তাহাতে সায়।

(৫)

বলে সব নরে সুগম্ভীর স্বরে
"জাগ রে ঘুমায়ে থেক না আর ;
গরল মথিয়া অমৃত তুলিয়া
হরিলেন হরি ভবের ভার।

(৬)

সন্তোষিণী বাঞ্ছারাম, হয়ে এবে পূর্ণকাম,
প্রণমিয়া সদানন্দে উঠিলেন রথে;
ভাগবতী তনু ধরি, বদনে বলিয়া হরি,
প্রেমানন্দে দোঁহে চলিলেন স্বর্গপথে।

(৭)

নরামর মিলে সবে, জয় জয় জয় রবে,
গাইল মঙ্গল গীত গভীর নিনাদে,
সেই নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য হইল আনন্দে মত্ত,
বাড়িল জীবের আশা হরির প্রসাদে।
বল ভাই হরি হরি, আনন্দে হৃদয় ভরি,
"গরলেঅমৃত" এই দিব্য উপাখ্যান;
ভক্তিভরে যেই জন করিবেক অধ্যয়ন,
জীবন্মুক্ত হবে পাবে হরিপদে স্থান॥

[সমাপ্ত।]